KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No.: KLMLGK 2007:	Place of Publication ৫৪ [illegible] অ্যাভিনিউ, কলি-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher মীজানুর রহমান
Title চড়ুই	Size 7"x 9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : ৩/২	Year of Publication বৈশাখ ১৩৯৯ 11 May 1992
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : আব্দুর রহিম	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫৩ সংখ্যা ১ মে, ১৯৯২

এই বছর ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ ঘুরে এসে অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং সেখানকার সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে লিখেছেন, "নিশিদিন ভরসা রাখিস" : ফেব্রুয়ারির উত্তাল বাংলাদেশ"।

মানবজাতির ইতিহাসে আসন্নপ্রায় নতুন শতাব্দীতে বিগতপ্রায় শতাব্দীর প্রারম্ভিক সম্ভাবনাগুলির পরিণতি কেমন দাঁড়াচ্ছে? — এই নিয়ে অধ্যাপক অমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের সন্দর্ভ — "শতাব্দী শেষে সভ্যতার সংকট"

"ইংরেজি সাহিত্য সমালোচনা : পথের শেষ কোথায়?"—নিবন্ধে সমালোচনার বিভিন্ন ধারার সমীক্ষা প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক আকাডেমিক বিচারধারার সংকটের চেহারাটি বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছেন অধ্যাপক সুকান্ত চৌধুরী।

রবীন্দ্রনাথের আত্মকথনের ত্রিধারায় জীবন গড়ে ওঠার অন্তর্নিহিত তত্ত্বটি যেভাবে অবয়ব লাভ করে তার বর্ণনা দিয়েছেন ড. পিনাকী ভাদুড়ী।

পশ্চিম বাঙলার উদ্বাস্তু সম্পর্কিত সম্ভবপর সমস্ত ঘটনাপ্রবাহের বিবরণ এবং বিশ্লেষণ সম্বলিত একখানি বইয়ের পর্যালোচনা করেছেন জ্যোতির্ময় বসু।

ছবি আঁকা এবং মুছে ফেলার সাম্প্রতিক চমকপ্রদ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মকবুল ফিদা হুসেন সম্পর্কে সুরজিৎ দাশগুপ্ত-র মর্মগ্রাহী প্রতিবেদন।

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া জনপ্রিয় আধুনিক গানগুলির শুদ্ধপাঠ।

সোমনাথ হোরের ডাইরি নিয়ে গৌতম ভদ্র-র আলোচনা, "স্বপ্নের দিনগুলো"।

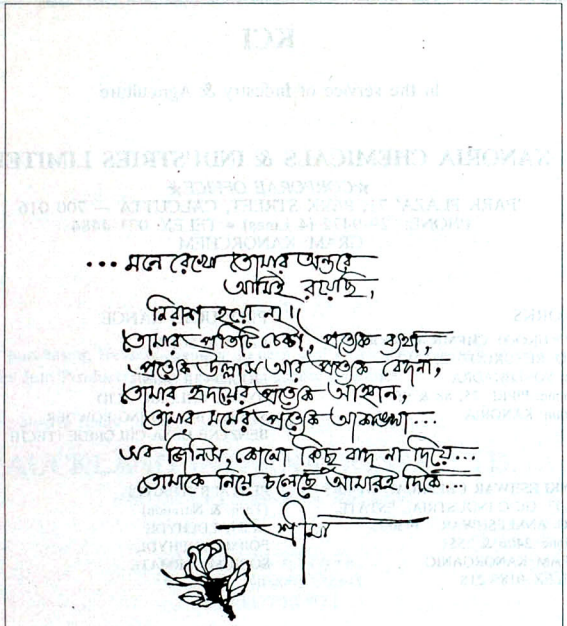

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মনের প্রত্যেক আশঙ্কা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

— শ্রীমা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম. ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বর্ষ ৫৩ সংখ্যা ১
মে ১৯৯২
বৈশাখ ১৩৯৯

শতাব্দী শেষে সভ্যতার সংকট অমলকুমার মুখোপাধ্যায় ১
নিশিদিন ভরসা রাখিস : ফেবরুয়ারির উত্তাল বাংলাদেশ শিবনারায়ণ রায় ৯
ছন্দরীতি মহাদেব সাহা ২৩
লোকাচার হবে বিজয়া মুখোপাধ্যায় ২৪
ঐ সন্তানের হাত রেজাউদ্দীন স্টালিন ২৫
তুমি কি আর পারো? নিভা দে ২৬
[illegible]জি সাহিত্য-সমালোচনা : পথের শেষ কোথায়? সুকান্ত চৌধুরী ২৭
মুচি দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৯
আত্মকথনের ত্রিধারা পিনাকী ভাদুড়ী ৪৫

গ্রন্থসমালোচনা

পশ্চিম বাঙলার উদ্বাস্তু ইতিবৃত্ত জ্যোতির্ময় বসু ৫৩
স্বপ্নের দিনগুলি গৌতম ভদ্র ৫৭
দুটি উপন্যাস এবং ছ-টি গল্প সংকলন কান্তি গুপ্ত ৫৮
ভদ্রলোকদের উলঙ্গ আত্মার নাটক মেঘ মুখোপাধ্যায় ৬২

চিত্রকলা

তুমি কি কেবলই ছবি : প্রসঙ্গ হুসেনের ছবি আঁকা
এবং ছবি মোছা সুরজিৎ দাশগুপ্ত ৬৪

স্মরণে

"পথের পাঁচালী" ও তারপর চিদানন্দ দাশগুপ্ত ৬৯
সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র চিন্তা ও অন্যান্য ভাবনা অসীম রেজ ৭১

গানের ভুবন

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও তাঁর গান বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৭৭
মতামত ৮২
১৩৫০ এর মন্বন্তর প্রফুল্লরঞ্জন চক্রবর্তী
ঐ (২) অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্রগবেষণার এক অভিনব ধারা ১ হীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার
রবীন্দ্রগবেষণার ,, ,, ২ অজিতকুমার চক্রবর্তী
ভারতবর্ষ ও ইসলাম শেখ একরামুল হক

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক ক্রেস্ট গ্রাফিক্স, ২ চার্চ লেন, কলিকাতা-১ থেকে মুদ্রিত
এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত।
শিল্পপরিকল্পনা রনেনআয়ন দত্ত। নির্বাহী সম্পাদক আবদুর রউফ

G.A.E. Publishers

10 Raja Rajkrishen Street (Suite - 11)
Calcutta - 700006 India
Dial : 52 7175

রবীন্দ্র-চর্যা
দেবীপদ ভট্টাচার্য
রবীন্দ্রনাথের মনন-পরিবেশ ও সাহিত্যকর্মের উপর নানাদিক থেকে নতুন আলোকপাতের ফলে আমাদের রবীন্দ্র-পরিচয়ের পরিধি যেমন বিস্তৃততর হয়েছে, তার গভীরতাও তেমনি বেড়েছে। স্বদেশ ও বিদেশের নানা সাহিত্য, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির নিকট থেকে প্রাপ্ত অবিচল তথ্য ও যুক্তিনিষ্ঠায় রচনাগুলি সমৃদ্ধ। স্বচ্ছ চিন্তা ও প্রাঞ্জল ভাষার গুণে বইখানি পড়তে কিছুমাত্র আয়াস বোধ হয় না। সঙ্গে চারটি ছবি এই বইয়ের অন্যতম আকর্ষণ। টাকা ৪০

বলাকা : অতল আধার
জহর সেনমজুমদার টাকা ২০

প্রসঙ্গ : রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও অন্যান্য
অজয়কুমার ঘোষ টাকা ১৭

সৌন্দর্যদর্শন
সিতাংশু রায় টাকা ১৮

বাংলা কাব্যে জীবনানন্দ
সুজাতা সিংহ টাকা ২৫

জি. এ. ই. পাবলিশার্স
১০ রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, পোষ্ট বক্স নং - ১১৪২৮
কলকাতা - ৭০০০০৬

চতুরঙ্গ

মে ১৯৯২ থেকে
প্রতি সংখ্যা আট টাকা
সডাক গ্রাহকমূল্য বার্ষিক ৯০ টাকা
ষান্মাষিক ৪৫ টাকা

এজেন্সির নিয়মাবলী

১। পাঁচ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না।
২। কমিশন শতকরা ২৫। পঁচিশ কপির উর্ধ্বে শতকরা ৩০।
৩। ডাক-খরচ আমরা বহন করি।
৪। কপি-পিছু চার টাকা আমাদের দপ্তরে জমা রাখতে হবে।

লেখকদের প্রতি নিবেদন

যাঁরা প্রকাশের জন্য কবিতা পাঠাবেন তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে নকল রেখে পাঠান — অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়।

অনান্য অমনোনীত রচনা যাঁরা ফেরত নিতে চান তাঁরা অনুগ্রহ করে উপযুক্ত পরিমাণে ডাক-টিকিট পাঠালে আমাদের সহায়তা করা হবে।

প্রেরিত রচনায় অপরিচিত বা স্বল্পপরিচিত বিদেশী ব্যক্তিনাম আর স্থাননাম থাকলে, সঙ্গে আলাদা একটি কাগজে ইংরেজি বড়ো হরফে সেগুলি লিখে দিলে উপকার হবে।

শতাব্দী শেষে সভ্যতার সংকট

অমলকুমার মুখোপাধ্যায়

পৃথিবীতে এখন ঘনিয়ে আসছে যুগান্তের গোধূলি, আর মাত্র কয়েক বছর পরেই বিংশ শতক শেষ হয়ে দেখা দেবে নতুন শতাব্দী। যে যুগকে আমরা বিদায় জানাতে চলেছি তার ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা হয়ে আছে কীর্তিমান মানুষের অসামান্য কৃতিত্বের, কঠোর সংগ্রামের আর নিরলস সাধনার উজ্জ্বল আখ্যান। গত একশ বছরে পতন-অভ্যুদয়ের অবিরাম জোয়ার-ভাঁটার মধ্য দিয়ে মানবসভ্যতা যে বস্তুগত সাফল্য ও অগ্রগতি অর্জন করেছে তা যেমনই অতুলনীয় তেমনিই অমেয়। কর্মযোগী মানুষ আজ 'হাসামুখে অদৃষ্টেরে পরিহাস' করতে পারে, প্রবল বিক্রমে প্রকৃতিকে সযত্নে রাখতে পারে, দুর্জ্ঞেয়ের রহস্য ভেদ করতে পারে তার জ্ঞানের প্রখর অগ্নিবাণে, ভৌগোলিক দূরত্বের বাধা অতিক্রম করতে পারে অনায়াসে, এমনকি যন্ত্রকে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারে নিজের শ্রমশক্তির উপযুক্ত বিকল্প রূপে। মানুষের পক্ষে এসব কিছুই সম্ভব হয়েছে মূলত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দাক্ষিণ্যে। বিংশ শতাব্দী প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় সাফল্যের যুগ। এই সাফল্য মানবজীবনে এনেছে উদ্দাম গতি, মানুষকে অভিষিক্ত করেছে উপর্যুপরি জয়ের মহিমায়, তাকে দিয়েছে আত্মবিশ্বাস ও অসামান্য ক্ষমতা। তথাপি পৃথিবীর সর্বত্রই আজ মানুষের মনে সুখ নেই, শান্তি নেই, কোথাও নিরাপত্তা নেই, নিশ্চয়তা নেই। আসলে বিংশ শতক জুড়ে উন্নত ধীশক্তি প্রয়োগ করে বারবার আমরা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পেরেছি, কিন্তু সেই সঙ্গে আন্তরশক্তির মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালিয়ে রাখার চেষ্টা আমরা করি নি, ক্ষমতা ও গৌরবের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণের জন্য আমরা সর্বতোভাবে প্রয়াসী হয়েছি অথচ অটুট নৈতিক সংকল্পে মনুষ্যত্বের ফসল ফলাতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি আমাদের জীবনে, আচরণে, আমাদের চিন্তায়, চেতনায়। এর ফলে পৃথিবীর মানুষের এক নিঃশব্দ পশ্চাদপসরণ ঘটে চলেছে পশুত্বের দিকে। অথচ পশুত্ব থেকে উত্তরণই মানবসভ্যতার উৎকর্ষের ও সাফল্যের প্রধান লক্ষণ এবং পশুত্বের হীনতা থেকে মানুষের যত উর্ধ্বে অবস্থান ততই তার সার্থক অগ্রগতি। দুর্ভাগ্যক্রমে বিংশ শতাব্দীর বিদায় লগ্নে এই হীনতাই বড় সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে মানুষের জীবনে। অর্থাৎ শতাব্দী শেষে প্রকট হয়ে উঠেছে মানবসভ্যতার সংকট।

এই শতাব্দী যখন শুরু হয় তখন মানবসমাজ তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ছিল সবিশেষ আশাবাদী। পশ্চিমি দুনিয়ায় তখন শিল্পবিপ্লবের চমকপ্রদ সাফল্যের

প্রেক্ষাপটে সূচিত হয়েছে ধনতন্ত্রের নির্বাধ জয়যাত্রা, সর্বত্রই সেখানে তখন আশা আর উল্লাস। শিল্পবিপ্লব সমাজজীবনে যে গতি সঞ্চারিত করেছে তার কল্যাণে দ্রুততর হয়ে উঠবে সভ্যতার অগ্রগতি, এই বিপ্লব সফল হয়েছে মূলত যার সাযুজ্যে সেই বিজ্ঞান মানুষের প্রগতি ও কল্যাণের পথ ক্রমাগত প্রশস্ত করে চলবে এবং তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে সহজতর করে তুলবে, ধনতন্ত্রের দাক্ষিণ্যে জাতীয় সম্পদ উৎপাদনের হার বাড়বে দ্রুতলয়ে যার ফলে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বাহু জাতীয় সীমারেখা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রসারিত হবে বহুদূর ব্যাপী — এই ছিল তখন পশ্চিমের মানুষের ধারণা। বলা বাহুল্য, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই এই সব ধারণা সত্য বলে প্রমাণিত হয়ে যায়। অবশ্য শিল্পবিপ্লব থেকে বঞ্চিত প্রাচ্যের মানুষের কাছে বিংশ শতাব্দী শুরু হয়েছিল অন্যভাবে। সেখানে তখন এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পশ্চিমি ধনতন্ত্রের গর্ভজাত সাম্রাজ্যবাদ তার নিয়ন্ত্রণের আর অত্যাচারের জাল ছড়িয়ে ফেলেছে। একদিকে আধুনিক সমাজব্যবস্থা এবং অন্যদিকে রাজনৈতিক পরাধীনতা এই দুইয়ে মিলে সেখানে মানুষের জীবনকে দুঃখ ক্লেশে ভরিয়ে দিয়েছে। তবে এসব কিছুর মধ্যেও বিংশ শতাব্দী প্রাচ্যে নিয়ে এসেছিল জাগরণের প্রভাত। এই শতকের গোড়ার দিকেই প্রাচ্যের মানুষ সচেতন হতে থাকে দীর্ঘদিনের জড়তা ঝেড়ে ফেলে এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে উদ্যত হতে থাকে এই আশা ও বিশ্বাস নিয়ে যে শেষ পর্যন্ত তারা জয়ী হবে তাদের সংকল্প আর উদ্যমে। কাজেই শতাব্দীর শুরুতে পশ্চিমের মতো পুবের মানুষের কোনও উল্লাস ছিল না বটে কিন্তু আশা কিছু কম ছিল না।

পশ্চিমের আশাবাদে বড় ধরনের আঘাত আসে এই শতকের দ্বিতীয় দশকে। এই আঘাত এসেছিল দুই দিক থেকে। প্রথমত, দ্বিতীয় দশকের মধ্যভাগে শুরু হয় প্রথম মহাযুদ্ধ যার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়ে যায় যে মানুষ যতই উন্নত, আধুনিক ও বিজ্ঞাননির্ভর হোক না কেন প্রয়োজনে সুপরিকল্পিত ও সংগঠিত গণহত্যায় লিপ্ত হতে সে দ্বিধাবোধ করে না, অর্থাৎ, সুসভ্য হয়েও মানুষ সাগ্রহে পশুত্বকে আবাহন করতে পারে। আরও প্রমাণিত হয় যে, যে সভ্যতার সৌধ মানুষ নিজ হাতে গড়ে তুলেছে তিল তিল করে, বিদ্বেষ ও ঘৃণার বশীভূত হয়ে তা ভেঙে তছনছ করে ফেলতেও তার বুক কাঁপে না। দ্বিতীয়ত, ১৯১৭ সালে এক ঐতিহাসিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রুশ ভূখণ্ডে এক নতুন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয় যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে পশ্চিমের এযাবৎ নির্ধারিত সভ্যতার গতিপথই একমাত্র পথ নয় এবং একই সঙ্গে পশ্চিমি ধনতন্ত্রের তুলনায় উন্নততর এক সমাজব্যবস্থার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে পৃথিবীর কোথাও কোথাও মানুষ সচেতন হতে শুরু করে। স্বভাবতই এতদিন ধরে মানবসভ্যতা সম্পর্কিত যে আশার আলোর উৎস ছিল শুধু পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এখন থেকে সেই আশার আলো বিকিরিত হতে থাকে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকেও।

কিন্তু মাত্র দুই দশকের মধ্যেই মানবসভ্যতা সম্পর্কিত যাবতীয় আশা আচ্ছন্ন হয় গভীর আশঙ্কায় যখন শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এই যুদ্ধই ছিল এই শতাব্দীর সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক, কলঙ্কজনক ও সর্বনাশা ঘটনা। কারণ এই যুদ্ধে সভ্য মানুষ যে ধরনের বর্বরতার পরিচয় দেয় অতীত ইতিহাসে তার কোনও নজির খুঁজে পাওয়া যায় না। নানা ধরনের বিধ্বংসী মারণাস্ত্রের ব্যাপক প্রয়োগে ধ্বংস করা হয় সভ্যতার বহু অমূল্য সম্পদ এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ, সভ্য মানুষ সহসা রূপান্তরিত হয় রক্তের নেশায় উন্মত্ত শ্বাপদে এবং সামরিক জয়-পরাজয়ের মূঢ় ভাবনায় উপেক্ষিত হতে থাকে মানবজাতির ভবিষ্যৎ। এছাড়া সবার অলক্ষ্যে আর এক চরম সর্বনাশ ঘনাতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে পাশবশক্তির আগুন জ্বালিয়ে দেয় তাতে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যেতে থাকে মানুষের শুভবুদ্ধি ও মনুষ্যত্ব, তার নৈতিক চেতনা ও যাবতীয় মূল্যবোধ। এখন থেকে যে কোনও মূল্য এবং যে কোনও উপায় অবলম্বন করে সাফল্য ও জয়লাভই হয়ে ওঠে মানুষের মূল লক্ষ্য।

দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে অবশ্য শুরু হয় সৃষ্টির নতুন পর্ব। এই সৃষ্টিশীল উদ্যোগ মূলত আবর্তিত

হতে থাকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কেন্দ্র করে। বস্তুত, দ্বিতীয় যুদ্ধের পর থেকে আজ পর্যন্ত যে কালসীমা লক্ষ করা যায় তার মধ্যে নতুন নতুন উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের সাযুজ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য লাভ সম্ভব হয়েছে। আবার পৃথিবীতে যুদ্ধবর্জন ও শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রসংঘের মতো এক বিশ্বসংগঠনও তৈরি করা হয়েছে আজও যার কাঠামো অটুট এবং কর্মধারা অব্যাহত। এছাড়া দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বৃহৎ শক্তি হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের আত্মপ্রকাশ এবং পূর্ব ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে ও চীনে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাও ছিল এক ঐতিহাসিক ঘটনা যার পরিপ্রেক্ষিতে কিছুকাল আগে পর্যন্তও এমন একটা ধারণা দানা বেঁধে উঠতে শুরু করেছিল যে মানবসভ্যতার উৎকর্ষ অর্জন সম্ভব হবে শেষ পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক পথেই। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের প্রভুত্ব থেকে মুক্ত তৃতীয় বিশ্বের আবির্ভাবও ছিল দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর কালের এক ঐতিহাসিক ঘটনা। পরবর্তীকালে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশই তাদের নানাবিধ জাতীয় সমস্যা সত্ত্বেও বিশ্ব রাজনীতির মঞ্চে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে, নিজেদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয়েছে এবং কোনও কোনও সময়ে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া কোনও কোনও দেশ মানবোন্নয়নের ধনতান্ত্রিক পথ সম্পর্কে সংশয়ী হয়ে উঠেছে এবং উদ্যত হয়েছে সমাজতন্ত্র সম্পর্কিত নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। এর ফলে ধনতন্ত্রই যে মানবসভ্যতার শেষ কথা নয় এই প্রত্যয় জন্ম নিয়েছে অনেকের মনে এবং কেউ কেউ এই আশাও পোষণ করেছেন যে শতাব্দী শেষে সমাজতান্ত্রিক আদর্শই হবে সভ্যতার চালিকা শক্তি। তৃতীয় বিশ্বের এই নয়া আশাবাদে স্বভাবতই প্রভাবিত হয়েছে তার অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, সেই সঙ্গে বিশ্বরাজনীতির পুনর্বিন্যাসেও তার প্রভাব পড়েছে।

কিন্তু নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকেই এই আশা ও স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। সোভিয়েত সমাজতন্ত্র আজ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন, সমাজতন্ত্র বিদায় নিয়েছে পূর্ব ইয়োরোপ থেকেও এবং গণ প্রজাতন্ত্রী চীনে সমাজতন্ত্রের সাইনবোর্ড এখনও অটুট থাকলেও সমাজতান্ত্রিক আদর্শ সেখানে কার্যত ভূলুণ্ঠিত। এর অর্থ এই যে পৃথিবীর মানুষের সামনে আজ আর উন্নয়নের কোনও বিকল্প পথ নেই, ঘটনাপ্রবাহ তাকে এমনই এক অবস্থানে এনে ফেলেছে যেখানে সভ্যতার উৎকর্ষ ও অগ্রগতি নিরূপিত হবে পশ্চিমি দুনিয়ার দ্বারা নির্ধারিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে। পশ্চিমি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রবক্তারা স্বভাবতই এতে উল্লসিত। তাঁরা মনে করেন যে সমাজতন্ত্রের পতনের মধ্য দিয়ে তাঁদের বক্তব্যের অভ্রান্ততা প্রমাণিত হয়েছে। স্বীকৃত হয়েছে তাঁদের নীতি ও আদর্শের চূড়ান্ত বিজয়, এখন থেকে সভ্যতার চরিত্র নিয়ে, উন্নয়নের পদ্ধতি নিয়ে দ্বন্দ্ব আর বিতর্কের কোনও অবকাশ থাকবে না, পৃথিবীর সর্বত্র মানব-প্রগতির মানদণ্ড হবে একটাই, বিশ্বজুড়ে সভ্যতার বিজয়রথ এগিয়ে চলবে ধনতন্ত্রের ও গণতন্ত্রের আপাত-মসৃণ পথ দিয়ে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই অবস্থাটা উল্লাসের নয়, বেদনা ও আশঙ্কার। মানুষ স্বভাবে বৈচিত্র্যকামী, কল্পনায় সে সর্বত্রগামী। তাই সে স্বাদ পেতে চায় নানা ধরনের অভিজ্ঞতার, নিজের বিচারবোধ প্রয়োগ করে এই সব অভিজ্ঞতার ভাল-মন্দ যাচাই করে সে কোনটা গ্রহণ করে কোনটা বর্জন করে। বৈচিত্র্যময়তাই তাই মানবসভ্যতার মূল ধর্ম, অর্থাৎ মানুষের সামনে নিত্য নতুন বিকল্পের উদ্ভব হচ্ছে বলে এবং এই বিকল্পের যার্থায্য বিচারে মানুষ তার মস্তিষ্ক চালনা করতে পারছে বলেই সভ্যতার গতিশীলতা অব্যাহত আছে। অন্যভাবে বলা যায় যে মানবসভ্যতার অগ্রাভিযানে অদ্বৈতবাদের কোনও স্থান নেই, সভ্যতা এক স্রোতস্বিনী যা নিত্য বিক্ষুব্ধ হয় অসংখ্য তরঙ্গে। অতএব যে বিষয়গত অবস্থায় অনমনীয় বিকল্পহীনতাই একমাত্র সত্য, যেখানে মানুষ বাধ্য হয় একতন্ত্রী হতে সেখানে সভ্যতা হারায় তার স্বচ্ছন্দ গতি এবং সংকটের মেঘ ঘনাতে থাকে। এই কথাটা মনে রাখেন নি আজকের দুনিয়ায় সমাজতন্ত্রের ধারক ও বাহকেরা। এই কারণেই সমাজতন্ত্রের পতন ঘটেছে এবং সেই সঙ্গে অচল হয়ে গেছে মানবসভ্যতার বিপুল সম্ভাবনাময় এক

নতুন প্রকরণ। কিন্তু একই ভুল আজ করছেন পশ্চিমি গণতন্ত্রের প্রবক্তারা। যাঁরা নিজেদের জয় দাবি করলেও প্রকৃতপক্ষে এই তথাকথিত জয়ের দ্বারা সূচিত হচ্ছে তাঁদের তথা সমগ্র মানবজাতির সংকট। প্রতিপক্ষের পরাজয়ে আত্মসন্তুষ্ট হয়ে তাঁরা উপলব্ধি করতে পারছেন না যে পৃথিবীর মানুষ সর্বত্রই যদি তাঁদের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে, বিশ্ব জুড়ে যদি নীতি, আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রশ্নে শুধু 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' মন্ত্র উচ্চারিত হয় তাহলে মানবসভ্যতা একই বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে তার গতি ও ঔজ্জ্বল্য হারাবে। তাছাড়া পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সভ্যতার যে রীতি ও প্রকরণ প্রবর্তিত হয়েছে সেখানেও আজ নগ্ন হয়ে উঠেছে সংকটের স্বরূপ। সুদীর্ঘ দুশ বছর ধরে পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিপুল সমৃদ্ধি ও সাফল্য অর্জন করেছে। তথাপি শতাব্দী শেষে আজ দেখা যায় যে এই ব্যবস্থা তার স্বভাবজাত কোনও দুর্বলতাই কাটিয়ে উঠতে পারে নি। তাই পশ্চিমের উন্নত দেশগুলিতে এখনও দারিদ্র্য ও বেকারিকে নির্মূল করা সম্ভব হয় নি, বদ্ধ হয় নি উৎপীড়ন ও সামাজিক বৈষম্য এবং উদ্ভাবিত হয় নি সম্পদের সমবণ্টনের কোনও নির্ভুল সূত্র। এছাড়া সমাজের যে স্তরে সম্পদের প্রাচুর্য পুঞ্জীভূত হয়েছে সেখানে মানুষের মনে আজ দেখা দিয়েছে অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা ও বিপন্নতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চমকপ্রদ অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেখা দিয়েছে মনুষ্যত্বের অধোগতির অন্ধকার অধ্যায়।

।। দুই ।।

মনুষ্যত্বের এই অধোগতি অবশ্য শুধু পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমস্যা নয়, এ সমস্যা আজ জাতি, ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা নির্বিশেষে সারা বিশ্ব জুড়ে। এই শতাব্দীতে পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ কম-বেশি উদ্যোগী হয়েছে বস্তুগত ও বিষয়গত অবস্থার পরিবর্তনে। কোথাও সাফল্য এসেছে, কোথাও এসেছে ব্যর্থতা। তথাপি মানুষ এই বস্তুগত সাফল্য অর্জনের সাধনায় কখনও বিরত হয় নি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে চিত্তের উৎকর্ষ অর্জনের সাধনা তাকে আকৃষ্ট করে নি। বিশেষ করে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে যে সার্বিক নৈতিক অবক্ষয়ের যুগ শুরু হয় তাতে ধারাবাহিকভাবে উপেক্ষিত হতে থাকে মানুষের মনের অন্ধকার দূর করার প্রয়োজনীয়তা। পরিণামে শতাব্দী শেষে আমরা এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছি যেখানে মানুষ আছে, মনুষ্যত্ব নেই, বাহুবল ও বুদ্ধিবল আছে, চরিত্রবল নেই, সাফল্য আছে, সার্থকতা নেই, পরিশীলিত জীবনচর্যা আছে, কিন্তু কোনও মহৎ জীবনদর্শন নেই, চিৎকার আছে, চিন্তা নেই, আস্ফালন আছে, কিন্তু আনন্দ নেই। এই কারণেই বস্তুগত সাফল্যের এক সুদীর্ঘ পথ পার হয়ে এসে মানব সভ্যতা আজ এক চরম সংকটের সম্মুখীন।

বিপদের কথা এই যে এই সংকট সম্পর্কে একালের মানুষ আদৌ সচেতন নয়। আসলে জীবনের বহিরঙ্গ নিয়েই আমরা সতত ব্যস্ত, তার অন্তর্দেশের খবর রাখার আমরা প্রয়োজন অনুভব করি নে। তাই সভ্যতার বাইরের পুষ্টিটাই আমরা দেখি এবং এ জন্য গর্ব বোধ করে থাকি। কিন্তু এই সমৃদ্ধির আড়ালে যে ভাঙনের ঝড় দেখা দিয়েছে সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অচেতন এবং স্বভাবতই আমরা শ্রদ্ধাহীন ও উদ্বেগহীন। প্রাণিজগতে মানুষের পরিচয় সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী হিসাবে। এই উন্নত বুদ্ধিমত্তার কারণেই সে যথাসময়ে সব ধরনের বিপদ ও সমস্যার উপস্থিতি অনুভব করতে পারে এবং যথোপযুক্ত প্রস্তুতি নিয়ে তাদের মোকাবিলা করতে পারে। এইভাবেই সভ্যতার আদিপর্ব থেকে মানুষ বারে বারে প্রতিকূলতাকে জয় করেছে, সংকটের মোকাবিলা করেছে এবং অব্যাহত রেখেছে তার জাগতিক ও আত্মিক উন্নয়নের ধারা। কিন্তু আজ যখন সভ্যতার অন্তর্লোকে সংকটের ছায়া ঘনায়মান তখন সভ্য ও বুদ্ধিমান মানুষের মনে কোনও উদ্বেগ নেই, আলোড়ন নেই, এই সংকটমোচনের জন্য কোনও তৎপরতা নেই। অথচ এই উদ্বেগ ও আলোড়ন, এই তৎপরতা মানুষের সভ্য জীবনেরই লক্ষণ। কারণ সভ্যজীবনের অর্থ শুধু সভ্যতার স্বাদু ফল ভোগ নয়, সভ্যতার সুরক্ষায় নিরন্তর দায়িত্বপালনও সভ্যজীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

শতাব্দীশেষের এই সংকটলগ্নে আজ তাই প্রয়োজন দুটি জিনিসের। প্রথমত, চাই এক ব্যাপক সচেতনতা। সভ্যতার বিপুল সম্ভারের পাশাপাশি মনুষ্যত্বের যে সংকটে সমগ্র মানবগোষ্ঠী আজ বিপর্যস্ত সে সম্পর্কে ব্যক্তিস্তরে প্রত্যেকের সজাগ হওয়া দরকার। এজন্য চাই অনুপুঙ্খ আত্মবিশ্লেষণ, চাই আমাদের নিজেদের অন্তরে নিজেদেরই নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও সন্ধানী দৃষ্টিপাত। দ্বিতীয়ত, এই আত্মসমীক্ষার আলোকে যে রিক্ততা আমাদের স্পষ্ট হয়ে উঠবে তা দূর করার জন্য চাই আন্তরিক উদ্যোগ। তবে সবার আগে জানা দরকার কোন্ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই সংকটের উদ্ভব, চিহ্নিত করা দরকার সংকটের উৎস ও তার স্বরূপ।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এই শতাব্দী শুরু হয়েছিল বিপুল আশা ও সম্ভাবনা নিয়ে। মানুষ সেদিন স্বপ্ন দেখেছিল যে বিজ্ঞানের নিরবিচ্ছিন্ন সাফল্যে তার জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দ ও সহজ হবে, নিত্য নতুন উপাদানে সমৃদ্ধ হবে এবং বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটবে সমগ্র পৃথিবীর। এই স্বপ্ন আজ, সর্বার্থেই সত্য বলে প্রমাণিত। পৃথিবীর অবয়বে আজ ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, একশ বছর আগে তার যে চেহারা ছিল আজ তার চিহ্ন মাত্রও নেই। অন্যদিকে বিজ্ঞান মানুষের জীবনেও এনেছে সর্বাত্মক পরিবর্তন। বিজ্ঞানের কল্যাণে একদিন যা ছিল অধরা আজ তা মানুষের সম্পূর্ণ আয়ত্তে, একদিন যা পেতে কঠিন শ্রমের প্রয়োজন হত আজ তা নিতান্ত অনায়াসলভ্য। বিজ্ঞান মানুষকে আজ দীর্ঘজীবী করেছে, গতিশীল করেছে, আত্মপ্রত্যয়ী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী করেছে, তাকে উদার হাতে উপহার দিয়েছে জীবনধারণের শত-সহস্র আধুনিক উপকরণ। কিন্তু একই সঙ্গে জীবনসংগ্রাম সহজতর হওয়ায় মানুষ শ্রমবিমুখ হয়েছে, নিরলস সাধনার কঠিন পথ পরিহার করে সে এখন অতি সহজে ও অতি দ্রুত বাজিমাত করতে চায়। আবার উন্নত, আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি সহজলভ্য হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই বুদ্ধিপ্রয়োগের, মস্তিষ্ক চালনার কোনও অবকাশ নেই। এর ফলে দৈনন্দিন জীবনে ও কার্যক্ষেত্রে নানাবিধ সুবিধা পাওয়া গেলেও চর্চার অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মানুষের চিন্তাশক্তি। এছাড়া বিজ্ঞানের দাক্ষিণ্যে আজ নিত্যনতুন, আকর্ষণীয় ভোগ্যদ্রব্যের ছড়াছড়ি। যত এই ভোগের উপাদান আয়তনে বাড়ছে ততই তীব্র হয়ে উঠছে ভোগের আকাঙ্ক্ষা এবং এই ভোগের নেশায় মানুষ আজ হারিয়েছে তার মানবিক মূল্যবোধ। আজকের মানুষ ত্যাগ করতে জানে না, সে শুধু ভোগ করতে চায় যে কোনও উপায়ে। তাই আজ সে চরম আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর ও পরার্থপরতায় অপারগ।

এইভাবে বর্তমান শতাব্দীতে বিজ্ঞানের আনুকূল্যে একদিকে যেমন বস্তুগত সুযোগ-সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য ও সাফল্যের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে অন্যদিকে তেমনি ব্যাহত হয়েছে মানুষের চিন্তার ব্যাপ্তি ও গভীরতা, সংকীর্ণ হয়ে উঠেছে তার মন এবং তথাকথিত আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থের ভিড়ে পর্যুদস্ত হয়েছে তার নৈতিক চেতনা। এই কারণেই বিংশ শতাব্দী যেমন বিজ্ঞানের অবিস্মরণীয় সাফল্যের যুগ তেমনি তা বিজ্ঞানের দুর্ভাগ্যজনক, ব্যর্থতার যুগ। এই ব্যর্থতার দায়িত্ব অবশ্য বিজ্ঞানের নয়, বিজ্ঞানকে চালনা করার, ব্যবহার করার অধিকার যার হাতে সেই মানুষই এজন্য দায়ী। বিজ্ঞান তার অসীম ক্ষমতা বলে মানুষের জীবনে তথা সমাজ-সংসারে ক্রমাগত অসামান্য পরিবর্তন নিয়ে আসবে — এটাই বিজ্ঞানের স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু এই পরিবর্তন যাতে কখনই ধ্বংসাত্মক না হয়, তা যাতে কখনই অমঙ্গলের লক্ষ্যে ধাবিত না হয় সে বিষয়ে সতত সতর্ক থাকার দায়িত্ব বিজ্ঞানের চালক ও নিয়ন্ত্রক মানুষেরই। আবার বিজ্ঞানের স্বভাবজাত যান্ত্রিকতা ও বস্তুসর্বস্বতা যাতে মহৎ মানবিক গুণের বিকাশে কোনও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে না পারে সে ব্যাপারেও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব মানুষের। দুর্ভাগ্যক্রমে এই শতাব্দীতে এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বই আগাগোড়া উপেক্ষিত হয়েছে, বিশেষ করে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে এই উপেক্ষা প্রবল হতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে

বিজ্ঞানকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হয় ধ্বংসের কাজে এবং শেষপর্যন্ত বিজ্ঞানের ভয়াবহ বিধ্বংসী রূপ প্রদর্শিত হয় পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। বিজ্ঞানের এই বীভৎস রূপ প্রত্যক্ষ করে মানুষের মনে দেখা দেয় বিচিত্র এক বিপন্নতা ও নিরাপত্তাহীনতার ভাব যা আচ্ছন্ন করে তার শুভবুদ্ধি ও নৈতিক চেতনাকে। এটাই ছিল স্বাভাবিক কারণ। মানুষ যত বিপন্ন বোধ করে ততই সে নিজেকে আঁকড়ে ধরে, ততই সে হয়ে ওঠে আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থসন্ধানী, পরহিতবিমুখ অর্থাৎ আত্মরক্ষার তাগিদে সে তখন মনুষ্যত্ব হারাতে, মূল্যবোধ বিসর্জন দিতে দ্বিধাবোধ করে না। যাঁরা ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হোতা বিজ্ঞানকে ভয়াবহ এক মারণযজ্ঞের সমিধ হিসাবে ব্যবহার করতে গিয়ে তাঁরা বিস্মৃত হয়েছিলেন এই সরল সত্য।

যুদ্ধশেষে যখন নতুন করে গড়ার কাজ শুরু হয় তখন যাঁদের হাতে এই ভুবনের ভার সেই রাষ্ট্রনায়কেরা উপলব্ধি করতে পারেন নি অথবা উপলব্ধি করতে চান নি যে বিজ্ঞানের ধ্বংসমূলক ভূমিকা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে মানুষের মনকে শঙ্কা ও নিরাপত্তাহীনতা থেকে মুক্ত করতে না পারলে এই পৃথিবীতে মনুষ্যত্ব ও মানবিক মূল্যবোধ ফিরিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। তাই যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই যুদ্ধ বর্জনের জন্য কাগজে-কলমে অনেক কঠিন প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত হলেও এবং পৃথিবীতে শান্তি রক্ষার্থে আনুষ্ঠানিক স্তরে রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠিত হলেও দুই বৃহৎ শক্তির নেতৃত্বে পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের অবিরাম প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় যে প্রতিযোগিতা বিগত চার দশকে বিপুল প্রসার লাভ করেছে। এর অর্থই এই যে গত চল্লিশ বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে দ্রুত অগ্রগতি ঘটেছে তার সিংহ ভাগই যুক্ত হয়েছে ধ্বংসের কাজে। এইভাবে মানুষেরই মূঢ়তায় বিজ্ঞানের বিনাশক্ষমতা আজ ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী হয়েছে। স্বভাবতই সাধারণ মানুষের বিপন্নতাবোধ আরও বেড়েছে যার ফলে মানুষের চরিত্র ও চেতনা থেকে বিদায় নিয়েছে মনুষ্যত্ব ও মানবিক মূল্যবোধ। অর্থাৎ, বিজ্ঞানের অপব্যবহারের ফলে মানুষ ক্রমশই নেমে যাচ্ছে পশুত্বের পর্যায়ে। তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলিতে সংকট তীব্রতর হয়েছে আর এক কারণেও। সেখানে মানুষের শঙ্কা ও নিরাপত্তাহীনতা শুধু বিজ্ঞানের বিধ্বংসী রূপ দেখেই নয়, সমাজ ও অর্থনীতির অব্যবস্থার জন্যও মানুষের চিন্তা ও উদ্বেগ বড় কম নয়। অর্থাৎ, দুঃসহ দারিদ্র্য, অশিক্ষা, স্বাস্থ্যহীনতা ও সামাজিক বৈষম্যের চাপে এই সব দেশের মানুষের অনিশ্চিয়তা ও বিপন্নতা বোধের মাত্রা অনেক বেশি।

আবার এই শতাব্দীতে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যে বিপ্লব ঘটে গেছে তাতে মানুষের জীবনযাপনে বিশেষ সুরাহা হয়েছে, সন্দেহ নেই। উন্নত যন্ত্র আজ মানুষের কায়িক ও মানসিক শ্রম লাঘবের ব্যবস্থা করেছে এবং সেই সঙ্গে তার সময়েরও সাশ্রয় করেছে। কিন্তু এই প্রযুক্তিনির্ভরতা মানুষকে আচ্ছন্ন করে চলেছে জড়তা ও হীনতায় যার ফলে কঠোর শ্রম ও গভীর চিন্তার অনুশীলনে সে বিমুখ, ধৈর্য ও সময়সাপেক্ষ বিষয়ান্বেষণে তার অনাসক্তি। এই আলস্যপরায়ণতা, এই সংগ্রামবিমুখ মানসিকতা গতিশীল জীবনের লক্ষণ নয় এবং স্বভাবতই সভ্যতার অগ্রগতির পথে এক বড় অন্তরায়। বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির যুগে উন্নত প্রযুক্তির ব্যাপক সাহায্য গ্রহণ অবশ্যই অবাঞ্ছনীয় নয়, কিন্তু মানুষের মননে ও অভ্যাসে এর অশুভ প্রভাব যাতে না পড়ে, যন্ত্রের বহুল ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েও মানুষ যাতে তার মানবিক গুণ ও নৈতিক শক্তি অটুট রাখতে পারে সেজন্য প্রয়োজন ছিল উপযুক্ত সামাজিক শিক্ষার। দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবীর কোথাও আজ এই সামাজিক শিক্ষার কোনও সুযোগ বা অবকাশ নেই।

॥ তিন ॥

এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই শতাব্দী শেষে আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সভ্যতার সংকট। সভ্যতার কাঠামো অবশ্য অটুট আছে এবং তার বাইরের চাকচিক্যও বড় কম নয়। কিন্তু হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছে তা মানুষেরই সভ্যতা, অন্য

কোনও প্রাণীর নয়। কাজেই মানুষ যদি যথার্থ মানুষের মত আচরণ করতে না পারে, তার চিন্তায়, কর্মে ও উদ্যোগে যদি সে তার মনুষ্যত্ব ও মূল্যবোধ বজায় রাখতে না পারে, সে যদি ক্রমশ পশুত্বের স্তরে অধঃপতিত হতে থাকে তাহলে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে সভ্যতার এই বিশাল সৌধ হঠাৎ একদিন ভূপতিত হবে এবং সেইসঙ্গে বিপন্ন হবে মানবজাতির অস্তিত্ব। বস্তুত, দুর্যোগ আজ পৃথিবীর মানুষের দোরগোড়ায় এসে পৌঁছেছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মানবসভ্যতার এই সংকটমোচন করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন উপযুক্ত সচেতনতার। আমাদের বোঝা দরকার যে বিশ্ব জুড়ে আজ যে হিংসা, অশান্তি ও অস্থিরতা আমরা প্রত্যক্ষ করছি, মানুষ যে ক্রমশই অনুদার ও অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছে, পারস্পরিক সম্পর্কে যে বোঝাপড়ার প্রবণতা দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, পৃথিবীর সর্বত্রই যে তরুণ সমাজ আজ আদর্শহীন, উদ্দেশ্যহীন, আশাহীন ও উদ্যমহীন হয়ে পড়েছে, পরিবারগুলিতে ভালোবাসা ও আত্মীয়তার বন্ধন যে ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে তাতে সূচিত হচ্ছে সমগ্র মানব জাতিরই বিপদ এবং এই বিপদ সম্পর্কে সচেতন হওয়াটা মানুষ হিসাবে আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য। ব্যক্তি স্তরে এই সচেতনতা জাগিয়ে তোলার কাজে এক বড় দায়িত্ব রয়েছে একালের বুদ্ধিজীবীদের। সাহিত্যে ও শিল্পকর্মে, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষায় তাঁরা যদি বারবার এই কথাটা বোঝাবার চেষ্টা করেন যে ব্যক্তি জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে থেকেও সমগ্র মানবজাতির সুখ দুঃখের অংশীদারী আমরা অস্বীকার করতে পারি নে এবং পৃথিবীতে যে সব অবাঞ্ছিত জিনিস ঘটছে আপাতদৃষ্টিতে তা আমাদের ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে সম্পর্করহিত বলে মনে হলেও আমাদের যথেষ্ট বিচলিত হওয়ার কারণ আছে যেহেতু এই ঘটনাবলী বহন করছে মানবসভ্যতার এক বড়ো বিপদের সংকেত, তাহলে হয়ত আমাদের ঘুম ভাঙবে।

সচেতন হওয়াই অবশ্য যথেষ্ট নয়, সংকটের মোকাবিলায় আজ চাই সক্রিয় ও সর্বাত্মক উদ্যোগ। আগেই আলোচিত হয়েছে যে শতাব্দীশেষে আজ যে সংকট তীব্র হয়ে উঠেছে তার অন্যতম কারণ হল বিজ্ঞানের বিধ্বংসী ভূমিকা যা দেখে ত্রস্ত ও বিপন্ন মানুষ হারিয়েছে তার শুভবুদ্ধি ও নৈতিক চেতনা। এছাড়া অনুন্নত দেশগুলিতে অর্থনৈতিক দুরবস্থাও সেখানে মানুষকে আচ্ছন্ন করেছে অনিশ্চয়তা ও বিপন্নতায়। এই বিষয়গত অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে, অর্থাৎ, বিজ্ঞানকে ধ্বংস অমঙ্গলের লক্ষ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করতে না পারলে এবং একই সঙ্গে তৃতীয়বিশ্বের মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে না পারলে মনুষ্যত্বের পতন রোধ সম্ভব নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বিজ্ঞানকে ধ্বংসের কাজে ব্যবহার না করে শুধু যদি সৃষ্টিশীল, গঠনমূলক কাজে ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ, সারা পৃথিবীতে অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও সামরিকীকরণের পিছনে যে বিপুল সম্পদের অপচয় ঘটে চলেছে তা বন্ধ করে এই সম্পদ যদি অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে ব্যবহার করা হয়, এবং এ বিষয়ে তৃতীয় বিশ্বের মানুষের কল্যাণে যদি অগ্রাধিকার দেওয়া হয় তাহলে শুধু তৃতীয় বিশ্বেই নয় সমগ্র বিশ্বের অর্থনীতিতেই এক ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা দেবে এবং সর্বত্রই মানুষ মুক্ত হবে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা থেকে।

মানবসভ্যতা রক্ষার স্বার্থে পৃথিবী জুড়ে আজ তাই প্রবল প্রতিবাদ ধ্বনিত হওয়া দরকার যুদ্ধ প্রস্তুতি ও সমরাস্ত্রসজ্জার মূঢ়তার বিরুদ্ধে। যে রাজনীতিক ও রাষ্ট্রনায়কেরা নিজ নিজ দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা রূপে দুর্ভেদ্য জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার অজুহাতে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে চলেছেন ধ্বংসের তাণ্ডবে তাঁদের কাছে সাধারণ মানুষের আজ এই কথাটা সজোরে বলা দরকার যে যুদ্ধের সম্ভাবনা চিরতরে উৎখাত করে পৃথিবীতে শান্তিরক্ষার আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব যখন রাষ্ট্রসংঘের হাতে তখন এই বিশ্বসংগঠনকে নিছক বক্তৃতামঞ্চ করে না রেখে তারই হাতে তুলে দেওয়া হোক এ সম্পর্কিত যাবতীয় দায়িত্ব এবং জাতীয় স্তরে বি-সামরিকীকরণের কর্মসূচী ধাপে ধাপে কার্যকর করা হোক। কিন্তু এই প্রতিবাদ ও স্পষ্টকথন তখনই সম্ভব যখন মানুষ সাহসী ও সৎ, যখন সে অলস চিন্তা অথবা স্বার্থচিন্তায় মগ্ন না হয়ে

বিশ্বচেতনায় উদ্বুদ্ধ এবং মানবগোষ্ঠী ও তার সভ্যতার ভবিষ্যৎ নিয়ে যথার্থই ভাবিত। অর্থাৎ, শতাব্দী শেষের লগ্নে সভ্যতার যে সংকট স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য সামগ্রিক বিষয়গত অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু সর্বাগ্রে প্রয়োজন উপযুক্ত মূল্যবোধের।

এই মূল্যবোধ জাগরণের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম, নিঃসন্দেহে, শিক্ষা। দুর্ভাগ্যক্রমে আধুনিক কালের শিক্ষা পর্যবসিত হয়েছে মূল্যবোধ-নিরপেক্ষ এক অর্থকরী বিদ্যায় — যা মানুষকে বিভিন্ন পেশার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতায় ভূষিত করে, কিন্তু তার আন্তর শক্তি ও সুষমার বিকাশে কোনও সহায়তা করে না। তাই শিক্ষিত হয়েও আমরা মনের দিক থেকে অশিক্ষিত থেকে যাই, আমাদের নীতিবোধ নিদ্রিত থাকে, আমরা সাহসী হতে পারি না, সৎ হতে পারি না, আত্মস্বার্থের সংকীর্ণ বৃত্তের মধ্যেই আমরা সারা জীবন ঘুরে বেড়াই। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াও অনানুষ্ঠানিক স্তরে সামাজিক শিক্ষার যে বৃহত্তর ক্ষেত্র আছে সেখানেও আজ শূন্যতা। যেমন নৈতিক অনুশাসনের মধ্য দিয়ে মানুষের মূল্যবোধ জাগরণের অবকাশ ছিল ধর্মের, কিন্তু আচার, সংস্কার ও অন্ধতার প্রাবল্যে ধর্ম আজ তার দায়িত্ব পালনে অক্ষম। এছাড়া এমন একদিন ছিল যেদিন প্রতিটি সমাজেই ছিলেন দার্শনিক, ছিলেন কবি, লেখক, সাহিত্যিক, সমাজসংস্কারক ও সমাজচিন্তাবিদ্ যাঁদের সতর্ক প্রহরা ছিল সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ওপর, যাঁদের সামাজিক শাসনে সংযত হত মানুষের দুরাচারের প্রবণতা। কিন্তু আজ নেশাগত স্বার্থের তাড়নায় এঁদের অনেকেই এই সামাজিক দায়িত্ব পালনে বিমুখ, তাছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে (যেমন ভারতবর্ষে) রাজনীতির সর্বগ্রাসী ভূমিকার পরিণামে আজ আর সামাজিক নেতৃত্ব দানের বিশেষ অবকাশ নেই।

এই সব কারণেই শতাব্দীর শেষে মানবসভ্যতা আজ এক উদ্বেগজনক অবস্থায়। যে উজ্জ্বল আশাবাদ নিয়ে বিংশ শতাব্দীর শুরু হয়েছিল তার বিদায়লগ্নে সে আশাবাদ নিশ্চিহ্ন প্রায়, আরও দুঃখের কথা এই যে আসন্ন নতুন শতাব্দীতে মানুষ যাত্রা আরম্ভ করবে কোন্ সংকল্প ও আদর্শ নিয়ে সে বিষয়ে কোনও ঐক্যমত্য হওয়া তো দূরের কথা এব্যাপারে কোনও সুনির্দিষ্ট চিন্তা-ভাবনাও পরিলক্ষিত হচ্ছে না মানুষ আজ 'শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের' প্রক্রিয়াতেই মগ্ন, অর্থাৎ নিশ্চল হয়ে সে বসে নেই, কিন্তু তার চলার সামনে কোনও নির্ধারিত লক্ষ্য নেই, সে চলেছে গতানুগতিকতার স্রোতে গা ভাসিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে। এই উদ্দেশ্যহীন যাত্রা অবশ্যই প্রগতির পরিচয় বহন করে না। অর্থাৎ, শতাব্দী শেষে মানবসভ্যতা আজ থমকে দাঁড়িয়েছে, যার অর্থ সভ্যতার রথের চাকা আজ সংকটের চোরাবালিতে।

লেখক পরিচিতি

চিন্তাবিদ অধ্যাপক অমর্ল কুমার মুখোপাধ্যায় খ্যাতিমান প্রাবন্ধিক, বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, এবং বর্তমানে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ। 'সোসাালিস্ট্ পার্সপেকটিভ' নামে একটি ইংরাজী পত্রিকার তিনি সম্পাদক।

নিশিদিন ভরসা রাখিস : ফেব্রুয়ারির উত্তাল বাংলাদেশ

শিবনারায়ণ রায়

যদিও জন্মেছি উত্তর কলকাতায় এবং জীবনের প্রথম পঁয়ত্রিশটি বছরের বেশির ভাগই কেটেছে এই রহস্যময় গলিগুঁজির শহরে, যদিও বিশবছর বাইরে কাটানোর পর হয়তো শিকড়ের টানেই এই মস্তান-আক্রান্ত, স্মৃতি-ধূসর, মর্তুকাম নগরীতে ফিরে এসেছি, তবু যতবারই আমি এখান থেকে বাংলাদেশে যাই ততবারই সেখানকার জগৎ আমার কাছে সুনিশ্চিত ভাবে নিকটতর ঠেকে। এই প্রত্যাসত্তির নানা কারণের ভিতরে একটি অবশ্যই সেখানকার সুজলা সুফলা ভূপ্রকৃতি, সেখানকার নিয়ত বহমান অজস্র নদনদী উপনদী শাখানদী, শ্যামল মৃত্তিকা আর সুনীল আকাশ, পঞ্চভূতের অনারত সিম্ফনী। অন্য কারণ বাংলাদেশের স্ত্রীপুরুষদের স্বভাবজ অতিথিপরায়ণতা। বাংলাদেশে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর গত বিশ বছরে কয়েকবার সে দেশে গেছি; প্রতিবারই পূর্বপরিচিত, সদ্যপরিচিত এমন কি নিতান্ত অপরিচিত জনের সৌজন্য, সাদর অভ্যর্থনা এবং সম্প্রীতি আমাকে মুগ্ধ করেছে। হয়তো প্রবাহিনী নদী এবং পাললিক ভূপৃষ্ঠ আজো সেখানে বাঙালির সেই হার্দ্য উদারতাকে অনেকটা প্রশ্রয় দেয় ফরাসী পর্যটক তাবার্নিয়ে একদা যা প্রত্যক্ষ করে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন এবং এখন যা পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে কলকাতায়, সুদুর্লভ, প্রায়বিস্মৃত।

কিন্তু আমার কাছে, বাংলাদেশের প্রধান আকর্ষণ সেখানকার সুতনুকা ভূপ্রকৃতি বা জনপদবাসীদের অতিথিপরায়ণতা নয়। বাংলাদেশে যা আমাকে বারবার উদ্দীপিত এবং আশান্বিত করে তা হল সেখানকার শিক্ষিতজনের, বিশেষ করে তরুণ-তরুণীদের, বাংলাভাষার প্রতি অনন্যব্রত আত্মনিবেদন, তাদের অকুণ্ঠ আবেগপরায়ণতা, এবং আত্মজিজ্ঞাসার অক্লান্ত প্রয়াস। জানি জীবনকে গড়ে তোলার জন্য আবেগ মোটেই যথেষ্ট নয়; যুক্তি এবং নির্ভরযোগ্য জ্ঞান বিহনে কিছুই গড়া যায় না। কিন্তু তারই সঙ্গে এও জানি যে নির্বিঘ্ন, শুভনাস্তিক, প্যাশনরিক্ত জীবন নিরর্থ, নিষ্ফল। কলকাতায় যে তারুণ্য আজ নির্জীব, প্রায় নির্জিত, হয় শক্তিমান বা বিত্তবানের পৃষ্ঠপোষণের জন্য লালায়িত নয় আত্মপ্রত্যয়হীন আত্মরতিতে ম্রিয়মাণ, বাংলাদেশে সেই তারুণ্য এখনো প্রাণোচ্ছল, দুঃসাহসী, জেদী, শাহাদাতের জন্য প্রস্তুত। বাংলাভাষার রাষ্ট্রিক স্বীকৃতি এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য এখানকার ছাত্রসমাজ দীর্ঘকাল ধরে আন্দোলন করেছে, সেই সাধনায় প্রাণ উৎসর্গ করেছে।

বিস্তর বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও সেই কোজাগর চেতনা এখনো বাংলাদেশের শিক্ষিত তরুণ সমাজের একটি বড় অংশে দীপ্যমান। তারুণ্যের এই শিখা আমাকে নিরন্তর বাংলাদেশের দিকে টানে। এই শিখা ফেব্রুয়ারি মাসে বিশেষভাবে প্রোজ্জ্বল; একুশে ফেব্রুয়ারি এটি নভস্পৃক্ হয়ে সারা দেশকে আলোকিত করে। ধর্মের সম্পর্কমুক্ত এমন একটি স্বতঃস্ফূর্ত জাতীয় উৎসব আমি অন্তত আর কোথাও দেখি নি। ভারতবর্ষে ২৬শে জানুয়ারি বা ১৫ই আগস্ট এর পাশে নিতান্ত নিষ্প্রাণ সরকারি সমারোহ বলেই ঠেকে।

অবশ্য অন্য সম্প্রতিস্বাধীন দেশগুলির মতো বাংলাদেশেরও সমস্যা বিস্তর এবং তাদের আশু সমাধানের সম্ভাবনা নেই। দেশের আয়তন নিতান্তই সীমিত, কিন্তু জনসংখ্যা প্রবলভাবে বর্ধমান। প্রায় একান্তভাবেই কৃষিনির্ভর দেশে শিল্পায়নের সুযোগসুবিধা এখনো পর্যন্ত নিতান্তই কম; অপরপক্ষে বিকল্প হিসেবে শ্রমনিবিড় ক্ষুদ্রশিল্প গড়ে ওঠবার জন্য যে উদ্যোগ-উদ্যম, সাংগঠনিক সামর্থ্য এবং অনুকূল পরিবেশে দরকার এতাবৎ তা অনুপস্থিত। ফলে গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক দারিদ্র্য অসহনীয় হওয়াতে ভূমিহীন এবং উপার্জনহীন স্ত্রীপুরুষ ক্রমাগত কাজের সন্ধানে শহরে চলে আসছে। ১৯১১ সালে ঢাকার জনসংখ্যা ছিল দুই লক্ষের নীচে; পরের তিরিশ বছরে তা বেড়ে হয় পাঁচ লক্ষ সাতাত্র হাজার। কিন্তু তার পরের বিশ বছরে ঢাকার অধিবাসী সংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় সাড়ে চৌত্রিশ লক্ষ। সাম্প্রতিক হিসাব অনুসারে ঢাকার বর্তমান লোকসংখ্যা ষাট লক্ষ এবং এই শতক শেষ হবার আগেই তা হয়ে দাঁড়াবে এক কোটি।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে জড়িয়ে আছে আর্থিক অসাম্য এবং ব্যাপক দারিদ্র্যের সমস্যা। ঢাকার অধিবাসীদের চার ভাগের এক ভাগ বিভিন্ন বস্তিতে থাকে। যদিও ঢাকার একটা বড় অংশ কলকাতার তুলনায় অনেক বেশি পরিষ্কার ও সুপরিকল্পিত, বস্তিবাসীদের দুর্দশার অন্ত নেই। স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের কিছু জরিপ হয়েছে; মাথাপিছু দৈনিক ক্যালরি গ্রহণ এই হিসেবের প্রধান মাত্রা। ২১২২ ক্যালরির কম হলে পরিমিত বা মডারেট দারিদ্র্য, এবং ১৮০৫ ক্যালরির চরম দারিদ্র্য। আশির দশকের শেষ দিকের জরিপ থেকে জানা যায় যে বাংলাদেশের গ্রামে শতকরা ৫১ ভাগ পরিমিত দারিদ্র্যে এবং শতকরা ২২ ভাগ চরম দারিদ্র্যে বাস করে; অপরপক্ষে শহরে এদের শতকরাভাগ ৫৬ এবং ১৯। কিন্তু ঢাকা যেহেতু একটি স্বাধীন রাজ্যের রাজধানী এবং এখানে বিদেশ থেকে বিস্তর অর্থ আসে, সুবিধাভোগী উনজনদের সম্পদবৃদ্ধি, আধুনিক সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ এবং বিলাসব্যসনে অপব্যয় নয়াদিল্লীর মতোই নির্লজ্জ, নিরঙ্কুশ এবং স্ফারমান। অবশ্য এটিতো শুধু বাংলাদেশের সমস্যা নয়। সংখ্যালঘু বিত্তবান এবং শক্তিমান গোষ্ঠী থেকে দেশের দরিদ্রসাধারণের ব্যবধান স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষেও খুবই প্রকট।

বাংলাদেশের নানা জটিল সমস্যার ভিতরে যে দুটি প্রতিবারই বিশেষ ভাবে আমার মনকে ব্যাপৃত করে এবং যে দুটি সম্পর্কে বারে বারেই এখানকার মানুষদের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ ঘটে সে দুটির উল্লেখ করি। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষিত সমাজের বড় অংশ, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রীরা দেশবিভাগের পর থেকেই চেয়ে আসছে এখানে বাংলা ভাষা, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে একটি আধুনিক রাষ্ট্র এবং সমাজ-সংস্কৃতি গড়ে তুলতে। ১৯৪৮ সালে মানবেন্দ্র নাথ রায়ের সঙ্গে এবং ১৯৫০ সালে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আমি যখন ঢাকায় আসি তখনও আমি এই আভিমুখ্য সম্পর্কে প্রকাশ্যে বলি এবং লিখি; এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যতবার আমি এখানে এসেছি এবং নিমন্ত্রিত হয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ ও সেমিনার দিয়েছি, ততবারই এখানকার শিক্ষিতসমাজের এই প্রগতিশীল মানসিকতা আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটিও লক্ষ্য করেছি যে এই বিকাশধর্মী আভিমুখ্যের বিরোধী শক্তিরা কত প্রবল ও আগ্রাসী। দেশবিভাগের পর থেকেই এখানকার অধিবাসীরা বারে বারে বিপর্যস্ত হয়েছে। এখানে প্রাপ্তবয়স্কদের স্বাধীন নির্বাচনের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে ক্ষমতালোভীরা বারবার ব্যর্থ করে স্বৈরতন্ত্রকে খাড়া করেছে। এমনকি বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরও গত বিশ বছরের বেশিটা সময় এক জুলুমতন্ত্রের পর আরেক জুলুমতন্ত্র এখানে চেপে বসেছে। ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর ১৫৩টি অনুচ্ছেদ এবং ৪টি তফসিল নিয়ে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের যে সংবিধান প্রণীত হয় এবং ১৬ই ডিসেম্বর বিজয়দিবসে যেটি প্রবর্তিত হয় সেটির ঘোষিত মূলনীতি ছিল "জাতীয়বাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা"। কিন্তু স্বয়ং "জাতির পিতা" বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারি সেই সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তন ঘটান। চতুর্থ সংশোধনী বিলে তিনি সম্মতি দেওয়ার ফলে বাংলাদেশের সংসদীয় শাসনপদ্ধতির জায়গায় রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনপদ্ধতি চালু হয়, বহু দলীয় রাজনীতির পরিবর্তে প্রবর্তিত হয় একদলীয় রাজনীতি। "সংশোধন পরবর্তী প্রথম রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমান জনগণের দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত হন নি"। ঐ সময়ে অতিথি অধ্যাপক পদে নিমন্ত্রিত হয়ে আমি কয়েক মাস ঢাকায় ছিলাম। তখনকার ব্যাপক বিক্ষোভ আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি।

তারপর থেকে ক্রমাগতই বাংলাদেশে এক জুলুমতন্ত্রের পরে আরেক জুলুমতন্ত্রের উত্থান এবং পতন ঘটেছে। সুস্থির রাজনীতি অথবা গণতান্ত্রিক শাসনের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের নাগরিকদের হয় নি। যে সব আদর্শনিষ্ঠ এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিরা হয়তো বাংলাদেশের সুস্থ বিকাশে নেতৃত্ব দিতে পারতেন দেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হবার প্রাক্কালেই তাঁদের ভিতরে অনেকজনকে পাকিস্তানীরা পরিকল্পনা অনুযায়ী হত্যা করে। ফলে বাংলাদেশের মনন ক্ষেত্রে এমন শূন্যতা আসে যা গত বিশ বছর ধরে সে দেশকে বিনির্জিত করে রেখেছে। নির্ভরযোগ্য মননের সহায়তা না পেলে আদর্শবাদী আবেগ ফলপ্রসূ হতে পারে না। এই বিবেকী বুদ্ধিজীবীদের কয়েকজন আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন, অনেকের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় ছিল। মুজিবকে হত্যার পর স্বাধীন বাংলার রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে গণতন্ত্র বিলুপ্ত হয়। যিনি সম্ভবত বাংলাদেশের নবীন রাষ্ট্রকে গণতন্ত্রের পথে নিয়ে যেতে পারতেন সেই তাজুদ্দীন আহমদকেও হত্যা করা হয়। শেষের দিকে যখন তিনি ঢাকায় গৃহবন্দী তখন এক রাত্রে তাঁর সঙ্গে তিন/চার ঘণ্টা ধরে একনাগাড়ে নানা বিষয়ে আলোচনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এটির ব্যবস্থা করেন আমাদের উভয়েরই স্নেহভাজন আওয়ামী লীগের তরুণ সদস্য আবু মহম্মদ বাবলু। আদর্শবাদী এবং বিচক্ষণ তাজুদ্দীন আহমদ বাংলাদেশের সমস্যা এবং সামর্থ্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন; তাঁকে হত্যা করার ফলে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট যে সামরিক অভ্যুত্থান হয় সেটিকে এবং তার পরবর্তী সমস্ত ফরমান, সামরিক আইন প্রবিধান ইত্যাদিকে সম্পূর্ণভাবে বৈধ করবার উদ্দেশ্যে১৯৭৯ সালের ৫ই এপ্রিল পঞ্চম সংশোধনী বিল পাশ হয়। সামরিক শাসনের অনুমোদন ছাড়াও এই সংশোধনীর দ্বারা বাংলাদেশের নাগরিকদের "বাঙালী"র পরিবর্তে "বাংলাদেশী" আখ্যা দেওয়া হয়, এবং মূল সংবিধানের "ধর্মনিরপেক্ষতা"র নীতিকে বর্জন করে তার পরিবর্তে ঘোষিত হয় যে "সর্বশক্তিমান আল্লাহের উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি।" তাছাড়া ১৯৭৫ সালে যাদের হত্যা করা হয়েছিল ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারী করে তাদের হত্যাকারীদের বিচার রহিত করা হয়। ১৯৮৬ সালে সপ্তম সংশোধনী বিল পাশের দ্বারা সামরিক শাসন অনুমোদিত হয় এবং ১৯৮৮ সালে অষ্টম সংশোধনী ইসলামকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম বলে ঘোষণা করে। এইভাবে স্বৈরতন্ত্রী শাসন ১৯৭২-এর সংবিধানের খোলনলচে বদলে দেয়।

কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে স্বৈরতন্ত্রী শাসন সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক ধারা যে বাংলাদেশে বিলুপ্ত হয় নি সেটি প্রশ্নোর্ধ ভাবে প্রমাণিত ও প্রত্যক্ষীভূত হয় ১৯৯০ সালে। স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন আগাগোড়াই চলছিল; সে আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের; বিরোধী দলগুলির ভিতরে অনৈক্যের ফলে সে আন্দোলন আগে ফলপ্রসূ হয় নি। ১৯৯০ এর নভেম্বর মাসে বিরোধী দলেরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা দাবি করে একটি যুক্ত ঘোষণা দেয়। জরুরী অবস্থা জারী সত্ত্বেও বর্ধমান আন্দোলনের অবদমনে সরকার ব্যর্থ হয়; ফলে তিন জোটের দাবি মেনে নিয়ে ডিসেম্বরের গোড়ায় এরশাদ পদত্যাগ করেন। ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সংসদ নির্বাচন হয়, এবং আগস্ট মাসে সর্বসম্মতিক্রমে সংসদে একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিল দুটি পাশ হওয়ার ফলে জাতীয় সংসদের কাছে জবাবদিহিমূলক সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সংসদে গৃহীত বিলে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিতে বাধ্য কি না, এ সম্পর্কে একটি গণভোট নেওয়া হয় সেপ্টেম্বরের মাসে। এটিতে মোট

বৈধ ভোটের শতকরা ৮৪.৩৮ ভাগ সংসদের প্রাধান্যের পক্ষে ভোট দেয়। ১৯৮৯ সালের শেষদিকে যখন বাংলাদেশে যাই তখন এরশাদ সমর্থক এবং এরশাদবিরোধী উভয়পক্ষেরই অনেকের সঙ্গে আমার আলোচনার সুযোগ হয়; এবং আমার চেনাজানা অধিকাংশ শিক্ষিতজন যে এরশাদবিরোধী এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ১৯৯০-৯১ সালে বাংলাদেশে মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে যে শাসনতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটেছে তা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি নবপর্যায়। এই রূপান্তরের তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী।

কিন্তু স্বৈরতন্ত্রের পতন ঘটলেও মূল সমস্যা রয়ে গেছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক এখনো নিরক্ষর দরিদ্র গ্রামবাসী; ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার-আচরণ এবং প্রতিন্যাস এখনো তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে; আধুনিক কালের আর্থিক-রাষ্ট্রিক-সামাজিক সংগঠন ও ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার জটিলতা তাদের কাছে অবোধ্য; আধুনিক কালের জ্ঞানবিজ্ঞান চিন্তাধারার সঙ্গে তারা পরিচয়বিহীন। ফলে ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতাদের নির্বিবেক প্রচারে এবং আবেদনে তারা অনেক সময়েই, বিভ্রান্ত হয়। আধুনিক যুগে যাকে সিভিল সোসাইটি বলা হয় বাংলাদেশে তা নিতান্ত দুর্বল। দেশবিভাগের পর থেকে এপর্যন্ত বাংলাদেশে আইনের শাসন বা "রুল অব্ ল" প্রতিষ্ঠালাভ করে নি। যাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী সেই শিক্ষিতজন এবং জনসাধারণের ভিতরে প্রকৃত আত্মীয়তা এখনো পর্যন্ত অনর্জিত। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এই আত্মীয়তা গড়ে ওঠবার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল, কিন্তু তা দৃঢ়মূল হয়ে ওঠে নি। ফলে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য গড়ে তোলার পথ সমস্যাকীর্ণ। একথা ভারত এবং অন্যান্য সম্প্রতিস্বাধীন দেশগুলি সম্পর্কেও কমবেশি সত্য। তবে বাংলাদেশের শিক্ষিতসমাজের একটি বড় অংশ এই সব সমস্যা বিষয়ে সচেতন, এবং সে দেশকে স্বৈরতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রের দিকে ফিরিয়ে আনার কৃতিত্ব অনেকখানি তাঁদের। প্রভূত্বাত্ম মনোভাবের ঐতিহ্য এখনো সেখানে পরিবারে, সমাজে, রাজনীতিতে ব্যাপক ও প্রবল। কী ভাবে এই প্রতিন্যাসকে দুর্বল করে জনজীবনে স্বনির্ভর, যুক্তিশীল ও গণতান্ত্রিক মনোভাবকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তা নিয়ে বাংলাদেশে শিক্ষিতদের মধ্যে অনেকেই জিজ্ঞাসু এবং সচেষ্ট। এঁরাই আমাকে নিজেদের একজন বলে গ্রহণ করেছেন।

দ্বিতীয় বড় সমস্যা নতুন রাষ্ট্রের অধিবাসীদের আত্মপরিচয় নিয়ে। বিভিন্ন লেখায় এবং আলোচনায় সমস্যাটিকে একটি প্রশ্নের আকার নিতে দেখি: আমরা বাঙালী না বাংলাদেশী? আমার এখানে যাঁরা বন্ধু বা বিশেষ পরিচিত তাঁরা প্রায় সকলেই সঙ্গত কারণে বলেন এবং নিশ্চিত বিশ্বাস করেন যে তাঁরা একই সঙ্গে বাঙালী এবং বাংলাদেশী। তাহলে দু'এর ভিতরে পার্থক্য কী এবং সমস্যাটা কোথায়? বাংলাদেশী বলতে বোঝায় ভৌগোলিক ভাবে সীমাবদ্ধ একটি বিশেষ সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাগরিক; এই রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব তার নিষ্কমপত্র বা পাসপোর্টে লেখা থাকে, এই রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য পূর্বিতা পায়। এই অর্থে আমি ভারতের নাগরিক; আমার পাসপোর্টে আমার ইন্ডিয়ানত্ব বিঘোষিত। অপর পক্ষে বাঙালী বলতে তাকেই বোঝায় বাংলা যার মাতৃভাষা, এই ভাষার আশ্রয়ে যে সাহিত্য ও সংস্কৃতি অনেকগুলি শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছে যার মন তার দ্বারা পুষ্ট, এই ভাষার প্রতি যার আনুগত্য প্রশ্নাতীত ও অনন্যচিত্ত। ধারণা দুটির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও বিরোধের সম্ভাবনা কোথায়? যদি এই উপমহাদেশের হিন্দু ও মুসলমানের ভিতরে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, প্রীতি ও আস্থার সম্পর্ক ব্যাপক ও দৃঢ়মূল হত, যদি ভারত, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের ভিতরে কোনো রেষারেষি বা সন্দিগ্ধতার ভাব না থাকত, তাহলে ঐ দুটি ধারণা নিয়ে কোনো সমস্যা দেখা দিত না। কিন্তু এই উপমহাদেশের পক্ষে যা নিশ্চিতভাবে কল্যাণকর তা ঘটে নি। ফলে সমস্যা এবং বিরোধের সম্ভাবনা রয়ে গেছে।

ভারতবর্ষ যখন দ্বিধাবিভক্ত হয় তখন পাকিস্তানের পিছনে উদ্দেশ্য ছিল ইসলামধর্মাবলম্বীদের জন্য একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু দেখা গেল জাতীয় ঐক্যের জন্য ধর্মের ভিত্তি যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য নয়। পাকিস্তান দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হল তার জাতীয়তা এবং রাষ্ট্রিক

ঐক্যের প্রধান ভিত্তি বাংলাভাষা। কিন্তু ভাষার উপর জোর দিলে রাষ্ট্রিক-ভৌগোলিক সীমাকে অতিক্রম করে তার চাইতে বৃহত্তর সমূহের কথা ভাবতে হয়। কারণ বাংলা পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদেরও মাতৃভাষা, এবং এই ভাষার বিকাশের দীর্ঘ ইতিহাস দুই বাংলাতেই বিস্তৃত — আধুনিককালে এক শতাব্দীর বেশি সময় সেই বিকাশের প্রধান উৎস ছিল কলকাতা। অপরপক্ষে সদ্যোজাত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অধিকাংশ অধিবাসী ইসলামধর্মী; অতীতের হিন্দুপ্রাধান্যের প্রত্যাবর্তন বিষয়ে তাদের শঙ্কিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ফলে যাঁরা নিজেদের শুধু বাংলাদেশী বলে পরিচয় দিতে চান তাঁরা রাষ্ট্রিক-ভৌগোলিক-ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যকেই প্রাধান্য দেন। অপরপক্ষে যাঁরা নিজেদের একই সঙ্গে বাংলাদেশী এবং বাঙালী বিবেচনা করেন তাঁরা জোর দেন ভাষা এবং সংস্কৃতির উপরে, এবং সে কারণে তাঁরা বাংলা সাহিত্যের সম্পন্ন উত্তরাধিকারকে বিশেষ মূল্য দিয়ে থাকেন এবং সমকালীন পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানকে কাম্য বিবেচনা করেন।

ইসলামধর্মীরা সংখ্যাগুরু হলেও বাংলদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান ধর্মীরাও বাস করেন, এবং জাতীয় সংহতি গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রের অন্যতম মূল নীতি বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৯ সালের সংশোধনী বিলে যেমন বাঙালীর বদলে বাংলাদেশী পরিচয় গৃহীত হয় তেমনই ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অপসৃত হয়। ১৯৮৮ সালে অষ্টম সংশোধনী বিল ইসলামকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম বলে ঘোষণা করে এবং ফলে নাগরিকদের সমানাধিকার বিলুপ্ত হয়। দ্বাদশ সংশোধনীর ফলে সংসদীয় গণতন্ত্র ফিরে এসেছে, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি এখনো পর্যন্ত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় নি। যাঁরা বাংলাদেশী এবং বাঙালীর সমন্বয় চান তাঁরা যেমন ভাষা এবং সাংস্কৃতিকে প্রাধান্য দেন তেমনই ধর্মনিরপেক্ষতারও সমর্থক। জনসাধারণের উপরে তাঁদের প্রভাব সীমাবদ্ধ, কিন্তু উচ্চশিক্ষিত বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ভিতরে এই মনোভাবের ব্যাপকতা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। আত্মপরিচয় সমস্যার সমাধান কঠিন বটে, কিন্তু শিক্ষিত তরুণ সমাজের একটা উল্লেখ্য অংশ এ উদ্যোগে ব্যাপৃত।

॥ দুই ॥

সেটি স্পষ্ট হয় ফেব্রুয়ারি মাস ব্যাপী জাতীয় উৎসবে। ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন এই উৎসব প্রকৃতই অতুলনীয়; এতে প্রধান ভূমিকা শিক্ষিত তরুণ তরুণীদের, শিল্পী সাহিত্যিক সাংবাদিকদের, এক কথায় বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের। এই উৎসব তুঙ্গে ওঠে একুশে ফেব্রুয়ারি। এখন থেকে চল্লিশ বছর আগে ১৯৫২ সালে ঐ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সরকারের নির্দেশ অমান্য করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সভাসমিতি ধর্মঘট করেছিল এবং ঐ দিন পুলিশের গুলিতে তাদের ভিতরে কয়েকজন মারা যায়, অনেকে আহত হয়, আরো বেশি সংখ্যক লোক গ্রেফতার হয়। জাতীয় সত্তার কেন্দ্র এবং ধারক হিসেবে মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠার জন্য সেই যে সংগ্রামের সূচনা নানা ওঠাপড়ার ভিতর দিয়ে সেটি সার্থকতা অর্জন করে স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ভবে। ৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি যাঁরা পুলিশের হাতে নিহত হয়েছিলেন তাঁদের স্মৃতিতে স্থাপিত হয় শহীদস্তম্ভ, তাঁদের অনুপ্রেরণায় রচিত হয় "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি / আমি কি ভুলিতে পারি" গানটি। ভাষা আন্দোলনের শহীদদের উদ্দেশ্যে বাৎসরিক স্মৃতি-উদ্‌যাপন ১৯৫৩ সাল থেকেই শুরু হয়; দেশ স্বাধীন হবার পর ক্রমে এটি ফেব্রুয়ারি মাসব্যাপী উৎসবে বিকশিত হয়েছে।

ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে অনেকে লিখেছেন, বেশ কিছু গবেষণা হচ্ছে, ঘটনাক্রম স্থান-কাল-পাত্র-দল-সংগঠন ইত্যাদি নিয়ে বেশ কিছু মতভেদ আছে, ২১শে ফেব্রুয়ারি এখানকার প্রতিটি পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যা বেরোয় এবং সেগুলিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের পাশাপাশি এই সব বিতর্কেরও প্রকাশ দেখা যায়। বিভিন্ন বই এবং পত্রপত্রিকা থেকে এবং পঞ্চাশের দশকে যাঁরা এই আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন বিভিন্ন সময়ে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে মোটামুটি যেটুকু বুঝতে পারি অতি সংক্ষেপে তা এই।

১৯৪৮ সালে মার্চ মাসে জিন্না যখন উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বলে ঢাকায় বক্তৃতা দেন তখন বিশ্ববিদ্যালয় তার প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। ১৯৪৯ সালের শেষদিকে আবদুল মতিনকে আহ্বায়ক করে বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি বা পরিষদ গঠিত হয়, কিন্তু পরের দুই বছর এ ব্যাপারে কোনো বড় আন্দোলন হয় নি। ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজীমউদ্দিন উর্দুকে পাকিস্থানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করেন। তার প্রতিক্রিয়ায় ৩০শে জানুয়ারি ঢাকার বার লাইব্রেরিতে সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে একটি সর্বদলীয় কর্মীসভা হয়, তার সভাপতি ছিলেন আতাউর রহমান। স্থির হয় ২১শে ফেব্রুয়ারি সারা দেশে সভা, শোভাযাত্রা ও হরতাল করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেবার দাবি ঘোষিত হবে। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি সরকারী ঘোষণার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রায় সবকটি স্কুল কলেজে ছাত্রধর্মঘট হয়; ১১ই এবং ১৩ই ফেব্রুয়ারি পতাকাদিবস পালিত হয় এবং 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' লেখা ব্যাজ সর্বত্র বিক্রি হয়। সরকার আতঙ্কিত হয়ে ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা জারি করে সভা শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে। ঐ দিন সংগ্রাম পরিষদের জরুরী সভায় অধিকাংশ সদস্য ১৪৪ ধারা না ভাঙার সপক্ষে বলেন। কিন্তু রাতে ছাত্রনেতারা ঢাকা হলের পুকুরের পূর্বধারে সিঁড়িতে জমায়েৎ হয়ে স্থির করেন পরদিন সকাল এগারোটায় ছাত্রদের সম্মিলিত হবার জন্য ডাকা হবে এবং ১৪৪ ধারার নিষেধ মানা হবে না। পরদিন দলে দলে ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বার দিয়ে ঢুকে ভিতরে সভা শুরু করেন। এই সভায় সভাপতি হন গাজিউল হক। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী নিরস্ত্র ছাত্রদের ওপরে লাঠি চালায়, কাঁদুনে গ্যাসের বোমা ছোঁড়ে, প্রথমে ফাঁকা বন্দুকের আওয়াজ করে, পরে গুলি চালায়। ২২শে ফেব্রুয়ারি "আজাদ" পত্রিকার বিবরণ অনুসারে পুলিশের গুলিতে চারজন মারা যায়, ১৭ জন আহত হয়, ২৬ জন গ্রেফতার হয়। মৃত শহীদদের নাম জব্বার, বরকত, রফিক ও সালাম। ২৩শে ছাত্ররা একটি শহীদ স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করে, কিন্তু পুলিশ সেটি ভেঙে বিলুপ্ত করে দেয়, এর পর আন্দোলন ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে, ছাত্ররা তার উৎস হলেও শহর এবং মফস্বলের অন্য মানুষেরাও তাতে যোগ দেয়। 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো'গানটি দেশের সর্বত্র জনপ্রিয় হয়ে ওঠে; গানটি লেখেন আবদুল গফ্‌ফার চৌধুরী, সুর দেন আলতাফ মামুদ। ১৯৫৩ সাল থেকেই শহীদ দিবস পালন শুরু হয়। ১৯৫৬ সালে বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতি পায়; এই বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে শহীদ মিনারের ভিত্তি স্থাপন হয়, কিন্তু এটির উদ্বোধন হয় বেশ কয়েক বছর পরে ১৯৬৩ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি। মিনারটি স্থপতি ছিলেন হামিদুর রহমান। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী সৈন্যরা শহীদ মিনারটি ধ্বংস করে। সেই জায়গাতেই দেশ স্বাধীন হবার পর বর্তমান শহীদ মিনারটি আবার নির্মিত হয়েছে।

এবারে যখন ঢাকায় যাই তখন ১৯৫২-র আন্দোলনের একজন প্রধান সৈনিক গাজীউল হকের একটি সাক্ষাৎকার পড়ি। তাতে তিনি বলেন, "ভাষা আন্দোলনের মূল অনুপ্রেরণা ছিল ভাষার মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের একটি মাত্র সাধনা ছিল বাঙালি হওয়ার সাধনা, বাঙালি হিসেবে নিজের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করবার সাধনা, প্রতিষ্ঠা করবার সাধনা।" তরুণ-তরুণীদের কাছে, আগামী প্রজন্মের কাছে তাঁর আবেদন, "সাম্প্রদায়িকতাকে নির্মূল কর, মৌলবাদকে নির্মূল কর এবং মুক্তিযোদ্ধা হত্যাকারীদের বিচার কর।" ছাত্রছাত্রী এবং বয়স্ক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁদের সঙ্গে আলাপ করেছি তাঁদের বেশিরভাগই এবিষয়ে একমত, যদিও এও জানি যে "ঢাকার অদূরে টঙ্গিতে যে বিরাট ইজতেমা (ধর্মসম্মেলন) হয়, মক্কার হজ-এর বাইরে এত বড় মুসলিম জনসমাবেশ কোথায়ও হয় না। এছাড়াও প্রতিবছর দেশের সর্বত্র ছোটবড় মুসলিম উর্‌স্‌-এও মানুষের ভীড় যথেষ্ট" (জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী)। তবে পশ্চিমবঙ্গেও তো দুর্গাপুজো, কালীপুজোর সঙ্গে ভোলেবাবা, সন্তোষী মা, বিশ্বকর্মাপুজো ইত্যাদির ক্রিয়াকলাপও আকারে এবং প্রকারে দ্রুত বেড়ে চলেছে। কিন্তু বাংলাদেশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে যে ধর্মনিরপেক্ষ ভবিষ্যমুখিতা দেখি তার সঙ্গে তুলনীয় কিছু এদিকে দেখি না। স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র অর্জনের জন্য বাংলাদেশের শিক্ষিত জন যে সংগ্রামের ভিতর দিয়ে গেছেন পশ্চিমবঙ্গে গত চল্লিশ বছরে তার সদৃশ আদৌ কোনো অভিজ্ঞতা হয় নি। আমার কিশোরকালে অসহযোগ

আন্দোলনের সময়ে এরই সন্নিভ যা ঘটেছিল আজ তা স্মৃতি হিসেবেও কলকাতার তরুণ প্রজন্মকে কোনো প্রেরণা যোগায় না।

আমি এবারে বাংলাদেশে গিয়েছিলাম মুখ্যত বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের আমন্ত্রণে, এবং ঢাকায় প্রথম কয়েকদিন কেন্দ্রের পাশের ফ্ল্যাটে অতিথি হিসেবে বাস করি। ফ্ল্যাটটির আবাসিক দম্পতি, ঝর্ণা ও শাহ আলম সারওয়ার, দুজনেই অল্পবয়সী, অতিথিপরায়ণ, মিষ্টভাষী, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরক্ত, এবং দুজনেই চাকরি করেন। ক্যাম্পাস থেকে তাঁদের ফ্ল্যাট কিছুটা দূরে। আমরা ২১শের অনুষ্ঠানে ক্যাম্পাসে থাকতে চাই; সুতরাং ১৯শে রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিবাসে আমাদের বন্ধু বাসন্তীর ফ্ল্যাটে অতিথি হই। পাশেই শহীদ মিনার এবং এটিকে ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয় পাড়াতেই ২১শে ফেব্রুয়ারি সবচাইতে উত্তাল। বাসন্তীর সিঁড়ির জানলা এবং ছাদ থেকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সংলগ্ন শহীদ মিনার দেখা যায়। ঢাকাতে পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকেই একুশে উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল। বাংলা একাডেমিতে নানারকমের নির্বাচিত বিষয় নিয়ে আলোচনা, একাডেমির সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে জনসমাগমমুখর বই মেলা, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের বারোদিন ব্যাপী সঙ্গীত, নাটক, কবিতাপাঠ, শিল্পকলা একাডেমির প্রাঙ্গণে অক্ষরবৃক্ষের প্রতিষ্ঠা এবং ২০শে ও ২১শে সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক অনুষ্ঠান। দর্শক অসংখ্য, কিন্তু এই সব অনুষ্ঠানে সক্রিয় ভূমিকা আছে এমন মানুষও খুব কম নয়। বিশেষ করে শিক্ষিত তরুণদের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ-উদ্যম প্রৌঢ় মনেও উৎসাহ সঞ্চার করে।

আমরা ২০শে বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায় বেরিয়ে দেখলাম চারপাশের সড়কে ছেলেমেয়েরা বসে নানারকমের আলপনা আঁকছে। কিছু বয়স্ক শিল্পী প্রথমে একটা খসড়া ডিজাইন টেনে দিচ্ছেন; তারপরে শিল্পকলার তরুণ ছাত্রছাত্রীরা সেগুলিকে মোটা ব্রাশ দিয়ে স্পষ্টতর করছেন। কোথাও কালো পিচের উপরে বলিষ্ঠ শাদার রেখাঙ্কনে ফুটে উঠছে ফুল, লতাপাতা, জ্যামিতিক নক্সা; কোথাও লাল, নীল, হলদে রঙে তারা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। পাশের বড় বড় দেওয়ালে দীপ্ত অক্ষরে বাংলাসাহিত্যের মহৎ লেখকদের রচনা থেকে উদ্ধৃতি — প্রত্যেকটির বিষয় মাতৃভাষা, তার সৌন্দর্য, ব্যক্তি এবং সমাজের জীবনে তার কেন্দ্রীয় অবস্থান, তার প্রতি সুগভীর ভালবাসার উচ্চারণ। ভাষাপ্রেমী এবং ভাষাশিল্পীদের সেই সমুদ্ভাসিত সমাবেশে আমাদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, মোসারফ হোসেন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, জসীমউদ্দিন, ডক্টর শহীদুল্লাহ। আলপনা, উদ্ধৃতি ছাড়াও পথের বিভিন্ন ধার দিয়ে পোস্টার, কার্টুন, ছবির প্রদর্শনী; পথের মোড়ে নাটক, সঙ্গীত, কবিতাপাঠ; বাংলা একাডেমির বই মেলায় বিরাট জনসমাগম।

কিন্তু শহীদ মিনারের সামনে এসে দেখি সেখানে পথের দুধারে বিস্তর পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে — অনেকের হাতে বন্দুক, অন্যদের হাতে লাঠি। লোকের মুখে শোনা গেল রাত বারোটায় প্রেসিডেন্ট শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ছাত্ররা ঘোর আপত্তি করায় তিনি আসবেন না, প্রথম পুষ্পার্ঘ্য দেবেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর নিরাপত্তার জন্য এতো আরক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে। সকালে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে যাঁদের ১৯৯১ এর একুশে ফেব্রুয়ারি পদক দেওয়া হয় তাঁরাও প্রেসিডেন্টের হাত থেকে সম্মান নিতে রাজী ছিলেন না; প্রধান মন্ত্রীই পদক বিতরণ করেন। যাঁরা একানব্বই এর পদক পান তাঁদের ভিতরে আমার আমার পরিচিত ছিলেন অধ্যাপক আহমদ শরীফ, কবীর চৌধুরী, সালাহউদ্দিন আহমদ এবং সনজীদা খাতুন। ১৯৯২ সালের জন্য যাঁদের নাম ঘোষণা করা হয় তাঁরা সকলেই আমার অপরিচিত; বন্ধুদের কাছে শুনলাম তাঁরা নাকি নির্বাচিত হয়েছেন সরকারের অনুগতজন বলে, কোনো কৃতির জন্য নয়। এ অভিযোগ সত্য কিনা জানা নেই।

রাত বারোটা এক মিনিটে বেগম খালেদা জিয়া সঙ্গীপরিকৃত হয়ে এলেন এবং শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে গাড়ি থেকে নেমে সরাসরি বেদীতে উঠে পুষ্পস্তবক অর্পণ করলেন। তাঁর পরনে ছিল লালপাড়ের কালো শাড়ি। পাঁচ মিনিট পরে তিনি এবং সঙ্গীরা চলে যেতেই আরক্ষীরাও অন্তর্হিত হল এবং বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মতো জনতায় মিনার প্রাঙ্গণ ভরে গেল। সকলেই খালি পা, হাতে ফুলের মালা অথবা তোড়া, কোনো ফুকার বা কোলাহল নেই। শহীদ মিনারে অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পুরোপুরি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে। তারপর সারা রাত ধরে ২১শের বেশ বেলা পর্যন্ত দলে দলে নগ্নপদ স্ত্রীপুরুষ শহীদ মিনারে তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে গেলেন। আজীমপুরে শহীদদের কবরেও সকলে যান শ্রদ্ধার্ঘ দিতে।

একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে এসে মিশেছে ভাষা আন্দোলনের এবং মুক্তিসংগ্রামের শহীদদের মিলিত স্মৃতি। শুধু পিছন ফিরে চাওয়া নয়, বর্তমানের মোকাবিলা এবং ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলার আগ্রহও এই উৎসবে প্রাণসঞ্চার করেছে। একথা সত্য যে বাংলাদেশের ভিতরে বিকাশবিরোধী শক্তি আজও প্রবল — পুরো ১৯৯১ সাল জুড়ে বিভিন্ন ক্যাম্পাসের মধ্যে দুই শক্তির লড়াই চলেছে — ছাত্রলীগ এবং ছাত্রশিবিরের সংঘর্ষে হতাহতের সংখ্যা কম নয়। তা সত্ত্বেও আলাপ আলোচনা এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমার ধারণা যে বাংলাদেশের শিক্ষিত তরুণ তরুণীদের ভিতরে গণতান্ত্রিক চেতনা এবং অভীপ্সা দিনে দিনে প্রবলতর হয়ে উঠছে। স্পষ্টতই দেশে বিচক্ষণ এবং আদর্শবাদী নেতৃত্বের অভাব আছে, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, বলাধান এবং বিকাশের জন্য যেমনতর শিক্ষার প্রসার এবং গণসংগঠন দরকার তা এখনো উনজনের কল্পনার বিষয়মাত্র। তা সত্ত্বেও সেখানকার তরুণ সমাজ যে হাত পা গুটিয়ে নেই, ভাবছে, চেষ্টা করছে, নিজেদের সামর্থ্যে আস্থা হারায় নি, আমার তিন সপ্তাহের অভিজ্ঞতা থেকে তা আমি অনুভব করেছি।

॥ তিন ॥

এবারে ঢাকায় সস্ত্রীক গিয়েছিলাম বিশেষভাবে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের অতিথি হয়ে। সেখানে আমার প্রথমদিনের বক্তৃতার বিষয় ছিল দুই বাংলায় সমকালীন সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি। স্বভাবতই এরকম প্রশস্ত বিষয়ের আলোচনা করবার জন্য আমাকে কয়েকটি প্রধান ধারা এবং অভিমুখিতা বেছে নিতে হয়; বক্তৃতাটি এঁরা পরে প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করবেন। পরে আরেক সন্ধ্যায় এখানে যে আলোচনার ব্যবস্থা হয় সেখানে সমাজ, ধর্ম, ভাষা, রাজনীতি, শহর এবং গ্রামের সম্পর্ক, শিক্ষিত তরুণদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক দায়িত্ব এ সব প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছিল। শ্রোতারা যে সব প্রশ্ন তোলেন তা থেকে তাঁদের মুক্তবুদ্ধির এবং অন্বেষার পরিচয় পাই।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা, ট্রাস্টিবোর্ডের সভাপতি এবং প্রাণপুরুষ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ নিজে কবি, প্রাবন্ধিক এবং অধ্যাপক; কিন্তু তাঁর যে দিকটি আমার কাছে বিস্ময়কর ঠেকে সেটি হল তাঁর অসামান্য সংগঠনশক্তি এবং তাঁর ক্রিয়াকলাপে আদর্শনিষ্ঠা ও বাস্তববোধের সমন্বয়। যতদূর জানি তিনি কোনো দল বা মতবাদের দ্বারা চিহ্নিত নন; দুই বাংলাতেই এই ধরনের অবস্থান বজায় রাখা কঠিন কাজ। এই বিদগ্ধ, মিষ্টভাষী, সুপুরুষটি সম্পর্কে আমি কোনো বিরূপ মন্তব্য শুনি নি। কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৮ সালে; উদ্দেশ্য ছিল, "যাঁরা অনুসন্ধিৎসু, সৌন্দর্যপ্রবণ, সত্যান্বেষী, যাঁরা জ্ঞানার্থী, সক্রিয়, সৃজনশীল — বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র হবে তাঁদের পদপাতে, মানসবাণিজ্যে, বন্ধুতায়, উষ্ণতায়,সচকিত একটি অঙ্গন।" কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য মানসিক উৎকর্ষ — প্রত্যেকেই নিজের প্রদীপ হবেন এটিই কেন্দ্রের কাম্য। এরা ১৯৮৫ সাল থেকে স্কুলকলেজের ছাত্রছাত্রীদের মানসিক উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা করবার জন্য একটি কার্যক্রম নিয়েছেন; তাদের মন ও বয়সের উপযোগী বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বইগুলি পড়ানোর পাশাপাশি নানা ধরনের উৎকর্ষধর্মী কর্মসূচির ভিতর দিয়ে তাদের 'আলোকিত' এবং সমাজসেবায় অনুপ্রেরিত করা এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য। ঢাকা কেন্দ্রে অনেকগুলি পাঠচক্র সক্রিয়; দর্শন, চিরায়ত সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি এখানে নিয়মিতভাবে আলোচিত। বাংলাদেশের মধ্যে ৫২টি জেলায় এঁদের উদ্যোগে অনেকগুলি "বুদ্ধি চর্চা কেন্দ্র" গড়ে উঠেছে; বর্তমানে তাদের মাধ্যমে ৩৩,০০০ ছাত্রছাত্রী এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে। সামনের বছরে এঁরা ৫০,০০০ ছাত্রছাত্রীকে এই উদ্যোগে যুক্ত করবার প্রচেষ্টা করছেন। ঢাকা কেন্দ্রের গ্রন্থাগার নির্বাচন করে এক লক্ষের মতো বই সংগৃহীত হয়েছে; বাংলাভাষার মূল্যবান অথচ দুষ্প্রাপ্য বইগুলির ফটো কপি করিয়ে একটি সমৃদ্ধ সংগ্রহ এঁরা গড়ে তুলছেন; এঁরা চেষ্টা করছেন দেশের প্রতিটি জেলায় ঋদ্ধিচর্চাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে সেখানে এক একটি সুনির্বাচিত ছোট গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে। তাছাড়া

এঁরা নানা দেশের ও ভাষার শ্রেষ্ঠ বইগুলির বাংলা অনুবাদ যাতে স্বল্পমূল্যে পাঠকদের কাছে পৌঁছতে পারে সেজন্য প্রকাশনার কাজও শুরু করেছেন। এই প্রকাশনা থেকে গত বছরে ১০০টি বই প্রকাশিত হয়েছে, ৫০টি বইয়ের অনুবাদ কর্ম শেষ হয়েছে। এঁরা একটি শ্রবণ-দর্শন বিভাগও গড়ে তুলেছেন; তার সংগ্রহশালায় নির্বাচিত উৎকৃষ্ট সঙ্গীতের ১৬০০ লং প্লেইং রেকর্ড এর ভিতরেই সংগৃহীত; দেশবিদেশের উন্নতমানের চলচ্চিত্র সংগ্রহ করে সে বিষয়ে অনুশীলনের ব্যবস্থাও এঁদের কর্মসূচির অন্তর্গত। এই কেন্দ্রে যতবার এসেছি মনে হয়েছে বিশ্বভারতী যদি এমনই একটি কর্মসূচি নিয়ে উদ্যোগী হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যে সাংস্কৃতিক শূন্যতা তরুণদের শুভনাস্তিক করে তুলেছে তা অনেকটা দূর হতে পারে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ক্রিয়াকর্মে অনেক তরুণ যুক্ত, এটি দেখে উৎসাহিত বোধ করেছি।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের অতিথি হলেও আমার নিজের কর্মসূচি সেখানে আবদ্ধ ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে আমন্ত্রিত হয়ে "ইতিহাস ও প্রগতিতত্ত্ব" বিষয়ে বলি; বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্রে আমার বক্তব্যের বিষয় ছিল "একুশ শতকের দিকে"। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ-এ নির্বাচিত বিষয় ছিল "মানবেন্দ্রনাথ রায়ের জীবন ও দর্শন।" সভাপতিত্ব করেন এ. কে. এম. নুরুল ইসলাম। নজরুল ইনস্টিটিউটে জন্মশতবর্ষ বক্তৃতামালায় আমার ভাষণ ছিল "মানবতাবাদ ও নজরুল ইসলাম" সম্পর্কে; অধ্যাপক কবীর চৌধুরী ছিলেন সভাপতি। "গণতন্ত্র ও সংস্কৃতি" বিষয়ে বলি বাংলা একাডেমির সেমিনার কক্ষে। টাঙাইল পাবলিক লাইব্রেরিতে আমার আলোচ্য বিষয় ছিল "বিশ্বমানবতা"; মফস্বল শহরে এ ধরনের বিষয়ে বক্তৃতা শোনবার জন্য এত ছাত্রছাত্রী সমাগম দেখে বিস্মিত হই। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রপ্রতিষ্ঠান 'মুক্তমন' এবং লেখকশিল্পী পাঠক সমাবেশের আমন্ত্রণে আমি দুটি বক্তৃতা দিই। প্রতিটি অনুষ্ঠানেই বিস্তর আগ্রহী ও জিজ্ঞাসু শ্রোতার সঙ্গে পরিচয় হয়; অনেকগুলি বক্তৃতার বিবরণ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়; শুনেছি ঢাকায় এখন নাকি তিরিশটির মতো দৈনিক পত্রিকা বেরোয়; এদের অধিকাংশই টিকবে না; অনেকগুলি পিছনে আছে হঠাৎ বড়লোকের টাকা। কিন্তু আমার মনে হয় স্বৈরতন্ত্রের শাসন থেকে দীর্ঘদিন পরে মুক্ত হওয়ার ফলেই এই ধরনের বহুবাচনিক প্রকাশ প্রবল হয়েছে। গণতন্ত্রের বনিয়াদ দৃঢ় হলে নিরর্থ অপচয় কমে আসবে বলেই আশা করি।

আমার বিভিন্ন বক্তব্য নিয়ে পত্রপত্রিকায় সমালোচনা হয়; বেশ কয়েকটি পত্রিকা বিশেষ বিশেষ প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে ইনটারভিউ নেয়। "আজকের কাগজ" দৈনিকে (২০শে ফেব্রুয়ারি) যে বিস্তারিত সাক্ষাৎকারটির বিবরণ বেরিয়েছিল সেটি পড়েছি; অন্য বেশ কয়েকটি প্রকাশিত ইন্টারভিউ ও বক্তৃতার প্রতিবেদনের কথা বন্ধুদের মুখে শুনেছি, সবগুলি আমি দেখি নি। আমার যে দুটি বক্তব্য নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকা এবং ব্যক্তি সমালোচনা করেন তার একটি হল আমার নাস্তিক দার্শনিকতা নিয়ে (স্বভাবতই ধর্মবিশ্বাসীদের কাছে আমার বক্তব্য ভ্রান্ত এবং ক্ষতিকর ঠেকেছে), অন্যটি বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের মিলন সম্ভাবনা নিয়ে। প্রকাশ্য নাস্তিকের সংখ্যা দুই বাংলাতেই মুষ্টিমেয়; জগৎ এবং মানুষ সম্পর্কে ধর্মীয় ধ্যানধারণার বিকল্প হিসেবে প্রকৃতিবাদ, যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানবাদকে খোলাখুলি সমর্থন করায় অনেক বুদ্ধিজীবীরই দ্বিধাসঙ্কোচ আছে; তবে যাঁরা ধর্মনিরপেক্ষতার সমর্থক তাঁদের ভিতরে অনেকে মুখে না বললেও মনে মনে ধর্মবিষয়ে নিরাসক্ত। কিন্তু ভারতের মতো বাংলাদেশেও ধর্মধ্বজীরা বেশ প্রবল এবং সংগঠিত; যে র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট চিন্তাধারার আমি একজন প্রবক্তা দুই দেশেই তার বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে আমি পরিচিত।

দুই বাংলার সম্ভাব্য এবং কাম্য মিলন সম্পর্কে আমি যা বলেছিলাম সেটি অনেকের কাছে স্পষ্ট না হওয়ায় অনেকে সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। ফলে আমাকে বিভিন্ন বক্তৃতায়, ইন্টারভিউতে এবং ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনায় বক্তব্যটি বারে বারে পরিস্ফুট করতে হয়েছে। খুব সংক্ষেপে আমার বক্তব্যের মূল কথা ছিল, এক ভাষাভাষী যে সব দেশ চল্লিশ/পঁয়তাল্লিশ বছর আগে স্বতন্ত্ররাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছিল এখন তারা অনেকেই পুনর্মিলিত হয়েছে, অথবা হবার চেষ্টা করছে। দুই বাংলাতেই কি এ বিষয়ে ভাববার সময় আসে নি? না, বাংলাদেশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত

হবে এ প্রস্তাব একেবারেই অসঙ্গত এবং আমার কাছে একেবারেই কাম্য ঠেকে না। আমি মুখ্যত সাংস্কৃতিক নৈকট্যের পথে বাধার অপসারণের কথাই ভাবছি। এর দুটি পর্যায় কল্পনীয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বই, পত্রপত্রিকা নিয়মিত ভাবে প্রচুর সংখ্যায় বাংলাদেশে পাওয়া যায়; পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা জনপ্রিয় লেখক তাঁদের বিস্তর বই একাডেমির বই মেলায় দেখেছি। প্রথম পর্যায়ে আমরা কি ব্যবস্থা করতে পারি না যাতে বাংলাদেশের বই পত্রপত্রিকা যথেষ্ট পরিমাণে কলকাতায় আসে? দুই সরকার, দু'দেশের ব্যবসায়ী সমাজ এবং বুদ্ধিজীবীরা তার জন্য সচেষ্ট হলে এটি মোটেই অসাধ্য নয়। ভবিষ্যতে পরবর্তী পর্যায়ে আমি কল্পনা করি একটি দক্ষিণ এশীয় যুক্তরাষ্ট্রের যেমনটি সম্প্রতিকালে পশ্চিম ইয়োরোপে গড়ে উঠেছে, এবং সেই যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তান, ভারত, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেপাল সকলেই সমান অংশীদার হবে। তবে সেটি হবার আগে একটি জরুরি শর্ত আছে। ভারতে একটি যথার্থ সমামেল বা কনফেডারাল ব্যবস্থা না গড়ে ওঠা পর্যন্ত প্রতিবেশী দেশগুলি দক্ষিণ এশীয় যুক্তরাষ্ট্রে কখনোই যোগ দেবে না। এই সমামেল ব্যবস্থা এবং যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে দুই বাংলার মধ্যে ব্যবধান দ্রুত কমে আসবে, হয়ত একদিন দুই বাংলা আবার মিলিত হবে। আমার জীবদ্দশায় তা ঘটবে না জানি, কিন্তু এই বিবর্তনকে আমি অনিবার্য মনে না করলেও কল্যাণকর, সম্ভাব্য এবং কাঙ্ক্ষণীয় মনে করি।

হায়, কলকাতায় ফিরেই খবর পেলাম নৈকট্যের বদলে ব্যবধান বাড়াবার ব্যবস্থাই ভারতে পাকা করা হচ্ছে। বাংলাদেশে চিঠি লিখতে ডাকমাশুল লাগত দেড় টাকা; এখন তা হঠাৎ বেড়ে হয়ে গেল প্রতি চিঠিতে এগারো টাকা। অতঃপর বাংলাদেশের সঙ্গে আমরা কী ভাবে মানস যোগাযোগ বজায় রাখবো — বাড়ানো তো দূরের কথা। অথচ এই আত্মঘাতী নীতির বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে কোনো প্রতিবাদ চোখে পড়ে নি।

॥ চার ॥

বিবরণ শেষ করবার আগে পুরনো এবং নতুন যে সব লেখক ভাবুকদের সঙ্গে এবারে দেখা হল তাঁদের ভিতরে অল্প কয়েকজনের কথা বলি। নামের তালিকা করতে গিয়ে দেখছি উল্লেখ্যদের সংখ্যা একশো ছাড়িয়েছে; তা থেকে বড় জোর আট/দশ জন সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু লেখা যাক।

ঢাকায় আমরা শেষ আট দিন কাটাই ডক্টর হাসনা বেগমের ফ্ল্যাটে। গত বিশ-ত্রিশ বছর ধরে পৃথিবীব্যাপী যে সমাজবিপ্লব শুরু হয়েছে—কয়েক হাজার বছরের সমাজসভ্যতা যাঁদের বিকাশকে প্রায় সব দিক থেকে ব্যাহত করে রেখেছে সেই নারীকুল সম্প্রতিকালে তাঁদের মানবীয় অধিকারাবলী প্রতিষ্ঠার জন্য যে আন্দোলন গড়ে তুলছেন — হাসনা বেগম তার একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দর্শনের অধ্যাপিকা এবং বিভাগীয় প্রধান; এসিয়াটিক সোসাইটির তিনি সম্পাদিকা; নারীমুক্তি আন্দোলন এবং নানা সমাজরূপান্তর সংক্রান্ত সংগঠনের তিনি একজন নেত্রী। আত্মবিশ্বাস এবং উদ্যম থাকলে রক্ষণশীল সমাজেও কীভাবে অন্তত নিজের এবং পরিবারের রূপান্তর ঘটানো সম্ভব তাঁর জীবনকথা তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। খুব অল্প বয়সে বিবাহ হয়; কয়েকটি সন্তানের জননী হবার পর তিনি বিদ্যাচর্চাকেই নিজের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলে মনস্থির করেন; নিজের উদ্যোগে বি. এ. এবং এম. এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম) উত্তীর্ণ হয়ে গবেষণাবৃত্তির সাহায্যে একাই বিদেশে যান উচ্চতর শিক্ষার অভীপ্সা নিয়ে। সেখানে গীতার সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে; আমাকে তিনি বড় ভাইয়ের সম্মান দেন। চার বছর গবেষণার পর অস্ট্রেলিয়ার মনাশ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে ডক্টরেট অর্জন করে ঢাকায় ফিরে আসেন। বিখ্যাত দার্শনিক জর্জ ম্যুওর-এর উপরে তাঁর গবেষণা গ্রন্থটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে; ম্যুওর-এর মহাগ্রন্থ "প্রিন্সিপিয়া এথিকা"র তিনি বাংলায় যে পূর্ণাঙ্গ তর্জমাটি করেছেন সেটির প্রকাশক বাংলা একাডেমি। হাসনা বেগমের ভিতরে চরিত্রের দৃঢ়তা, মুক্তবুদ্ধি, সংগঠনদক্ষতা এবং কৌতুকপ্রসন্নতার সংশ্লেষ দেখে মনে হয় রাজনীতির বাইরে থেকে তাঁর মতো মানুষরাই বাংলাদেশের সুস্থ সমাজসংস্কৃতি গড়ে তুলবেন।

হাসনার মেয়ে টোড়ি এবং জামাই তৌফিক দুজনেই ভাস্কর; তাঁর ছেলে মুনিন নিজস্ব রীতিতে ছবি আঁকে এবং মৌলিক ভাবনাচিন্তাকে বিশেষ যত্নের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে। নতুন যুগের এই উজ্জ্বল পরিবারটির ভিতরে

গীতা এবং আমি যথার্থ আত্মীয়তার সন্ধান পেয়েছি।

ঢাকায় আমাদের সবচাইতে পুরোনো বন্ধু ছিলেন জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা; এই সদাপ্রফুল্ল, যুক্তিনিষ্ঠ, আদর্শবাদী এবং সুপণ্ডিত মানুষটি ছিলেন প্রকৃত অর্থেই জ্যোতির্ময়। একাত্তরের পঁচিশে মার্চের কালোরাতে পাকিস্তানী সেনারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় অধ্যাপককে তাঁর নিজের আবাসে গুলি করে; অসহ্য কষ্ট পেয়ে ৩০শে মার্চ তিনি মারা যান। তাঁর স্ত্রী বাসন্তী সেই সময়কার আর্ত অনুপুঙ্খ বিবরণ লিখেছেন তাঁর অসামান্য বই "একাত্তরের স্মৃতিতে।"

ঢাকায় গেলে আমরা প্রতিবারই কয়েকদিন বাসন্তীর সঙ্গে থাকি; ক্যাম্পাসের ভিতরেই এখন তাঁর ফ্ল্যাট; সেখানেই সকলে দেখা করতে আসেন। বাসন্তী দীর্ঘকাল গেণ্ডেরিয়ার মনিজা রহমান উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন; এই স্কুলের উন্নতি এবং বিকাশে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা সর্বজনস্বীকৃত। নানা সমাজকল্যাণের কাজে তিনি ব্যাপৃত; স্কুল থেকে অবসর নেওয়ার পরে তিনি জাতীয় যাদুঘরের "কথা ইতিহাস প্রকল্পে" আমাদের অনেক দিনের বন্ধু অধ্যাপক সালাহ্উদ্দীনের সহকর্মী হয়েছেন। জ্যোতির্ময়ের মতো সালাহ্উদ্দীনও মানবেন্দ্রনাথ রায়ের শিষ্য; উনিশ শতকী বাংলা রেনেসাঁসের আদিপর্ব নিয়ে তাঁর বিখ্যাত গবেষণাগ্রন্থটির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহাসিকরাও পরিচিত। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ প্রচারে তিনি যত্নবান। বাসন্তীর কন্যা মেঘনা গুহঠাকুরতা বিলেত থেকে ডক্টরেট অর্জন করে এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। আমাদের কন্যাপ্রতিম এই বিদুষী *The Politics of British Aid Policy Formation Towards Bangladesh* গবেষণা গ্রন্থের (১৯৯১) লেখিকা। তাছাড়া তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের "সমাজনিরীক্ষণ" পত্রিকার একজন সহযোগী সম্পাদক এবং নারীমুক্তি আন্দোলনের বিশিষ্ট মুখপত্র "রূপান্তর" এর অন্যতম সম্পাদক ও সংগঠক। মেঘনা তাঁর বিভাগে এবং তাঁদের ফ্ল্যাটে তাঁর অনেক সহকর্মীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা করেছিলেন। মেঘনা এবং তার সহযোগীদের চিন্তায় ও চারিত্র্যে নতুন প্রজন্মের দীপ্ত ও প্রত্যয়ী ভবিষ্যমুখিতা খুবই প্রত্যক্ষ।

হামিদা রহমান মেঘনার আগের প্রজন্মের মানুষ; কিন্তু তাঁর মতো র‍্যাডিক্যাল আদর্শে উদ্বুদ্ধ স্ত্রী বা পুরুষ আমি ভারতে বা বাংলাদেশে বড় একটা দেখি নি। শিক্ষাবিদ্ এবং সমাজসেবী এই মহিলা সারা জীবন নিজের বুদ্ধিবিবেক অনুযায়ী চলবার চেষ্টা করেছেন; বারবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন; শত বাধা বিপত্তি ব্যর্থতা সত্ত্বেও ভাগ্যের কাছে পরাজয় স্বীকার করেন নি। তিনি নিজে থেকে হাসনা বেগমের বাড়িতে এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ করেন, তাঁর অসামান্য "জীবনস্মৃতি" বইটি আমাকে উপহার দেন। এমন অকপট এবং আন্তরিক, সাহসী ও হৃদয়সম্পন্ন আত্মকথা বাংলাভাষায় এতাবৎ খুব কমই প্রকাশিত হয়েছে। ভূমিকায় বন্ধুবর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী যথার্থই লিখেছেন, "সমাজ ও পরিবেশ তাঁকে যতোটা গড়েছে তিনি নিজে তার চাইতে অনেক বেশী গড়েছেন।... (এ বই) অনেক বাধাবিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে মাথা উঁচু করে বেরিয়ে আসা একজন সংগ্রামী মানুষের প্রবল ইচ্ছা, অদম্য মানসিকতার দলিল।" পশ্চিমবাংলায় এই বইটির একটি সংস্করণ অতি অবশ্য প্রকাশিত হওয়া উচিত।

লেখা বাহুল্য চিন্তায় এবং জীবনে মুক্তবুদ্ধি ও বিবেকিতার পরিচয় যাঁরা দেন কোনো সমাজেই তাঁদের জীবন আরামের হয় না। বিশেষ করে স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বাধীনচিত্ত হওয়া সব দেশেই কমবেশি বিপজ্জনক, বাংলাদেশ মোটেই তার ব্যতিক্রম নয়। আমরা থাকাকালে একাডেমির বই মেলায় একটি ঘটনা ঘটে যাতে এটি নাটকীয় ভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঘটনাটির কথা গীতার মুখে শুনি, পরদিন সকালের কাগজে পড়ি। সম্প্রতিকালের একজন খুব বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের সৌভাগ্য হয় নি; গীতা তাঁর দুটি বই একাডেমিক মেলা থেকে কিনে এনেছিলেন; পড়ে মনে হল, আগুন, আগুন — যে আগুনে ঘরবাড়ি পোড়ে আবার যা গাছের শিরাউপশিরা দিয়ে সবুজ পাতায়, নানারঙের ফুলে নিজেকে মেলে ধরে, প্রাণের সেই আগুন তাঁর ভাষায় এবং ভাবনায় অনুভব করি। তিনি প্রবল নারীবাদী; যে পুরুষরা মেয়েদের সমকক্ষ ভাবতে বা শ্রদ্ধা করতে শেখে নি, তাঁর তীক্ষ্ণ আক্রমণাত্মক লেখা তাদের মনে জ্বালা ধরায়। তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বই রক্ষণশীল এবং গুপ্তাপ্রকৃতির কিছু

পুরুষকে এতই উত্তেজিত করে যে এবারের বইমেলায় তারা নাসরিনকে সকলের সামনে অপমান করে, বইয়ের দোকান থেকে তাঁর বই লুঠ করে নিয়ে সেগুলি পুড়িয়ে দেয়। 'বিদ্যাপ্রকাশ' নামে যে সাহসী প্রকাশক প্রতিষ্ঠান তাঁর বইগুলি বার করেছে তারা পর্যন্ত এই গুণ্ডাদের ভয়ে তাঁর বইগুলি মেলাতে দোকানের সামনের অংশে রাখে নি। গীতা দোকানের পিছন থেকে তাঁর তিনিটি বই সংগ্রহ করে আনেন।

নাসরিণ্ কবি, কলাম্‌নিস্ট, প্রাবন্ধিক। তাঁর তিনটি কবিতার বইয়ের নাম: নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে (১৯৮৯), "আমার কিছু যায় আসে না" (১৯৯০), " অতলে অন্তরীণ (১৯৯১)। এই বইটি তিনটি থেকে নির্বাচিত কিছু কবিতা ইংরেজি অনুবাদে বেরিয়েছে: *Light up at midnight* (১৯৯২)। এবছর ফেবরুয়ারি মাসে তাঁর দুটি বই মেলার সময় প্রকাশিত হয়েছে: "বালিকার গোল্লাছুট" (কবিতা) এবং "যাবো না কেন? যাবো" (ব্যক্তিগত প্রবন্ধ)। তাঁর সব লেখাতেই নতুন যুগের বিদ্রোহিনী নারীর আত্মজিজ্ঞাসা এবং সমাজচেতনা, আত্মপ্রত্যয় এবং মুক্তিস্পৃহা, প্রেম এবং ঘৃণা, অভীপ্সা এবং যন্ত্রণা বিঘোষিত। তাঁর সব কবিতা হয়তো উতরোয় নি, কিন্তু তার গদ্যের প্রবল ক্ষুরধার গতি, অনেকক্ষেত্রেই তাঁর বক্তব্যের স্পষ্টতা ও যাথার্থ্য, সততা ও প্যাশন আমাকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছে।

তারুণ্য স্বভাবতই বিদ্রোহের বয়স; কিন্তু প্রবীণ মাত্রেই কিছু রক্ষণশীল নন। ঢাকায় যতবার যাই আমার বক্তৃতা সেমিনারে, আড্ডা আলোচনা নিমন্ত্রণ অনুষ্ঠানে যাঁর সঙ্গে নিয়মিতভাবে মিলিত হই সেই ঔপন্যাসিক-প্রাবন্ধিক-কলামনিস্ট শওকত ওসমান আমার চাইতে বছর চারেকের বড়। পশ্চিমবঙ্গে তিনি সুপরিচিত — তাঁর কৌতুক প্রোজ্জ্বল মুখ চোখ, চওড়া কপাল, পিছনদিকে টানা বিলীয়মান কেশ এবং সুবিন্যস্ত শ্মশ্রু, তাঁর সুতীক্ষ্ণ এবং সরস কথাবার্তা, সব মিলিয়ে তাঁকে আমার মনে হয়েছে বুদ্ধিমত্তা ও বিবেকিতার প্রতিমূর্তি। প্রতিবারই তিনি তাঁর কিছু নতুন বই আমাকে উপহার দেন — প্রত্যেকটি উপহার পৃষ্ঠায় মোটা কলমে বলিষ্ঠ হস্তাক্ষরে একটি করে এপিগ্রাম লেখা থাকে। এবারে দেন তিনটি বই, "উপদেশ কূপ-দেশ" (১৯৯১), "পূর্ণ স্বাধীনতা চূর্ণ স্বাধীনতা (১৯৯০), "হন্তারক" (১৯৯১) একটিতে লিখে দিয়েছেনঃ—

টুপি দেওয়ার কথা ছিল শুধু মাথায়॥ দিলাম আরো মগজে।
এখন লেজ মাপা-গণা দায়॥ শেষ হয়না'ক সহজে॥

অন্যটিতে

ট্র্যাজিকের স্তরে পড়ে মানুষ। করুণার পাত্র প্রাণী। কোনও পর্যায়ে নেই আমাদের স্থান। আমরা হিন্দু অথবা মুসলমান॥

শওকত ওসমান সারাজীবন সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় ভেদবুদ্ধি এবং যুক্তিবিমুখতার বিরুদ্ধে লিখে চলেছেন। যেমন বাংলাদেশ তেমনই ভারতের প্রতি তাঁর অনুরাগ গভীর ও দ্বিধাহীন; কিন্তু তাঁর হৃদয়ের গভীরতম আনুগত্য দেশের বঞ্চিত, ভাষাহীন, অবহেলিত সাধারণজনের প্রতি। তাঁর ভাষা সযত্নসাধিত নয়, কিন্তু তাঁর বক্তব্য এবং প্রতিন্যাস সর্বদাই স্বচ্ছ। তিনি কমিউনিস্ট নন, কিন্তু সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। সভিয়েট ইউনিয়ন, পূর্ব ইয়োরোপ এবং চীনের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা তাঁর সমাজতন্ত্রী প্রত্যয়কে শিথিল করে নি। সংগত কারণেই তিনি মনে করেন শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন যথেষ্ট নয়; দেশের সমস্ত স্ত্রীপুরুষ বিকাশের সুযোগ না পাওয়া পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম অপূর্ণ, তার ফলাফল অনিশ্চিত।

বাংলাদেশের আরেক জন প্রবীণ র‍্যাডিক্যাল ভাবুক আহমদ শরীফ প্রাক্-ব্রিটিশ বাংলার সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ নিয়ে বিস্তর গবেষণাসমৃদ্ধ কাজ করেছেন — বস্তুত এই ক্ষেত্রে তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রাধিকার সর্বস্বীকৃত। মধ্যযুগীয় বাংলার বহু গ্রন্থ ও দুষ্প্রাপ্য পুঁথি তিনি সযত্নে সংগ্রহ ও সম্পাদন করে প্রকাশ করেছেন। তাঁর দুই খণ্ডে লেখা বিশাল গ্রন্থ "বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য" এ ক্ষেত্রে প্রায় একটি বিশ্বকোষ। কিন্তু শরীফের বৈশিষ্ট্য হল তিনি সাহিত্যে মুখ্যত সমকালীন জনজীবনের অনুসন্ধান করেন; ফলে তাঁর সাহিত্য-ইতিহাসে সাহিত্য-বিচারের তুলনায় সমাজের সম্পর্ক বিষয়ে তথ্যাদি অনেক বেশি প্রাধান্য পায়। মধ্যযুগ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ এই মানুষটি মনেপ্রাণে আধুনিক; কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তাঁর যোগ আছে কিনা জানি না, কিন্তু তাঁর র‍্যাডিক্যাল চিন্তার উপরে মার্ক্সীয় প্রভাব বেশ স্পষ্ট। আমি তাঁর

বই পড়ে আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে পত্র লিখি; তিনি সাড়া দিয়ে জিজ্ঞাসা ত্রৈমাসিকের জন্য "আমার জীবনদর্শন" নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে আমাকে পাঠান। তাতে তিনি স্পষ্টভাবেই জানান, তিনি একজন নাস্তিক যুক্তিবাদী মানবতন্ত্রী; তাঁর মতে "জন্মমৃত্যুতেই মানুষের জীবনের আদি-অন্ত সীমিত। মানুষের দেহে মনে সুপ্ত থাকে অপরিমেয় শক্তি ও সম্ভাবনা। সচেতন অনুশীলনের মাধ্যমে তার বিকাশসাধন না করলে জীবনের পূর্ণ রূপ প্রকট হয় না।" ইতিহাসের বর্তমান পর্যায়ে যখন ধর্ম, জাতি, ভূগোল ইত্যাদির সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত হওয়া দরকার, তখন "আস্তিক ও শাস্ত্রমানা মানুষ নির্বিশেষ মানুষের মিলনে মুখ্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।" আহমদ শরীফের সঙ্গে পরে সাক্ষাৎ পরিচয় হয়; সম্প্রতি তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক-পদ থেকে অবসর নিয়েছেন। দর্শন বিভাগে আমার বক্তৃতার পরে আলোচনায় তিনি যোগ দেন; পরে বন্ধুবর সুনীতি হাজারির গৃহে আহার উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হয়। তাঁর একটি মূল্যবান প্রবন্ধ সংকলন "বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালীত্ব" নামে এবছর কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

শরীফ সাহসী এবং প্রত্যয়ী, কিন্তু অধিকাংশ র‍্যাডিক্যাল চিন্তাবিদের মতই তাঁর প্রতিন্যাসে কিছুটা অসহিষ্ণুতা এবং একতন্ত্রিতা আছে। আমার নিজের ক্ষেত্রেও এই ত্রুটি বিষয়ে আমি সচেতন, এবং একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে আমি আলোচনা করে দেখিয়েছি র‍্যাডিক্যালিজ্‌ম এবং হিউম্যানিজম্ এর সমন্বয় কতটা দুঃসাধ্য। হিউম্যানিস্টরাও যুক্তিবাদী, কিন্তু সমকালীন সমাজ-সংস্কৃতির দ্রুত আমূল পরিবর্তনের জন্য আকুতি র‍্যাডিক্যালদের মতো তাঁদের অধীর করে তোলেন না। তাঁরা সহনশীল এবং হিসেবি; অন্যায়কে রোখবার আগ্রহে মস্তিককে উত্তপ্ত হতে দেন না। আমাদের বন্ধু কবি-প্রাবন্ধিক-অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী যথার্থ অর্থে একজন হিউম্যানিস্ট। তাঁর চিন্তা যেমন পরিশীলিত, তাঁর ভাষা, আচরণ বেশভূষা তেমনই রুচির পরিচয় দেয়। তাঁর সব লেখাতেই উদারতন্ত্রী মূল্যবোধ সক্রিয়। মুজীবর রহমানের সময়ে যখন আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে তিন মাসের জন্য বাংলাদেশে যাই ঔপন্যাসিক রশীদ করীম এবং কবি শামসুর রাহমান এর সঙ্গে জিল্লুরও নিয়মিত আমাদের আবাসে আসতেন; তাঁদের সরস আলোচনায় সন্ধ্যাগুলি পরিপূর্ণ হয়ে উঠত। এবারে জিল্লুর তাঁর গৃহে আমাদের আমন্ত্রণ করেছিলেন, রশীদ এবং শামসুর দুজনেই এসেছিলেন, কিন্তু সঠিক সুরটি বাজে নি। শামসুরকে মনে হল অসুস্থ এবং ম্রিয়মান; রশীদের বিদগ্ধ কৌতুকতা রক্তচাপবৃদ্ধির কাছে যেন অনেকটাই পরাজিত; জিল্লুর এবং তাঁর স্ত্রীর অতিথিপরায়ণতাও আমাদের আলাপ-আলোচনায় যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য আনে নি। জিল্লুর তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত প্রবন্ধ সংকলন "বাঙালীর আত্মজিজ্ঞাসা" আমাকে উপহার দিলেন। তাঁর চিন্তায় এবং গদ্যে যে কোনো শিথিলতা বা অস্থিরতা আসে নি বইটি থেকে তা স্পষ্ট।

বাংলাদেশের দুই প্রধান কবি শামসুর রাহমান এবং আলমাহমুদ এক সময়ে পরস্পরের বন্ধু ছিলেন; ঘটনার নানা ঘাতপ্রতিঘাতে এখন তাঁরা সাহিত্যজগতের দুই মেরুতে অবস্থান করেন। আমি দুজনকেই সুহৃদ মনে করি; এবং যদিও বাংলাদেশে আমার পরিচিত বুদ্ধিজীবীদের ভিতরে অনেকে আল মাহমুদের তীব্র বিরোধী বলে জানি, আমি নিঃসন্দেহ যে আল মাহমুদ একজন যথার্থ কবি, এবং ধর্ম ও রাজনীতির সমকালীন ধূলিঝড় প্রশমিত হয়ে যখন আবার পরিষ্কার আকাশ দেখা দেবে তখন তাঁর কবিতার উৎকর্ষ সাধারণ-স্বীকৃতি পাবে। তাঁর সঙ্গে কয়েকবার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে; আমাদের চিন্তার আভিমুখ্য প্রায় ক্ষেত্রেই পরস্পরের বিপরীত; কিন্তু শুধু চিন্তা মিল দিয়ে কাব্যরুচিকে যদি নিয়ন্ত্রিত হতে দিতাম, তাহলে দান্তে অথবা এলিয়ট, এলুয়ার অথবা নেরুদা কি আমার প্রিয় কবি হতেন?

এ যাত্রায় অনেকে আমাদের নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছেন, সুখ সান্নিধ্য দিয়েছেন, গান শুনিয়েছেন, নিজেদের লেখা বই উপহার দিয়েছেন। যদি কর্মব্যস্ত জীবনে সময় মেলে ভবিষ্যতে তাদের কথা লিখব। একটি খুব উপভোগ্য সন্ধ্যা কেটেছিল প্রাবন্ধিক হায়াৎ সাইফের গৃহে — সঙ্গী ছিলেন বাংলাদেশের দুই প্রসিদ্ধ চিত্রকর মুর্তাজা বশীর এবং দেবদাস চক্রবর্তী, তরুণ কবি আবিদ আজাদ এবং ঔপন্যাসিক মীজানুর রহমান শেলী। যাঁদের নাম উল্লেখ করেছি তাঁরা ছাড়াও স্বরচিত বই অথবা স্বগৃহে দাওয়াত দিয়েছিলেন তরুণ কবি রেজাউদ্দিন স্টালিন,

সুহিতা সুলতানা, ইকবাল আজিজ, আবদুল হাই সিকদার, খোন্দকার আশরাফ হোসেন, দুলাল সরকার, ফজল শাহাবুদ্দিন, কামরুল হাসান, অসীম সাহা, মহম্মদ নুরুল হুদা, নির্মলেন্দু গুণ, কবি ও সাহিত্য বিশারদ অধ্যাপক সৈয়দ-আলী আহসান, প্রাবন্ধিক কবীর চৌধুরী, অধ্যাপক মনিরুজ্জমান, সঙ্গীত গবেষক মৃদুল চক্রবর্তী, নজরুল বিশেষজ্ঞ আতাউর রহমান, গবেষিকা সুরাইয়া বেগম এবং তরুণ ভাবুক শাফিকুর রহমান, 'মুক্তমন' এর তরুণ সংগঠক ইশারফ হোসেন, প্রাবন্ধিক-ঔপন্যাসিক আহমদ ছফা, কথাসাহিত্যিক মাফরুহা চৌধুরী, নাসরীন জাহান, খুরশীদ আলম, আহমদ মাজহার, সুফিয়া রহমান, কালাম ফয়েজী, বন্ধুবর ডক্টর তাজুল হোসেন এবং টাঙাইলের সুধী আইনবিদ কামাক্ষানাথ সেন। ফেব্রুয়ারি মাসের আঠারটি দিন এঁরা এবং অন্য যে তরুণ-তরুণীরা আলোচনা যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা পরিপূর্ণ করে তোলেন।

বাংলাদেশের সমস্যা অনেক, সামনে বাধা বিপত্তি বিস্তর, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যদি বাংলাভাষা এবং বাংলাসংস্কৃতির আবার উজ্জীবন হয় তবে সেটা বাংলাদেশেই শুরু হবে এবং হয়ত তার অনুপ্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গেও আরেকবার জাগরণ ঘটতে পারে।

১০ই এপ্রিল, ১৯৯২

লেখক পরিচিতি

শিবনারায়ণ রায়

জন্ম: ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ

শিক্ষাগ্রহণ: কলকাতা, লণ্ডন ও চিকাগো রকফেলোর ফাউন্ডেশন ফেলো - ১৯৫৬-৫৮
অধ্যাপক-সিটি কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-১৯৪৬-৫৬ ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক-বোম্বে ইউনিভারসিটি-১৯৬০-৬৩ অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান-ইন্ডিয়ান স্ট্যাডিজ, মেলবর্ণ ইউনির্ভাসিটি, অস্ট্রেলিয়া-১৯৬৩-৮১ ভিজিটিং প্রফেসর, ক্যালিফোর্নিয়া ইউনির্ভাসিটি-১৯৭০-৭১
ডিরেক্টর রবীন্দ্র ভবন, বিশ্বভারতী - ১৯৮২-৮৪ গবেষণা পরিচালক ইন্ডিয়ান রেনেসাঁ ইন্সটিটিউট - ১৯৮৪-আজ পর্যন্ত।

গ্রন্থ:

প্রেক্ষিত; সাহিত্যচিন্তা; নায়কের মৃত্যু, মৌমাছি তন্ত্র; কবির নির্বাসন; রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপীয়ার ও নক্ষত্র সংকেত ইত্যাদি। Radicalism; In Man's own Image; Explorations; Apartheid in Shakespeare, Rabindranath Tagore; The Intelligentia etc.

ছন্দরীতি

মহাদেব সাহা

তোমাদের কথায় কথায় এতো ব্যাকরণ
তোমাদের উঠতে বসতে এতো অভিধান,
কিন্তু চঞ্চল ঝর্নার কোনো ব্যাকরণ নেই
আকাশের কোনো অভিধান নেই, সমুদ্রের নেই।
ভালোবাসা ব্যাকরণ মানে না কখনো
হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো সংবিধান নেই,
হৃদয়ে যা পারে তা জাতিসঙ্ঘ পারে না
গোলাপ ফোটে না কোনো ব্যাকরণ বুঝে!
প্রেমিক কি ছন্দ প'ড়ে সম্বোধন করে
নদী চিরছন্দময়, কিন্তু সে কি ছন্দ কিছু জানে,
পাখি গান করে কোন ব্যাকরণ মেনে —
তোমরাই বলো শুধু ব্যাকরণ, শুধু অভিধান!
বলো প্রেমের কি শুদ্ধ বই, শুদ্ধ ব্যাকরণ
সঠিক বানান কেউ কি কখনো খোঁজে প্রেমের চিঠিতে,
কেউ কি জানতে চায় প্রেমালাপ স্বরে না মাত্রায়?
নীরব চুম্বনই জানি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছন্দরীতি।

লোকাচার হবে

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

জালপাতা ঢাকা বটগাছে
ওপারে অস্বস্তি আলো, ভয়
ঘাস আঁকড়ে পড়ে আছি উপুড় বটের পায়ে
ও বট, কাপড় কেড়ে নিলে —
এই সব-খোলা দেহ
কুঁকড়ে আছি ভিখিরি সমান
আমার কাপড় কই আকাশ, কাপড়?
একমাত্র লজ্জাবস্ত্র লাল
অপরাহ্ন বিষে লিপ্ত হল।
এখন সূর্যাস্ত হবে, মায়া হবে, লোকাচার হবে।

আপাদমস্তক ঢাকো দেহ
ছেঁড়া প্রাবারকে
আকাশ নামাও পরিত্রাণ।

সন্তানের হাত

রেজাউদ্দিন স্টালিন

মাতৃচোখ থেকে নেমে গেছে পথ বাঁকা ও বিনয়ী
ধুধু গোধূলির গর্বে ফেটে গেছে মাতৃদৃষ্টি দিগন্তের দেহে
তার সন্তানের রণক্ষেত্র ঐখানে

বিশাল বিদায়

চুম্বনের অন্তিমলগ্নে অশ্রুবৃষ্টি ভিজিয়ে দিয়েছে মাতৃত্যাগ
প্রত্যাবর্তনের শর্তে ছিন্ন হয় শেষ লগ্ন
সন্তানের পেছনে পেছনে যায়:
নিঃশব্দ হাহাকার, বোবাকান্না, অদৃশ্য আগুন
আর অনন্ত অপেক্ষার কোলে ঢলে পড়ে দৃষ্টিসূর্য
রক্তিম ধূসর

সহোদরাদের বুক এই মর্মান্তিক সহ্য করে নেয়
প্রতিবেশীদের সান্ত্বনার সরোদে আর্তসুর প্রতিধ্বনিত
হতে থাকে: দেবশিশুতুল্য ঐ যুবকযোদ্ধার
মঙ্গল হোক বলে প্রকৃতিও ঢুকে যায় রাতের রেহেলে
তখন চাঁদ ও তারার জন্মে মাতৃমন
হিরন্ময় প্রান্তরে ধাবিত

নিশ্চয় ফিরে আসবে বিজয়ে বিজয়ে
তার সন্তানের মাথার মুকুট মমরিত হবে
এই আত্মবিশ্বাসে মাতৃপ্রতীক্ষার দীর্ঘ প্রহর
মুহূর্ত, নিমেষমাত্র হয়ে যায়

পরিচিত পায়ের শব্দ শোনা যায়
ঐ তো বিজয়, ঐ তো সন্তানের হাত
ফুল ও অস্ত্রের গৌরবে উঁচু হয়ে আছে

তুমি কি আর পারো?

নিভা দে

তোমার সাদা পাঞ্জাবী কি খুব বেশি সাদা? কত সাদা?
আমি তোমার দু-চোখে তাকিয়ে কথা বলবো পবিত্র শ্বেতকণ্ঠে
তুমি কি খুব বেশি উঁচু? কত উঁচু — আকাশ ছুঁতে পারো এখনও?
আমি তোমার ওই ঝুঁকে পড়া-ক্রমশ দু-চোখে সটান তাকাবো —
তুমি কি খুব খুব দ্রুত পথ হাঁটো? নিজস্ব পায়ে তোমার এত জোর?
আমি বিনা রণ পায়ে ঠিক ছুঁয়ে ফেলব তোমাকে
দু-চোখে তাকাব তোমার দু-চোখে ঋজু
অম্ল ও জলে পুড়িয়ে দেব তোমার দু-চোখ
তুমি কি পারো - সাদা সটান চোখে তাকাতে
এই আমার দিকেও? সেই আগের মতো?

ইংরেজি সাহিত্য-সমালোচনা : পথের শেষ কোথায়?

সুকান্ত চৌধুরী

সাহিত্য-সমালোচনা বলতে আমরা যা বুঝি, তার ইতিহাস খুব বেশিদিনের নয়। আমি এখানে পাশ্চাত্য ধারার কথাই ভাবছি। ইউরোপীয় মধ্যযুগে সাহিত্য-সমালোচনা কেন, "সাহিত্য" বলে কোন বোধ বা সংজ্ঞা ছিল কিনা সন্দেহ। রেনেসাঁসের সময় থেকে "সাহিত্যের" ধারণা গড়ে উঠতে থাকে। তার অবলম্বন হয় প্রাচীন গ্রীস ও রোমের কতকগুলি ভাব ও তত্ত্ব, যদিও প্রাচীন ক্লাসিকাল বা ধ্রুপদীযুগে ঠিক আধুনিক অর্থে সাহিত্য-সমালোচনা খুঁজে পাওয়া ভার। আরিস্টটলের 'কাব্যতত্ত্ব' খুব সম্ভব তার নিকটতম প্রচেষ্টা; এবং সেই কারণেই রেনেসাঁসে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি যে মৌলিক স্বীকৃতি পায় আরিস্টটলের নিজের যুগে তা পায় নি। তার পরিপূরক (ও পরিশিষ্ট) হিসাবে পঠিত হয় প্লেটোর কিছু সংলাপমালা।

রেনেসাঁসে সাহিত্যের ধারণাটা জন্ম নেয় প্রধানত দুটি চর্চা বা তত্ত্ব থেকে। তার একটি কাব্যতত্ত্ব বা পোয়েটিক্স। অন্য, বেশি ব্যাপক, সহজে জনপ্রিয় ধারাটি 'রেটরিক'। এর বাংলা তর্জমা হয় 'অলঙ্কার শাস্ত্র'; কিন্তু সেটা বলতে আমরা যা বুঝি রেটরিকের উদ্দেশ্য ও উপায় তা থেকে কিছু ভিন্ন। শুধু অলঙ্কারের ব্যবহার বা বাকচাতুরী নয়, মূল বিষয়বস্তুর উদ্‌ভাবন ও বিন্যাস—সবটাই রেটরিকের এক্তিয়ার। (রেনেসাঁসের বহু পণ্ডিতের মতে অবশ্য এই সম্পূর্ণ ক্ষেত্রটি তর্কশাস্ত্র বা লজিক এবং অলঙ্কার শাস্ত্র বা রেটরিকের যুগ্ম অধিকার, কিন্তু সে কচকচি থাক।)

এত সত্ত্বেও রেটরিকের মানসরাজ্যে ভাব ও ভাষা, উদ্দিষ্ট অর্থ ও তার বহিঃপ্রকাশ — বলা যেতে পারে বাস্তব বহির্জগৎ ও শব্দের কল্পলোক — শেষ অবধি একাত্ম হয় নি। একটি ভাব যেন আদি ও স্বয়ম্ভর: পরবর্তী, আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়ায় তাকে ভাষা দিয়ে সাজানো বা ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে মাত্র। Res ও verba, বস্তু ও ভাষা — রেটরিকের দৃষ্টিতে দুটি পৃথক। পোয়েটিক্স এর বিচারে বরং ভাষা ও রূপ (form) এর মধ্য দিয়েই 'বক্তব্য' বা 'বাস্তব' নির্মীত হচ্ছে। এখানে শব্দই ব্রহ্ম: ভাষালব্ধ রূপ বা সৃষ্টি উপলব্ধিকে ধারণ করছে। তাই বলা যায়, রেটরিক থেকে পোয়েটিক্সের জগতে উত্তরণ-ই হল আধুনিক সাহিত্যবোধের সূচনা ও সেই সঙ্গে আধুনিক সাহিত্য-সমালোচনার উদ্ভাবন।

আর একটি কথা। পুরাকালে রেটরিক ছিল বাগ্মীর চর্চা বা কৌশল: আদালত, প্রশাসন বা রাজনৈতিক

সভায় বক্তৃতাদানের আর্ট। সে যুগেও তা লেখা ভাষায় প্রযুক্ত হয়েছিল; মধ্যযুগে হয়েছিল পত্ররচনা ও ধর্মভাষণ (sermon)- এ। রেনেসাঁসে রেটরিক হয়ে দাঁড়ায় মুখ্যত লিখিত রচনার কৌশল। এখানে রেটরিক ও পোয়েটিক্সের মধ্যে বিশেষভাবে সেতুবন্ধন করেছিল আরেকটি প্রভাবশালী প্রাচীন রচনা, হোরেসের 'কাব্যশিল্প' (Ars Poetica)।

পুরাকালে নানা সমাজব্যবস্থায় রেটরিকের নানা ব্যবহার ঘটলেও, তার আদি ও প্রধান লীলাক্ষেত্র ছিল গ্রীসের কয়েকটি গণতান্ত্রিক নগররাজ্যে ও প্রজাতান্ত্রিক যুগের রোমে। রেনেসাঁসে, বিশেষত তার আদি পীঠস্থান ইতালিতে, প্রায় প্রত্যেক রাজাই ছিল নব্য-সামন্ততান্ত্রিক, একনায়কবাদী বা গোষ্ঠীশাসিত। বক্তৃতা বা বিতর্কের স্থান এমন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বড় ছিল না; বরং প্রশস্তি রচনার অবকাশ ছিল বেশি, শাসকসভার এলিট গুণীসমাজের মধ্যে, ও ক্রমশ মধ্যবিত্ত সমাজে তার প্রতিকলন ও বিস্তৃতিতে, রেনেসাঁসের শিল্প-সাহিত্য গড়ে ওঠে। এই সাংস্কৃতিক গর্ভক্ষেত্রেই আধুনিক অর্থে "সাহিত্যের" ধারণা জন্ম নেয় বলা চলে। প্রতিবাদী সাহিত্য অবশ্যই ছিল; ছিল যথার্থ লোকসাহিত্য, এলিট চেতনার সঙ্গে যার প্রচুর জটিল আদান-প্রদান চলেছে। কিন্তু এগুলিকে আমরা সাহিত্য বললেও তার স্রষ্টা ও গ্রহীতারা ঐ সংজ্ঞাভুক্ত করতেন কিনা সন্দেহ।

উচ্চশ্রেণী-অনুপ্রেরিত, হিউমানিস্ট গুরুকুলের সাধনাপুষ্ট সাহিত্যবোধে একটা অভিমানী শুচি-সতর্কতা গোড়া থেকেই ছিল। আর ছিল সাহিত্যের শ্রেণীভাগ ও রচনারীতি সম্বন্ধে কিছু সনাতনধর্মী বিধি (প্রায়শই যথার্থ সনাতন বিধি নয়), ক্ষেত্রবিশেষে একটা নিয়মবাগীশ গোঁড়ামি ও সর্দারি। সাহিত্যের আলোচনা তাই একদিকে চলে যায় বিভিন্ন দার্শনিক ও তাত্ত্বিক প্রসঙ্গে: স্থূল বা সূক্ষ্ম, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে, সাহিত্যের উদ্দেশ্য নীতিমূলক বা শিক্ষামূলক (didactic) বলে গৃহীত হয়। এমন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার বিপরীত মেরুতে আমরা পাই বিশেষ-বিশেষ রচনার (প্রধানত প্রাচীন গ্রীক ও লাটিন রচনার) বিশদ, সুনির্দিষ্ট, চুলচেরা পাঠ ও বিশ্লেষণ, — যার মূল উপজীব্য অবশ্যই সাবেক রেটরিক। এই সূক্ষ্ম প্রলম্বিত টীকা-ভাষ্যের সঙ্গে তাত্ত্বিক আলোচনার সংমিশ্রণে জন্ম নেয় সেই নিয়ন্ত্রক নীতিনির্ধারক সাহিত্যচিন্তা যাকে আমরা বলি নব্য ধ্রুপদীবাদ (Neo-classicism)। ইংরেজি সাহিত্যে এই চিন্তার রং লাগে সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে, তাও বেশ ফিকে ভাবে। ইউরোপে কিন্তু এর ভিত পোক্ত হয়েছে অন্তত একশ বছর আগে।

নব্যধ্রুপদী চিন্তা যে সবসময় শিল্পকে বাঁধা ছাঁচে ঢালে বা তাত্ত্বিক-নৈতিক দাবি তুলে শিল্পের স্বয়ম্ভূতার বিনাশ ঘটায় এমন নয়। বরং তা তখনই সবচেয়ে ফলপ্রসূ হয়, যখন অনুপুঙ্খ সংবদ্ধ বিচার ও বিশ্লেষণে শিল্পরূপের স্বকীয়তা প্রস্ফুটিত করে তোলে। আরিস্টটলের কাব্যতত্ত্বের উপর কাসতেলভেত্রোর বিখ্যাত ভাষ্যে এই ধারাটি চমৎকারভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু মানতেই হবে যে নব্যধ্রুপদী সাহিত্যবিচার মূলত নিয়ন্ত্রক, বাধাকারী, পূর্বসিদ্ধ (a priori)। প্রাচীন ধ্রুপদী সাহিত্যের ভিত্তিতে, বহুলাংশে তার নতুন ব্যাখ্যা করে এমনকি বিকৃতি ঘটিয়ে, নব্যধ্রুপদী চিন্তা একটা শাস্ত্রবিহিত আপাত স্থায়ী পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে, যার ভিতরে লেখককে স্থান করে নিতে হয়। সমালোচক কার্যত হয়ে দাঁড়ান বিচারক বা পরীক্ষক, লেখক পাশনম্বর-প্রার্থী।

ইংরেজি সাহিত্যে নব্যধ্রুপদী ধারা কখনই বেগবতী হয় নি। ড্রাইডেন-পোপের মত 'অগাস্টান' কবিরাও একে তেমন নিবিড়ভাবে গ্রহণ করেন নি। আদত সাহিত্যে ধারাটি ক্ষীণ বলেই এই যুগের ইংরেজি সমালোচনা পড়ে সবচেয়ে বেশি মনে হয়, এর তাত্ত্বিক অংশটুকু বাদ দিলে বিশেষ-বিশেষ রচনার যে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন পাই, তা যেন পরিপূর্ণতা লাভ করছে না। তাতে অজস্র মূল্যবান ব্যাখ্যা ও মন্তব্য আছে, সূক্ষ্ম ও গভীর পাঠের প্রমাণ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, কিন্তু তা আলোচ্য রচনাগুলিকে আত্মস্থ করে নি বা করতে চায় নি: তার নিজস্ব মানদণ্ডে নৈর্ব্যক্তিকভাবে বিচার করেছে কেবল। এই সমালোচনায় নিষ্ঠা আছে, সহ-অনুভূতি নেই; অনুপুঙ্খতা আছে, নিবিড়তা নেই। প্রত্যেক শিল্পকীর্তির বিশেষ গঠন, ভাষা ও আঙ্গিকের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তার শৈল্পিক ধর্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট শ্রদ্ধা বা মমতা নেই।

লেখা বা লেখকের একান্ত বৈশিষ্ট্যের প্রতি মনোযোগ প্রথম স্পষ্ট ও ব্যাপক হয়ে ওঠে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যায়ে; তার পূর্ণ বিকাশ ঘটে রোমান্টিক যুগে। রোমান্টিক ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও তার সাহিত্যিক প্রতিফলন বহু-আলোচিত বিষয়, সে প্রসঙ্গে যাব না। তার পাশাপাশি কাজ করছে এক ধরনের জাতীয়তাবোধ বা আঞ্চলিক বোধ। এর উৎস জার্মানিতে: গ্রীস-রোমের ধ্রুপদী ঐতিহ্যের একচ্ছত্রতা বিলোপ করে প্রত্যেক অঞ্চল, যুগ ও জাতির সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা এর ফলে স্বীকৃত হল। শিল্পের বিবর্তন প্রণালী সমালোচকের চেতনায় বহুমুখী রূপ নিল। অতএব শিল্পবিচারের একটা প্রাথমিক শর্ত হয়ে দাঁড়াল প্রত্যেক শিল্পকীর্তি ও তার পরিমণ্ডলের একান্ত বিশেষ বোধ: শিল্পী ও তাঁর রচনাকে তাঁরই নিজস্ব আখ্যায় উপলব্ধি করা, বলা চলে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা। শিল্পী আর সমালোচকের পারস্পরিক অবস্থান গেল উলটে। সমালোচক এখন আর শাসক নন, অনুধাবক, বিচারক নন, ব্যাখ্যাতা, এমনকি শ্রোতা।

এই নতুন ধারায় সবচেয়ে বেশি মহিমান্বিত হলেন শেক্‌সপিয়র। নব্যধ্রুপদী তত্ত্বে তাঁর কীর্তির উপযুক্ত ব্যাখ্যা বা মূল্যায়ন সম্ভব ছিল না। অথচ তাঁর প্রতিভাকে স্বীকার না করে উপায় নেই। ঐ যুগের সমালোচকদের কাছে তিনি ছিলেন একটা স্থায়ী অস্বস্তির কারণ, ফেলাও যায় না গেলাও যায় না, জার্মান ও ইংরেজি রোমান্টিক সমালোচনায় তিনি হয়ে উঠলেন আরাধ্য অতিমানব।

সমালোচনার এই নতুন ধারায় বিশ্লেষণের অবকাশ ছিল আগের মতোই প্রচুর, যদিও সে যুগের ভাবালুতায় প্রায়ই তার সদ্ব্যবহার ঘটে নি। পুরনো রেটরিকধর্মী সমালোচনায় আঙ্গিকের বিশ্লেষণ করা হত প্রকাশরীতি ও গঠনরীতি নির্ণয়ের তাগিদে। নতুন ধারার উদ্দেশ্য হল শিল্পীর ব্যক্তিত্ব-উন্মেষ, বৃহত্তর কোনও তত্ত্ব বা দর্শনের খোঁজ, আধ্যাত্মিক-আধিদৈবিক অনুভূতির সঞ্চার। এই অর্থেও সমালোচক হয়ে উঠতে পারেন মূল রচয়িতার অনুধাবক, পরিপূরক: তাঁর ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়ে লেখকের সৃষ্টির ধারা আরও এগিয়ে যেতে পারে, স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। এমন সৃষ্টিশীল সমালোচনা অনেক সময় মূলের বিকৃতি ঘটিয়ে বা উদ্ভাসের আতিশয্যে সুধীসমাজের বিড়ম্বনার কারণ ঘটায়; কিন্তু এর গভীরে রচয়িতা ও গ্রহীতার যে সাহচর্যের ইঙ্গিত রয়েছে, সেটা আমাদের এত পরিচিত বলে তার প্রগাঢ় অভিনবত্ব আমরা ধরতে পারি না। আধুনিক পাঠককেন্দ্রিক সাহিত্যতত্ত্বের এটা একটা বিরাট উৎস।

একটু আগে বলেছি, এই ক্রান্তিকারী সাহিত্যবোধের মধ্যে — আগের রেটরিকধর্মী সমালোচনার মতোই — আঙ্গিকের গভীর বিশ্লেষণের সম্ভাবনা নিহিত ছিল। কিন্তু উচ্ছ্বাস ও আধ্যাত্মিকতার গণ্ডি অতিক্রম করে সেই সম্ভাবনা যে আধুনিক আকাডেমিক সমালোচনায় বাস্তবায়িত হল। তার পিছনে অপর কিছু শক্তি কাজ করেছে। এগুলি তাত্ত্বিক বা নান্দনিক নয়, সামাজিক। এদের বুঝতে তৎকালীন শিক্ষার ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে।

যে নতুন সামাজিক বোধ সূক্ষ্ম স্তরে রোমান্টিক কবিদের রাজনৈতিক চিন্তায় দেখা যায়, তার সার্বজনীন বাস্তবানুগ প্রকাশ ঘটেছে উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ইংল্যান্ডের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনে। তার একটি দিক হল ব্যাপকতর শিক্ষাব্যবস্থা, ও সেটির অঙ্গ হিসাবে উচ্চশিক্ষার সংস্কার। এর ফলে যে নব্য শিক্ষিত সমাজ সৃষ্টি হল, তার ধ্যানধারণা পঠনপাঠন সবই পাবলিক স্কুল ও অক্‌সফোর্ড-কেমব্রিজের উচ্চশ্রেণীপুষ্ট প্রচলনের বিপরীত। নতুন শিক্ষায় চিরাচরিত গ্রীক-লাটিনের ছোঁয়া অল্পই লাগার সুযোগ পেল। সাবেক "ধ্রুপদী শিক্ষায়" যে রেটরিকধর্মী সাহিত্যবোধ জীইয়ে রাখা ছিল, নবাশিক্ষিতদের মধ্যে দেখা গেল তার একান্ত অভাব। অথচ সামাজিক তাগিদে, শিক্ষার এই নতুন আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে বা সোজা কথায় জাতে তুলতে, এমন একটা কিছুর দরকার পড়ল যা পুরনো ধ্রুপদী "মানবিক শিক্ষার" সাহিত্যচর্চার সঙ্গে তুলনীয়।

এই তাগিদ থেকেই জন্ম নিল ইংরেজি সাহিত্যের আকাডেমিক চর্চা। বিশ্লেষণের ব্যাপ্তি ও সূক্ষ্মতায় তা কালে ধ্রুপদী সাহিত্যশিক্ষার সমকক্ষ হয়ে উঠল, কিন্তু তার উদ্দেশ্য গোড়া থেকেই হল রেটরিকধর্মী নয়, তাত্ত্বিক ও মানবিক; আঙ্গিক বা গঠনমুখী নয়, অনুভূতি বা বাস্তববোধের আরও গূঢ় বিচারে সর্বাত্মক।

এই সমালোচনার উন্মেষ, ও বিদ্বৎসমাজে তার প্রতিষ্ঠা, একটা বিরাট সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের রূপ নেয়। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠা যেহেতু এলিট ধ্রুপদী চর্চার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এর শর্তই হয়ে দাঁড়ায় যে সামাজিক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটা উহ্য রাখতে হবে: সমালোচনার ভাষা ও ভাবমণ্ডল

আপাতদৃষ্টিতে হবে আত্মমগ্ন, ‘‘বিশুদ্ধ’’ নান্দনিক, মানবিক অথচ সার্বজনীক, স্থানকালমুক্ত। এই সমালোচনার ভিত গড়ে গিয়েছেন ব্র্যাডলি, গ্রিয়রসন, উইলিয়ম পেটন কের প্রমুখ। উত্তরসূরীরা এঁদের অতিক্রম করেছে, বহুলাংশে সংস্কার ও বর্জন করেছে, তবু এঁরাই তাদের গুরুস্থানীয়। এঁদের পাশাপাশি আরও পোক্ত পাঠ ও তথ্যভিত্তিক গবেষণায় লিপ্ত ছিলেন স্কীট, রাইট, পলার্ড, ম্যাককেরো, গ্রেগ।

।। দুই।।

আমার আলোচ্য বিষয় সমকালীন ইংরেজি সমালোচনা। এই দীর্ঘ উপক্রমণিকার দরকার পড়ল এইজন্য যে পটভূমিকা বাদ দিলে বর্তমান সম্বন্ধে আমার বক্তব্য প্রকাশ পেত না। যে ধারাগুলি আমি আলোচনা করতে চাই, তাদের মূল ধর্মই হল পট পরিবর্তন।

বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের চোখে যেটা ইংরেজি সমালোচনার সনাতন ধারা, ইতিহাসের বিচারে তা নেহাত অর্বাচীন, বয়স মাত্র একশ বছর। তুলনায় গ্রীক-ল্যাটিন সাহিত্যপাঠের ঐতিহ্য দু-আড়াই হাজার বছর আগের ভাবধারার ভিত্তিতে অন্তত ছয়শ বছর ধরে গড়ে উঠেছে। তার নিজস্ব সুস্থির গতি বহুযুগ ধরে সামাজিক তাৎক্ষণিকতা অস্বীকার করতে পেরেছে, বা স্বয়ং একটি রক্ষণশীল শক্তি হিসাবে সমাজকে প্রভাবিত করেছে। তবু গত পঞ্চাশ বছরের প্রবল সামাজিক টানাপোড়নে সেই ধ্রুপদী বিদ্যাচর্চার যুগান্তর ঘটেছে। ইংরেজি সাহিত্যপাঠের ভিত অনেক কাঁচা, একটি বিশেষ সাম্প্রতিক যুগের উদ্ভাবন। যুগ পালটালে ধারা পালটানোর তাগিদটা যে আরও দুর্জয় হবে, তাতে আশ্চর্য কি?

পরিবর্তনের একটা বড় কারণ ঐ গ্রীক-লাটিন চর্চার ক্ষয়িষ্ণুতা। বিলেতে আর প্রায় কেউ-ই গ্রীক পড়েনা, লাটিনও পড়ে কম। ফলে গ্রীক-লাটিনের তুলনায় ইংরেজি সাহিত্যপাঠের যে অপকর্ষবোধ বা হীনমন্যতা ছিল, আজ তার অবকাশ নেই। সাহিত্যপাঠ ও সমালোচনা বলতে এখন ও-দেশে মুখ্যত ইংরেজি সাহিত্যের কথাই ভাবা হয়। তার সমালোচক ও বিশেষজ্ঞেরা গ্রীক-লাটিন জানেন কম বা মোটেই নয়। (কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই আছেন।) ফলে ইংরেজি সাহিত্য পড়ার রীতিও গেছে বদলে।

শিক্ষাগত পালাবদলের সঙ্গে কিছু বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনও ঘটেছে। ভিকটোরীয় যুগে গ্রীক-লাটিন পড়ত উচ্চবিত্ত ও শিক্ষাভিমানী মধ্যবিত্তেরা, ইংরেজি পড়ত সাধারণ ছাত্রের দল। এই তফাৎটা এখন নেহাতই অচল। ইংরেজ এলিট সমাজ ইংরেজি নিয়েই মেতে আছেন; গ্রীক-লাটিন বিশারদরা বরং সম্মানিত হলেও প্রত্যান্তিক, প্রায় উপেক্ষিত। তাছাড়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে শাসকদল নির্বিশেষে ব্রিটিশ প্রশাসনের সমাজবাদী ও সাম্যবাদী প্রবণতায় (শ্রীমতি থ্যাচারের আমলে অবশ্য তা মস্ত ঘা খেয়েছে) সব শ্রেণীর সব অবস্থার ছাত্রছাত্রীরাই সব পাঠক্রমে প্রবেশাধিকার পেয়েছে। সুযোগের তারতম্য এখনও যথেষ্ট প্রকট: তবু গরিব বা গ্রাম্য ঘরের ছেলেমেয়েরা আজ অনেক কম শ্রেণীসচেতনভাবে, অনেক কম কুণ্ঠায় ও আত্মোন্নতির জেদে সাহিত্য পড়তে আসে।

আরও বলার আছে। ইংরেজি সাহিত্যপাঠ ও সমালোচনার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র হল আমেরিকা। সেখানে গ্রীক-ল্যাটিন চর্চা হয় নি বা হয় না এমন নয়, কিন্তু সাবেককালেও তার স্থান ছিল সামান্য (নিউ ইংল্যান্ডের কয়েকটি রক্ষণশীল রাষ্ট্র বাদে), এখন প্রায় বিলুপ্ত। অন্যান্য ইংরেজভাষী দেশে, এমনকি আমাদের দেশের মতো ভিন্নভাষী একদা উপনিবেশে, ইংরেজি সাহিত্যপাঠ নতুন ও কিছুটা স্বতন্ত্র পথ নিয়েছে। এ সবের ফলেও এই চর্চার ধ্রুপদী দৃষ্টিভঙ্গি হ্রাস পেয়েছে, সেই ধারায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও আজ অতটা অপরিহার্য মনে হয় না।

আর একটি কথা মনে রাখতে হবে, ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি পাঠক্রম চালু হয়েছিল বহুলাংশে একটি বিশেষ উপেক্ষিত নব্যশিক্ষিত শ্রেণীর জন্য — অর্থাৎ নারীজাতি। সেই ধারা অব্যাহত আছে। বস্তুত এই ক্ষেত্রে আজ মেয়েদের যতটা প্রাধান্য, বোধহয় সারস্বতজগতের আর কোথাও নয়। ধ্রুপদী শিক্ষা থেকে প্রায় চিরবঞ্চিত নারীজাতির এই দুর্লভ আধিপত্যে ইংরেজি সমালোচনার কতগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা দেবে, তা সহজেই অনুমেয়। গত কয়েক দশকে নারীমুক্তি আন্দোলনের বিস্তারের সঙ্গে নারীদের বিশেষ বিচরণক্ষেত্র এই সাহিত্যপাঠের সামাজিক চরিত্র উত্তরোত্তর আরও স্বকীয় হয়ে উঠেছে। সরাসরি নারীবাদী (Feminist) সমালোচনা তার সবচেয়ে স্পষ্ট প্রকাশ মাত্র।

অতএব দেখা যাচ্ছে, সময়ের সাথে সাথে ইংরেজি আকাডেমিক সমালোচনার কতগুলি পুরনো সামাজিক সঞ্চালক ক্ষীণ হয়ে আসছে — যেমন একটা প্রচ্ছন্ন শ্রেণীসংগ্রাম, নিম্নমধ্যবিত্ত ও নব্যমধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক উচ্চাভিলাষ। আবার কতগুলি নতুন শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে, যথা নারীবাদ ও উত্তর-ঔপনিবেশিক ভাব। মোটের উপর এই চর্চায় গতিশীল সামাজিক প্রভাব খুব বেশি। এর সাবেক ঐতিহ্যের আপাত সমাজনিরপেক্ষ আঙ্গিকধর্মী চরিত্রের পিছনে নানা বাহ্যিক শক্তির খেলা লক্ষণীয় ছিল। সেই ক্রিয়াকাণ্ডকে আরও ফুটিয়ে তুলে, নানা বৃহত্তর প্রসঙ্গ এবং অ-নান্দনিক প্রয়োগ বরাবর এই সমালোচনার ক্ষেত্রে কলাকৈবল্যের সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছে। ধ্রুপদী সাহিত্যবোধে নীতিসর্বস্বতা (didacticism) অবশ্যই একটি স্থায়ী ধারা; কিন্তু তা অপেক্ষাকৃত সরল ও মোটা দাগের। নব্য সমালোচনায় এক নতুন মানবিকতার প্রকাশ পাওয়া যায় — মানুষ ও মানবসমাজ সম্বন্ধে অনেক জটিল বোধ, এমনকি স্পষ্ট কোনও ভাবধারা বা Ideology-র রূপায়ণে।

ম্যাথু আরনল্ডের সাহিত্যচিন্তায় এই জীবনধর্মিতা অত্যন্ত প্রবল। সাহিত্যশিক্ষার যে ব্যাপক সুফল আমাদের সামাজিক জীবনে প্রতীত হতে পারে, তাতেই শেষ অবধি তাঁর কাছে এই চর্চার প্রধান মূল্য। বিংশ শতাব্দীতে এলিয়টের প্রথম যুগের আপাত আঙ্গিকধর্মী সমালোচনার আড়ালে সামাজিক ও ধার্মিক চেতনা খুবই স্পষ্ট; পরে তো সেটা তাঁর প্রধান প্রতিপাদ্য হয়ে পড়ে। লীভসের সমালোচনায় যেভাবে সমাজবোধ ও মূল্যবোধ ক্রমশ বেড়ে চলে, তা আরনল্ডের সঙ্গে তুলনীয়।

আধুনিক ইংরেজি সমালোচনার মূল ধারাটা এই দিকপালরা ধরিয়ে দিয়ে গেছেন। যে চেতনা হয়ত সে যুগের অনেক সমালোচনায় নিহিত ছিল। সেটা এঁরা সুস্পষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। ফলে খুচরোভাবে এঁদের বিরুদ্ধে যাই প্রতিক্রিয়া বা বিরূপতা উত্তরসূরীরা প্রকাশ করুন না কেন, ব্যাপক অর্থে তাঁরা সকলেই এক ঐতিহ্যের বাহক, এক যজ্ঞের কর্মী।

নানা বিভেদ সত্ত্বেও — ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক রেষারেষি ছেড়েই দিলাম — পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত আকাডেমিক ইংরেজি সমালোচনায় এই মৌলিক একাত্মতা লক্ষ করা যায়। হয়ত তা আমাদের ভ্রান্তি; হয়ত কালের দূরত্বে অতীতের বৈচিত্র্য আজ অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। কিন্তু আজ থেকে অর্ধশতাব্দী বাদে, আজকের সমালোচনার জগৎ সেভাবেও একাত্ম দেখাবে এমন কল্পনা করা দুষ্কর। এক সাম্প্রতিক বইয়ে বের্নার্ড বের্গনজি লিখেছেন, এ যেন একই মাঠে পাশাপাশি বিভিন্ন খেলোয়াড় বিভিন্ন খেলায় মশগুল, এই খণ্ডতা এল কী করে?

একটা মস্ত কারণ হল পাশ্চাত্য উচ্চশিক্ষা জগতের, বিশেষত গবেষণার জগতের, বিপুল স্ফীতি। সাহিত্যপাঠের অজস্র প্রকল্প মায় এক-একটি আস্ত ধারা-উপধারা, থিসিস লেখার তাগিদ থেকে জন্ম নিচ্ছে ও পুষ্ট হচ্ছে। জোয়ার-ভাঁটা যেমন সূর্যের নয় চাঁদের টানে হয়, তেমনি বৃহত্তর প্রভাবের চেয়ে একটি ক্ষুদ্র উপজগতের তাড়না সাম্প্রতিক সমালোচনাকে বহুলাংশে চালিত করছে।

সাহিত্যপাঠ সবসময়ে গবেষণার উপযুক্ত ক্ষেত্র নয়। সাহিত্যিক গবেষণার কিছুটা হয় পাঠভিত্তিক (textual)। পাঠভিত্তিক গবেষণা বিংশ শতাব্দীতে এক নতুন ব্যাপ্তি ও সূক্ষ্মতা লাভ করেছে। প্রথমে কলেটিং মেশিন, পরে কমপিউটারের বহুবিধ প্রয়োগে এর চর্চা যে স্তরে পৌঁচেছে, পঞ্চাশ বছর আগে তা ছিল স্বপ্নাতীত। কিন্তু এর ফলে যে অন্য অর্থেও এই গবেষণার মধ্যে একটা যান্ত্রিকতা এসে গিয়েছে, রাশিকৃত পাঠ ও তথ্য ঘেঁটে লাভের পরিমাণ পড়তায় পোষাচ্ছে না, এমন একটা মত বেশ কিছু গবেষক আজ পোষণ করছেন। শতাব্দীর প্রথমার্ধে পলার্ড, ম্যাককেরো, গ্রেগ প্রমুখের সম্পাদকীয় কাজে যে মানবিক ধারা লক্ষ্য করা যেত, সাম্প্রতিক ব্রিটিশ পাঠচর্চায় তা কিছুটা অবশিষ্ট থাকলেও ফ্রেডসন বাওয়ার্স প্রবর্তিত মার্কিন ধারায় তার নিদারুণ অভাব। অবশ্য মারকিন গবেষণার অন্য ধারাও আছে। সরাসরি যন্ত্রলব্ধ গবেষণাও বিষয়মাহাত্ম্যে ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির গুণে বরেণ্য হয়ে ওঠে, যেমন কলেটিং মেশিনের সাহায্যে শেক্‌সপিয়রের প্রথম রচনাবলী (First Folio) নিয়ে চার্লটন হিনম্যানের কাজ।

যাইহোক, গবেষকদের অল্প অংশই পাঠভিত্তিক কাজ করেন। গবেষণার অনেক প্রশস্ত ক্ষেত্র হল সাহিত্যের তথ্য, ইতিহাস বা পটভূমিকা। সাহিত্য

নিয়ে আদত "গবেষণার" সুযোগ হয়ত এখানেই সবচেয়ে বেশি। তার সদ্ব্যবহার করে প্রতি বছর সহস্র ছাত্র উপাধি পায়, সহস্র অধ্যাপক বায়ো-ডাটা বাড়িয়ে যান। সত্যিকারের দামি আবিষ্কারগুলি প্রায়ই হারিয়ে যায় আলতাবড়া অনুসন্ধানের গোলক ধাঁধায় — এলিয়টের ব্যঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যে কতবার জিরাফের উল্লেখ আছে তার হিসাব নিয়ে।

সৎ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেও আমরা শীঘ্র একটা পর্যায়ে পৌঁছে যাই, যার পর তথ্য বা তত্ত্বের প্রয়োগ সাহিত্যপাঠের গণ্ডি ছাড়িয়ে অন্য কোনও বিদ্যা বা চর্চার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে — তা নীতি, দর্শন, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব যাই হোক না কেন, সাহিত্য তখন আর সাহিত্য থাকে না, হয়ে পড়ে অন্য কোনও চর্চার উপাদান বা দলিল মাত্র। বেশির ভাগ সমালোচক এমন কোনও লক্ষ্য মানতে রাজি হবেন না; কিন্তু তাঁদের সাহিত্যপাঠ প্রায় অবধারিতভাবে ঐদিকে মোড় নেয়। বস্তুত, নিখাদ নান্দনিক সাহিত্যপাঠ বা আঙ্গিকের বিশ্লেষণ যেন একটা অলীক চেষ্টা। সাহিত্য-সমালোচনায় প্রায় সর্বদাই একটা বহির্মুখী, কেন্দ্রাতিগ ঝোঁক থাকে, তার বিশেষ প্রতিপাদ্যকে একপাশে সরিয়ে অন্য কোনও তাৎপর্যের পিছনে ছুটতে চায়। সাবেক সমালোচনায় শত নীতিসর্বস্বতা সত্ত্বেও, এই ভবঘুরে ঝোঁকটাকে বাগে রাখত শিল্পের স্বকীয়তা সম্বন্ধে একটা সাধারণ বিশ্বাস এবং ভাষা ও আঙ্গিক নিয়ে স্থায়ী ও শাশ্বত কৌতূহল। এই সর্বস্বীকৃত ভাবের কাঠামোটা আজ বড় বেশি নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। সেই ফাঁক দিয়ে ঢুকে গেছে নানা নতুন বাহ্যিক ও তাত্ত্বিক বিচার।

সেগুলি আলোচনার আগে কিন্তু একটা মৌলিক প্রশ্নে যেতে হবে। খুব বিশেষ বিশেষ কিছু ক্ষেত্র ছাড়া, স্রেফ তথ্য দিয়ে বই বা প্রবন্ধের পাতা ভরানো খুব শক্ত কাজ। ক্লান্তিকর তো বটেই। বেশির ভাগ "গবেষণায়" দেখা যায় অল্প কিছু নতুন খবর। থোর-বড়ি-খাড়ার একপ্রস্থ ওলট-পালট, ও সেই শিখণ্ডীর আড়ালে নিছক ব্যাখ্যা কিংবা ভাষা ও আঙ্গিকের আলোচনা। প্রতিষ্ঠিত ডকটরেট-প্রাপ্ত অধ্যাপকের অবশ্য নলচের আড়াল লাগে না, তিনি সরাসরি ব্যাখ্যাতা বা আলংকারিকের ভূমিকা নিতে পারেন।

এভাবে বহু দশক ধরে সাহিত্যের ব্যবচ্ছেদ চলার পরেও নতুন সমালোচনার পরিধি কমে নি, বরং উত্তরোত্তর বাড়ছে। আকাডেমিক প্রকাশনায় মন্দা চলা সত্ত্বেও নানা পথে বই ছাপাবার টাকা জুটে যাচ্ছে, একটি নাড়াবাঁধা ক্রেতাকুলও মজুত আছে বিশ্বব্যাপী গ্রন্থাগার ও অধ্যাপক-গবেষক মহলে। এই সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে কিন্তু ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণধর্মী সমালোচনায় একটা ক্লান্ত, নিঃশেষিত ভাব এসে গেছে, যা অনেক বিচক্ষণ সমালোচক ইদানীং স্পষ্ট স্বীকার করছেন। দরকারি কথাগুলো যেন বেশিরভাগ বলা হয়ে গেছে, এখন সেগুলি কেবল একটু ঢেলে সাজানো সম্ভব। শেক্‌সপিয়রের সাইত্রিশটি নাটক নিয়ে তার সহস্রগুণ পুস্তক শতসহস্রগুণ প্রবন্ধ বেরিয়েছে ও বেরোচ্ছে। স্টোকাটা লেখক গ্যারি টেলর এই সম্ভারকে বলেছেন একটা উলটানো পিরামিড, মাথা ভারি ভিত সরু। টেলর নিজেও কিন্তু সেই পিরামিডের আয়তন মন্দ বাড়ান নি আজ অবধি।

সমালোচনার ভাষায় নতুন মুনশিয়ানা এসেছে ঠিকই; কিন্তু প্রকাশবৈচিত্র্যের আড়ালে প্রায়ই কোনও প্রচলিত ব্যাখ্যায় এসে ঠেকে যেতে হয়। প্রকাশভঙ্গির একটা তাৎপর্য অবশ্যই আছে। আধুনিক জ্ঞাপনতত্ত্ব (theory of communication)-এর মূল কথাই তো বাক্‌কৈবল্য: বহির্বিশ্বকে আমরা প্রকৃতপক্ষে "বুঝি" বা "দেখি" না, আমাদেরই মানস-নিসৃত বাঙ্ময় চেতনায় তার বোধকে অন্তর্ভুক্ত করি। এই তত্ত্ব নিয়ে পরে আলোচনা করব; দেখব, এর ফলে সমালোচনার কেন্দ্র কেমন সরে আসে আলোচিত রচনা থেকে সমালোচক ও তাঁর পরিমণ্ডলের আত্মপ্রকাশে। প্রচলিত অর্থে ব্যাখ্যার স্থান এমন সমালোচনায় কমে আসে। বরং তা রচনার বাহ্যিক

প্রভাব বা বহির্জগতের সঙ্গে সংঘাতটা ফুটিয়ে তোলে; রচনার মূল অর্থ বুঝতে সাহায্য করে না, "মূল অর্থ" বলে কিছু আছে কিনা তা নিয়েই প্রশ্ন তোলে।

॥ তিন ॥

সমালোচনার আদি লক্ষ্য যদি হয় রচনার ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন, তার "মানে বোঝা" ও উৎকর্ষ-অপকর্ষের বিচার করা, তবে বলতে হয় আধুনিক সমালোচনা কিছুদিন যাবৎ সেই স্থানে পৌঁছে গেছে যাকে অর্থনীতিকরা বলেন point of diminishing returns। একটি মাত্র নাটক বা উপন্যাস নিয়ে আস্ত একখানা বই তো হামেশা লেখা হচ্ছে। একটি তিনশ পাতার বই বেরিয়েছে ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'লুসি' সম্বন্ধে তিনটি কবিতা নিয়ে, যার মোট লাইন-সংখ্যা তিরিশ কি চল্লিশ। এমন বইয়ের যদি কোনও সার্থকতা থাকে, তা কবিতার উপর আলোকপাত করে নয়, কবিতাকে উপলক্ষ্য করে কোনও সাধারণ তত্ত্ব বা আখ্যানের বিস্তারে।

এই অতিকথনের ফলে গত পঞ্চাশ বছরে একটি দর্শনীয় পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলায় "সমালোচনা" শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহার হয়, যেখানে ইংরেজিতে দুটি পৃথক শব্দ আছে: review ও criticism। প্রথমটি অপেক্ষাকৃত লঘু ও তাৎক্ষণিক। দ্বিতীয়টি কিছু গভীর ও গম্ভীর, হয়ত বা তাত্ত্বিক; তাতে একটা পেশাদার, আকাডেমিক ঝোঁক আছে। পঞ্চাশ বছর আগেও দুটি ধারা অনেক কাছাকাছি ছিল, প্রায়ই মিলে যেত। শিক্ষিত রুচিশীল পাঠকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুমশায়ের বই পড়তেন, আলোচনা বা জবাবে অংশ নিতেন, নিজেরাও তেমন লিখতেন মাঝে-মধ্যে। পাঠভিত্তিক গবেষণাতেও সৌখীন পাঠক ও পুস্তক-সংগ্রাহকের যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে, Oxford English Dictionary গ্রন্থনার মহাযজ্ঞে বহু অনুরাগী বিনা পারিশ্রমিকে হাজার হাজার বই ঘেঁটে শব্দচয়ন করেছেন।

এই অনুরাগী অ-পেশাদার পণ্ডিত পাঠককুল আজ প্রায় লুপ্ত। অপরদিকে, পত্র-পত্রিকায় সাধারণ পাঠকের জন্য যে গ্রন্থসমালোচনা ছাপা হয়, তার অনেকগুলি পেশাদার পণ্ডিত-অধ্যাপকেরা লেখেন ঠিকই, কিন্তু পেশাদারি হাতযশ ফলাবার সুযোগ সেখানে বড় একটা পান না, ফলাতে গেলে পাঠকেরা বিব্রত হন। criticism এর জগৎ এখন বহুলাংশে বদ্ধ, দুষ্প্রবেশ্য। পণ্ডিতেরা সমালোচনা লেখেন পরস্পরের জন্য: তাতে আদর্শে-আদর্শে, শিবিরে-শিবিরে, ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে সংলাপ তথা সংঘাত প্রায়ই প্রকট হয়ে ওঠে। এখানেও আলোচ্য সাহিত্যটা যেন উপলক্ষমাত্র। অ-পেশাদার শিক্ষিত ব্যক্তি সাহিত্য পড়েন, নাটক দেখেন, আকাডেমিক সমালোচনার ধার ধারেন না।

বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে এই ছেদটা পণ্ডিতেরা অবশ্যই উপলব্ধি করেন, সেজন্য অনেকে চিন্তিত বা পীড়িতও হন। কিন্তু আকাডেমিক সাহিত্যচিন্তা বহুকাল যেদিকে এগোচ্ছে, তা থেকে আবার ধ্রুপদী মানবিকতায় ফিরে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। এই সংকটে পণ্ডিতেরা সচরাচর যে পথ বেছে নেন, তা হল কোনও বয়ান (discourse) বা ভাবাদর্শ অবলম্বন করা যাতে সাহিত্যের সঙ্গে বাহ্যিক শক্তি বা উপলব্ধির একটা যোগ ঘটে। এই প্রচেষ্টাগুলি প্রায়ই হয় নিদারুণভাবে কেতাবি, জটিল, দুর্বোধ্য: এদের বাস্তবমুখিতা নেহাত তাত্ত্বিক স্তরে। তাতে এলিট সাহিত্য গণমুখী হবার কোনও সম্ভাবনা নেই। বরং সাধারণ পাঠককে আরও দূষীত করতে পারে। গণসাহিত্য (popular literature) ও লোকসাহিত্য (folk literature) এই সমালোচনার আওতায় আসে জটিল নির্বস্তক পণ্ডিতি বিশ্লেষণের জন্য — যেমন করেছেন শিয়ের মাশেরে বা উমবের্তো একো।

বাস্তবধর্মী সমালোচনা সবচেয়ে সফল হতে পারে মার্কসীয় ভাবধারায়, যেমন (স্ব-স্ব পার্টির সঙ্গে বিরোধ সত্ত্বেও) হয়েছে রাখতিন বা লুকাশের সাহিত্যচিন্তায়। ইংরেজি দুনিয়ার কিন্তু মার্কসীয় ধারাটি বরাবরই দুর্বল। রেমণ্ড উইলিয়ম্‌সের পর তেমন মৌলিক মার্কসবাদী সমালোচক দেখা দেন নি। (আমেরিকায় ফ্রেড্রিক জেমসনের নাম করা যায়।) টেরি ঈগলটন ঘটনাচক্রে উইলিয়ম্‌সের উত্তরসূরী, কিন্তু তিনি কিছুটা সাংস্কৃতিক

দোভাষি, কিছুটা তরল সামাজিক ভাষ্যকারের স্তরেই রয়ে গেলেন। বিভিন্ন নতুন ধারায় যাঁরা গত তিন-চার দশক ধরে লিখছেন, তাঁদের অনেকে মার্কসবাদে প্রভাবিত, কিন্তু তাঁদের সমালোচনা মূল মার্কসবাদী তত্ত্বের বিস্তারে না গিয়ে অন্য কোনও প্রতিবাদী বা সমাজ-সংস্কারক উদ্দেশ্য অবলম্বন করেছে, যেমন নারীচেতনা বা গণনাট্য। কখনও হয়ত তা এমন পথেও গিয়েছে যা মার্কসীয় ভাব বা ঝোঁকের বিরোধী: নানা ধরনের উত্তর-গঠনবাদী (post-structuralist) মত সম্বন্ধে এ-কথা বলা চলে। এখানে মার্কসবাদের সঙ্গে গাঁটছড়াটা তাত্ত্বিক নয়, তাৎক্ষণিক: কোনও বিশেষ মত বা প্রতিষ্ঠানের অচলায়তন ভাঙতে মার্কস ও দেরিদা উভয়েই হাতিয়ার হয়ে উঠেছেন। বছর বারো আগে নব্য সমালোচক কলিন ম্যাককেবকে চাকরি দেবার বিরুদ্ধে কেমব্রিজের গোঁড়া অধ্যাপকেরা রুখে উঠেছিলেন; তাঁদের একটা যুক্তি ছিল, এতে প্রাচীন বিদ্যায়তনে কম্যুনিজমের প্রবেশদ্বার খুলে যাবে।

সমাজভিত্তিক সমালোচনার যে ধারাটি ইংরেজিতে সবচেয়ে সবল ও সফল, তা হল নারীবাদী। ইংরেজি পঠনপাঠনে মহিলাদের আধিক্য নিশ্চয় এর একটা কারণ। তার চেয়েও বড় কথা, ইংরেজি দুনিয়ায় গত পঞ্চাশ বছরে — অর্থাৎ আকাডেমিক সমালোচনায় ভরা জোয়ার আসার পর থেকে — নারীমুক্তি ও নারী-পুরুষের সম্পর্কের রূপান্তর, নিঃসন্দেহে সবচেয়ে ক্রান্তিকারী সামাজিক পরিবর্তন। ভারতের মতো দেশে শিক্ষিত উচ্চবিত্ত নারীসমাজে এর ঢেউ পৌঁছবার পর এখানেও গত দশ-বিশ বছরে নারীবাদী সমালোচনার সূচনা হয়েছে।

আমার কাজ সমীক্ষা, বর্ণনা নয়। নারীবাদী সমালোচনার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিতে আমি অক্ষম। এই সমালোচনার যে বৈশিষ্ট্যগুলি আমার বিবেচ্য, তা আরও সহজে দেখা যাবে একটি নজর-কাড়া কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ধারায়। সেটি হল নব-ইতিহাসবাদ (New Historicism)।

ইতিহাসের পটভূমিকায় সাহিত্য পড়া, বা সাহিত্যে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ ও প্রতিফলন খোঁজা, তো চিরকালের অভ্যাস। প্রাচীন যুগেও সাহিত্যের টীকায় সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপক (allegory) ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নব-ইতিহাসবাদীদের বৈশিষ্ট্য, তাঁরা আরও অনেক সূক্ষ্মভাবে, স্থূল ঘটনাপ্রবাহের আড়ালে সামাজিক ও মানবিক বিবর্তনের পটে, সাহিত্যের ভূমিকা নির্ণয় করেন। "ভূমিকা" বলছি এইজন্য যে সেই বিবর্তনে সাহিত্য একটা সক্রিয় শক্তি বলে গণ্য হচ্ছে: তা শুধু প্রভাবিত হয় না, প্রভাবিত করে।

এই ভূমিকাটি কী আলোয় দেখা হচ্ছে সেটাই দর্শনীয়। নব-ইতিহাসবাদের প্রধান নিদর্শনগুলি গোড়ার দিকে রচিত হয় রেনেসাঁস নিয়ে। এই ধারার অন্যতম মুখ্য প্রবর্তক স্টিফেন গ্রীনব্ল্যাট তাঁর প্রথম দুটি বই লেখেন শেক্সপিয়র ও তাঁর সমসাময়িকদের নিয়ে। মোটামুটিভাবে সেগুলি ছিল সংস্কৃতি ও চেতনার ইতিহাসের নৈর্ব্যক্তিক বিবরণ। দ্বিতীয় বইটিতে কিন্তু শেকসপিয়রকে দেখা হয়েছে অনেক বেশি করে আধুনিক চিন্তা ও অভিজ্ঞতার আলোয়। তারপর থেকে গ্রীনব্ল্যাটের গবেষণা রেনেসাঁস ছাড়িয়ে পরবর্তীকালে বিস্তৃত হয়েছে। তার চেয়েও বড় কথা, তাঁর বিষয় হয়েছে উপনিবেশবাদ ও জাতিবিদ্বেষের কয়েকটি সূত্রের অনুসন্ধান, যার তাৎপর্য আধুনিক যুগে — বিশেষত গ্রীনব্ল্যাটের নিজস্ব মার্কিন দেশে — অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। স্বঘোষিত ইতিহাসাশ্রয়ী সমালোচনাও অতএব আকাডেমিক দূরত্ব হারিয়ে অতীত সাহিত্যের সঙ্গে সাম্প্রতিক বাস্তবের যোগস্থাপন করছে।

এতক্ষণ যে ধারাগুলি পর্যবেক্ষণ করেছি, সেগুলি ভিন্ন-ভিন্ন হলেও সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক চেতনার প্রাধান্যে তুলনীয়। নানা ভাবে সেই চেতনাকে জাগ্রত করাই এই সমালোচনার উদ্দেশ্য। আরও বলার আছে যে এই সবকটি ধারাতেই ভাষা ও আঙ্গিকের যে বিশ্লেষণ হচ্ছে তা প্রচলিত রীতির অনুসরণে। নারীবাদী সমালোচনা নীতিগত বা সংস্কারগত কারণে কারো কাছে দুর্ভেদ্য ঠেকতে পারে, কিন্তু পরিভাষা ও পদ্ধতির দিক দিয়ে সচরাচর মোটেই দুর্বোধ্য নয়। (কিছু সাম্প্রতিক ফরাসি ধাঁচের নারীবাদী লেখা সম্বন্ধে একথা খাটে না অবশ্য।)

॥ চার ॥

আধুনিক সমালোচনার অপর প্রধান শাখাটি আরও মৌলিকভাবে অনভাস্ত, দুর্জ্ঞেয়। আমাদের ভাষাবোধ ও অবধারণ পদ্ধতিকে আমূল আন্দোলিত করে তার গতি। এই শাখারও অনেকগুলি প্রশাখা আছে, ভিন্ন-ভিন্ন ও

প্রায়ই পরস্পরবিরোধী দিকে ছড়িয়ে। মোটামুটিভাবে এগুলি গঠনবাদী (structuralist) চিন্তা থেকে শুরু করে বিভিন্ন উত্তর-গঠনবাদী (post-structuralist)) পথে প্রসারিত হয়েছে। এদের মধ্যে কিছু গভীর যোগ প্রায়শ খুঁজে পাওয়া যায়; "মহাগঠনবাদ" বা (super-structuralism) বলে একটি সর্বব্যাপী তত্ত্বেরও অবতারণা করা হয়েছে। কিন্তু এই ধারাগুলি যে প্রায়ই একত্রিত করে দেখা হয়, তার স্থূল কারণ এদের সবগুলির দুর্ভেদ্য অভিনবত্ব। শুধু সাধারণ পাঠক কেন, বিদ্বৎ-সমাজের রক্ষণশীল অংশও এগুলি গ্রহণ করতে চান না; আর একটি অংশ বোঝার ব্যর্থ চেষ্টা করেন বা অম্লবিদ্যায় সন্তুষ্ট থাকেন। আন্তর্জাতিক পণ্ডিতসমাজ আজ প্রায় দুই মহাদেশে বিভক্ত: যাঁরা এই নব্য থিওরিগুলি গ্রহণ করেছেন, এবং যাঁরা করেন নি।

খুব কম লোকই এই থিওরির জগতে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেন। বর্তমান লেখক কোনওমতেই সেই দলভুক্ত নন। বহির্দ্বারে দাঁড়িয়ে কিছু সাধারণ মন্তব্য করেই তাঁকে ক্ষান্ত থাকতে হবে।

যে দুটি আধুনিক মতবাদ ইংরেজি সমালোচনায় সবচেয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে, তা হল গঠনবাদ (structuralism) এবং অবিনির্মাণ (deconstruction) এ দুটির দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা পরস্পরের বিপরীত বলে গণ্য হয়, যদিও এদের প্রধান প্রবক্তাদের মানসিকতায় বেশ কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। খুঁটিনাটি তুলনায় না গিয়ে বলা যায়, এ থিওরিগুলির কোনওটিই মুখ্যত সাহিত্য নিয়ে লিপ্ত নয়। এদের লক্ষ্য হল ভাষার বিশ্লেষণের দ্বারা আমাদের চিন্তা বা উপলব্ধির কিছু গহন প্রক্রিয়ার সন্ধান। ভাষা বা ভাবের সঙ্গে বহির্জগতের কী সম্বন্ধ, ভাষা ও উপলব্ধির আভ্যন্তরীণ শক্তি দিয়ে আপাত-বাহ্য জগৎকে আমরা কীভাবে আত্মস্থ করি — এসব তত্ত্বের মহত্তর প্রবক্তারা মননের এই গভীর স্তরের অনুসন্ধান করেন। তাঁদের ভাষা দুর্বোধ্য, কারণ তাঁদের উপলব্ধিগুলি ভাষার সাধারণ প্রয়োগক্ষেত্রের অতীত। অপরদিকে সেই উপলব্ধির তলানি কুড়িয়ে, সেই বিশেষ ভাষার কিছু প্রচলিত খুচরো নিদর্শন ভাঙিয়ে, মাঝারি মাপের সমালোচকেরা বাজার গরম করছেন।

এই থিওরিগুলির কিছু ব্যবহারিক বা বাহ্যসচেতন প্রয়োগ খুবই প্রচলিত। গঠনবাদের আবির্ভাব হয় সসিয়ুরের ভাষাতত্ত্বে। তারপর তা বহু ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়েছে — সবচেয়ে ফলপ্রসূভাবে হয়ত নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বে। বরং সাহিত্যের ক্ষেত্রেই এর প্রয়োগে ঘটেছে দেরিতে ও সীমিতভাবে। অবিনির্মাণ নিয়ে সমালোচকেরা মেতেছেন অনেক বেশি। যে-কোনও রচনা, বা ভাষার যে-কোনও প্রকাশে, যে অন্তরস্থ স্ববিরোধ বা আত্মধ্বংসী বীজ নিহিত আছে, তা সনাতন সমালোচনাতেও বহুভাবে স্বীকৃত। এই বোধটাই অবিনির্মাণে চূড়ান্ত, আপসহীন রূপ পেয়েছে।

অবিনির্মাণের ব্যবহারিক সমাজমুখী প্রয়োগ সবচেয়ে সার্থক হয়েছে নারীবাদী সমালোচনায়, পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষদের রচনায় নারীত্বের ফল্গুধারাকে ব্যক্ত করতে। তাছাড়া নিছক তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের খাতিরে অবিনির্মাণধর্মী ও অন্য নব্য সমালোচনায় প্রায়ই এলিট সাহিত্য বা "সৎসাহিত্যের" সঙ্গে গণসাহিত্য, উপসাহিত্য ও নিছক অ-সাহিত্যিক কেজো লেখার তফাৎ মুছে দেওয়া হয়। মার্কসবাদী বা অন্য রাজনীতি-সচেতন সমালোচক সেই সমীকরণকে তাঁর নিজের কাজে লাগাতে পারেন।

তবু মানতে হবে এই তত্ত্বগুলি যখন সমালোচনায় ব্যবহৃত হয়, তার মূল লক্ষ্য হয় অন্তর্মুখী। ভাষা, গঠন ও আঙ্গিক নিয়ে এদের আসল কারবার। তার অতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সঙ্গে মাঝে-মাঝে পুরনো রেটরিক ধর্মী বিশ্লেষণের একটা মজার সাদৃশ্য দেখা যায়। তা অবশ্য নেহাতই উপর-উপর, কারণ দুই পদ্ধতির উদ্দেশ্য একেবারে বিপরীত। সাবেক ভাষ্যের লক্ষ্য ছিল একটি পাঠ বা ব্যাখ্যা ফুটিয়ে তোলা। তাতে শ্লেষ বা যমক থাকতে পারে, দ্বৈত তাৎপর্য বা খোলাখুলি অনিশ্চয়তা থাকতে পারে, কিন্তু সবটাই একটা নির্দিষ্ট, সংহত রূপ নিচ্ছে; আর ধরে নেওয়া হচ্ছে যে ভাষার এই সংবদ্ধ প্রয়োগ পরিচালিত করছে লেখকের স্বাধীন সজ্ঞান অভিপ্রায়।

নব্য সমালোচনায় কিন্তু লেখকের অভিপ্রায়কে বলতে গেলে অস্বীকার করা হয়। লেখক যেন এখানে একটি পাঠ্যবস্তু (text) সৃষ্টি করার উপলক্ষ্য বা অনুঘটক মাত্র। তারপর সেই পাঠ্যবস্তু হয়ে দাঁড়াচ্ছে ভাষা ও বোধক্রিয়ার মুক্ত লীলাক্ষেত্র। এই দৃষ্টিভঙ্গির একটি অনুষঙ্গ হল

"সাহিত্য" সংজ্ঞাটির লোপ: সাহিত্যের সঙ্গে ভাষার অন্য ব্যবহার একীকৃত হয়ে পড়ছে, সবের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে মূলত একই ধরনের বয়ান বা সন্দর্ভ (discourse)।

ব্যাপারটা তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? সাহিত্যের (বা রচনার, বা প্রকাশক্রিয়ার) এই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাগুলি বিশেষ-বিশেষ পাঠ্যবস্তুকে নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণ করে। পাঠ্যকে অবলম্বন না করে, ও প্রতিটি পাঠ্যের বিশেষত্ব স্বীকার না করে, এমন সমালোচনা এক পা-ও এগোতে পারে না। কিন্তু এই সবিশেষতার আড়ালে লুকিয়ে আছে এক নির্বিশেষ ভাবময় সার্বিকতা — পরিচিত দেখা-বলা-জানার জগতের গর্ভগৃহে এক দুর্জ্ঞেয় অব-বাস্তব রাজ্যের ঠিকানা। আরও দাবি থাকছে যে এই অব-বাস্তব আসলে অতি-বাস্তব, আমাদের মানসিক জীবনের নিয়ন্ত্রক ও সঞ্চালক। এর ছায়াময় গতিই যথার্থ, ধ্রুব; আমাদের পরিচিত বাস্তব তার অনিত্য প্রতিফলন মাত্র।

॥ পাঁচ ॥

অতএব দেখা যাচ্ছে, এ-সব তত্ত্বের সঙ্গে মানুষের বৃহত্তর অনুভূতি বা উপলব্ধির একটা মৌলিক যোগ আছে; কিন্তু যোগটা নেহাতই তাত্ত্বিক, তৃরীয়, বিমূর্ত, এবং সেই অর্থে অ-বাস্তব ও অ-মানবিক। এই তত্ত্বের আংশিক, তাৎক্ষণিক প্রয়োগে অনেক উদ্দীপক অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যায়; প্রচলিত সমালোচনা বা ভাষাতত্ত্বে এই চিন্তার যে পূর্বাভাস পাই, সেও এই ধরনের। কিন্তু যথার্থভাবে এ-সব তত্ত্ব মানতে চাইলে তার প্রয়োগ আংশিক হতে পারে না: এমন তত্ত্বের মূল কথাই হল যে তা সার্বিক, নিত্যপ্রযোজ্য। সেক্ষেত্রে কিন্তু এ তত্ত্ব আমাদের সাধারণ মননের জগৎকে ছারখার করে দিতে পারে।

আমার বক্তব্যকে আর এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাই। অবিনির্মাণ নয়, কিন্তু তার সমকক্ষ এক ধরনের বিশ্লেষণ সম্প্রতি মননের ইতিহাসে খুবই প্রভাবশালী হয়েছে। তার মুখ্য হোতা মিশেল ফুকো একে বলেছেন "জ্ঞানের প্রত্নতত্ত্ব" (archaeology of knowledge)। এই দৃষ্টি নিয়ে মানুষের ইতিহাসচর্চা — শুধু রাজনৈতিক নয়, বরং বেশি করে চেতনা ও অস্তিত্বের সার্বিক ইতিহাস — বিচার করলে দেখা যাচ্ছে, কোনও অবস্থাতেই আমরা অপর এক দেশ, যুগ বা সমাজের সত্য রূপ জানতে পারছি না। আমাদের সব বিদ্যা, সব উপলব্ধিই পরিচালিত হচ্ছে ভাষার মাধ্যমে: সত্যান্বেষণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে মনোনিসৃত কোনও বয়ান বা discourse এর সৃষ্টিমাত্র। প্রতি যুগই বাস্তবকে দেখছে তার নিজের চেতনার চশমা দিয়ে; এবং ফলস্বরূপ, অতীতকে দেখছে বর্তমানের আদলে, পরিবর্তিত ও আত্মীকৃত করে। নিজেদের বাইরে আমরা কিছুই জানতে পারছি না।

এর সঙ্গে তুলনীয় আধুনিক চিহ্নতত্ত্ব (semiotics) এর একটি মূল নীতি। আমরা বাস্তবকে অনুধাবন ও প্রকাশ করি বিভিন্ন চিহ্ন বা সংকেতাবলীর মাধ্যমে — সনাতন অর্থে ভাষা তার একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। কিন্তু যে কোনও সংকেত আমাদের কাছে চিহ্নিত করছে তার এক পা পিছনে আর একটি সংকেত মাত্র, কখনই কোনও বাস্তব সত্তা নয়। এভাবে আমাদের সব জ্ঞান, সব উপলব্ধি আবদ্ধ থাকছে এক সর্বগ্রাসী সংকেতের জালে। তার বাইরে কোনও ধ্রুব বাস্তব আক্ষরিক অর্থেই অ-চিন্তনীয়।

জানা-বোঝার পুরো প্রক্রিয়াটা এমন ব্যাখ্যায় হয়ে পড়ে অনিত্য, আপেক্ষিক, স্থান-কাল-নির্ভর। আমরা কোনও কিছুই "জানি" না, কোন বিষয়ে একটা বোধ নিজের মতো করে নিজের প্রয়োজনে তৈরি করে নিই মাত্র। পাশ্চাত্যে এই মতের সূচনা প্রাচীন গ্রীক সন্দেহবাদ বা scepticism এ; আধুনিক ইউরোপে রেনেসাঁস থেকে এর পুনরুত্থান। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ের আগে বোধহয় কোনও যুগের গূঢ়তম চেতনায় অনিশ্চয়তা ও আপেক্ষিকতা এত ব্যাপকভাবে বাসা বাঁধে নি। এই পরিস্থিতির মধ্যে একদিকে একটা উত্তেজক চলনশীলতা ও সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। অপরদিকে এর তাৎপর্য নেতিবাচক, স্থায়ী বোধ বা মননের চেষ্টায় চিরবিফল।

এই টানাপোড়েন কোনও বিশেষ মতবাদ বা ভাবাদর্শে আবদ্ধ নয়; নানা ভাবে, নানা স্তরে ও প্রসঙ্গে এই বোধটা সমসাময়িক চিন্তার আড়ালে কাজ করে যাচ্ছে। সমালোচনার ক্ষেত্রে এর একটি বড় প্রকাশ বিভিন্ন মাত্রার পাঠককেন্দ্রিক (reader-centred বা reception-based) ব্যাখ্যায়। একে হয়ত ব্যাখ্যা না বলে ভাষ্য বলা ভালো। পূর্বালোচিত কিছু ধারার মতো এখানেও লেখক হয়ে দাঁড়ান একটা বিবর্তনশীল পঠনক্রিয়ার সূচনাকারী মাত্র। তাঁর রচনার অফুরন্ত সম্ভাব্য তাৎপর্যের বিশেষ-বিশেষগুলির সঙ্গে বিশেষ-বিশেষ পাঠকের চেতনার যোগেই রচনার শিল্পরূপ সার্থক হয়ে উঠছে বলে ধরা হয়।

নানা সমালোচক ও তাত্ত্বিক নানাভাবে এই ধারণাটি ব্যক্ত করেছেন। কেউ চরমপন্থী, পাঠ্যবস্তুর স্বতন্ত্র ও মৌলিক সত্তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করছেন; কেউ মধ্যপন্থী, পাঠকের কল্পসৃষ্টির ভিত্তিস্বরূপ পাঠ্যবস্তুর একটা স্থির তাৎপর্য মেনে নিচ্ছেন। পাঠ্যবস্তুরও শ্রেণীবিভাগ করা হচ্ছে: যেমন উমবের্তো একোর বিখ্যাত বিভাজনে, মুক্ত পাঠ (open text) ও রুদ্ধ পাঠ (closed text) এ। কিন্তু মূল সুর সর্বত্র এক: পাঠক বা গ্রহীতা হয়ে উঠেছেন স্রষ্টা, নিয়ন্তা: তাঁর গ্রহণ-প্রক্রিয়ায় একই শিল্পকীর্তি অসংখ্য রূপ নিতে পারে। রোমান্টিক যুগ থেকে শিল্পী যে দেবতুল্য সম্মান পেয়ে আসছিলেন, সেটার বিলোপ ঘটেছে। আর পাঠকের উপর যে দায়িত্ব বর্তেছে তা সমালোচনার ইতিহাসে নজিরহীন।

অষ্টাদশ শতকের নব্যগ্রুপদী আকাদেমিগুলির হর্তা-কর্তারা কোনও রচনার চূড়ান্ত ব্যাখ্যা করে রায় দিতেন ঠিকই, কিন্তু সেটা হত একটা স্থাবর নীতি অনুসারে। প্রত্যেক পাঠকের বিশেষ-বিশেষ রসবোধ বা বিচারবোধ থাকবে, এটা কেবল দৃষণীয় নয়, প্রায় অকল্পনীয় ছিল। আর অবশ্যই অকল্পনীয় ছিল যে পঠনরীতির সঙ্গে-সঙ্গে পাঠ্যবস্তুর রূপান্তর ঘটতে পারে। এর মূলে যে ভাব তা তো আরও যুগান্তকারী: রচনা পঠিত না হলে তার শিল্পরূপ সম্পূর্ণ হয় না, সত্যি করে রচনাই হয়ে ওঠে না।

এই তত্ত্বের সরাসরি প্রয়োগে নয়, স্বাধীন পথে হাতে-কলমের অভিজ্ঞতাতেই যেন নাট্য সমালোচনায় গত বিশ-ত্রিশ বছর একটা নতুন মঞ্চসচেতনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শুধু সমসাময়িক নাটক নয়, আগের যুগের, সর্বোপরি শেক্‌সপিয়রের নাটকের সমালোচনায় এই ধারা বিশেষভাবে দেখা যায়। অভিনেতা ও নাট্যপরিচালকেরা আকাডেমিক জগতে অভূতপূর্ব খাতির পাচ্ছেন। নিজেরাও তাঁরা নাটক নিয়ে লিখছেন; বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যবিভাগ থেকে পেশা বদলে মঞ্চের দিকে চলে যাচ্ছেন কেউ-কেউ। উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা বা অভিনয়ের বিবরণ এখন শেক্‌সপিয়র সমালোচনার একটি বড় অঙ্গ। আর বলা বাহুল্য, সাহিত্যবিভাগের বাইরে নতুন একটি করে বিভাগ অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে উঠছে, তা হল নাট্যবিভাগ। সেখানে নাটকের প্রধান পরিচয়ই মঞ্চভিত্তিক।

নাটকের কথা তুললাম উপসর্গ হিসাবে। আবার মূল আলোচনায় ফিরে আসি। যে যুগের সাহিত্যচিন্তায় পাঠকের ভূমিকা এতটাই মৌলিক ও সক্রিয়; যেখানে সাহিত্যের বিশ্লেষণ হয় ভাষা ও মননের গভীর প্রক্রিয়ার নিদর্শনরূপে; এক কথায় যেখানে পঠন ও সমালোচনা অভূতপূর্বভাবে স্বাধীন ও স্বায়ত্ত হয়ে উঠেছে — সেখানে সমালোচনার কাজ অনেকটা আত্মনিরীক্ষা না হয়ে যায় না। আধুনিক সমালোচনায় এই আত্মলিপ্ত ভাবটা খুব প্রবল। আজকাল সমালোচনা-গ্রন্থের একটা বড় অংশের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সমালোচনারই তত্ত্ব ও পদ্ধতি, ও সেই প্রসঙ্গে আগেকার থিওরি পুনর্বিবেচনা। এই গ্রন্থসম্ভার ক্রমশ একটি স্বাধীন সম্পূর্ণ ভাবমণ্ডলে উত্তীর্ণ হচ্ছে, যার সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক প্রায় রানওয়ের সঙ্গে উড়োজাহাজের মতো।

শুধু সমালোচনা নয়, বিদ্যাচর্চার বহু ক্ষেত্রেই আজ দেখা দিয়েছে একটা অ-সুখী আত্মকেন্দ্রিকতা, যা শেষ অবধি আত্মবিধ্বংসী হয়ে উঠতে পারে। বয়ান বা discourse এর অনুসন্ধান আজ খুব জরুরি হয়ে পড়েছে। নানা বিদ্যায় এখন বিষয়বস্তু ছেড়ে পদ্ধতির দিকে বেশি ঝোঁক। শুনতে পাই নৃতাত্ত্বিকদের আজ একটা প্রধান চিন্তা হল, বিভিন্ন জাতি সম্বন্ধে সাবেক গবেষকেরা (অধিকাংশই সাম্রাজ্যবাদী যুগের সাহেব) যে বিবরণ রেখে গেছেন, তাতে পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিকোণ, মানসিক গণ্ডী ও বিকৃতির বিচার। ভিকটোরীয় যুগে কোনও সাহেব আফ্রিকার কোনও জাতি নিয়ে বই লিখলে সেটা কেবল তৎকালীন আফ্রিকার উপরে আলোকপাত করছে না, আরও বেশি করছে তৎকালীন ব্রিটিশ সমাজের উপর।

যুক্তি অকাট্য; কিন্তু এর পরিণাম হচ্ছে বসা ডালে কুড়ুল মারা। নৈতিক বা কৌশলগত কারণে এমন কাজের

নিন্দা করছি না; শুধু ঐতিহাসিক বাস্তবতার বিচারে বলছি, ভালো হোক মন্দ হোক এমন অন্তর্দর্শী আত্মপরীক্ষা তখনই কোনও চর্চায় প্রবেশ করে, যখন তার সবল অখণ্ড স্থায়িত্ব বিপন্ন হয়েছে। এর ফলে শেষ অবধি কোনও নতুন অনুসন্ধান, নতুন চর্চাক্ষেত্র সৃষ্টি হতে পারে; হয়ত তাতে নতুন এক যুগের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির আরও উপযুক্ত প্রকাশ ঘটবে। কিন্তু আদি চর্চাটি সেই সঙ্গে বিক্ষিপ্ত ও অন্তর্মুখী হয়ে অস্তাচলে নামে। সাহিত্য-সমালোচনা বলতে আমরা যা বুঝি, তা কি আজ সেই অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছেছে?

পাশ্চাত্য সভ্যতার একটি পূর্বেকার দশা এখানে স্মর্তব্য। মধ্যযুগের একেবারে শেষ প্রান্তে স্কলাসটিক ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের শেষ পর্যায়ের চিন্তা হয়ে পড়েছিল অসম্ভব জটিল, নির্বস্তুক: অতিসূক্ষ্ম বিচার আর পণ্ডিতি তর্কের প্রেতভূমি। তাতে উঁচুদরের বিচারবোধ ও সুপটু বিশ্লেষণ যথেষ্ট পরিমাণে ছিল; কিন্তু মোটের উপর তা সে যুগের সচেতন ধর্মবোধ ও মানবিকতা থেকে এতটাই সরে এসেছিল যে খ্রিস্টান সমাজে এক আমূল বিকল্পের দাবি উঠল — তা সে ক্যাথলিক গোষ্ঠীর মধ্য থেকেই হোক আর প্রটেস্ট্যান্ট নববিধানের শিবির থেকেই হোক।

আজ ইংরেজি তথা পাশ্চাত্য সমালোচনায় সূক্ষ্ম ও উদ্দীপক ভাবনা বিশেষ করেই প্রচুর। এত দার্শনিক গভীরতা বোধহয় আগের কোনও যুগের সমালোচনায় পাওয়া যায় নি। কিন্তু সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে এই চর্চার যে রূপান্তর ঘটেছে তাতে — "সাহিত্য" কথাটা বাদই দিলাম — ভাষা ও প্রকাশরীতি, মনন ও উপলব্ধির প্রচলিত প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে কোনও ইতিবাচক সম্পর্ক পুনর্স্থাপিত হবে কিনা, সেটাই প্রশ্ন। আর না হলে এ সমালোচনা কোনও দিন আকাডেমিক দেয়ালের বাইরে এসে দাঁড়াবে না।

লেখক পরিচিতি

অধ্যাপক সুকান্ত চৌধুরী লেখাপড়া করেছেন প্রেসিডেন্সি কলেজে ও অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি ইংরেজির অধ্যাপনা করেছেন ১৯৭৩ থেকে ১৯৯১, একটানা উনিশ বছর। বর্তমানে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির অধ্যাপক। রেনেসাঁস সাহিত্য ও চিন্তা নিয়ে ড. চৌধুরী বই লিখেছেন দু-খানি। সম্পাদনা করেছেন বেকনের প্রবন্ধ এবং এলিজাবেথান কবিতা। তাছাড়া কলকাতা সম্বন্ধে অকসফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস প্রকাশিত Calcutta: The Living City নামে দু ভল্যুমের বিরাট গ্রন্থখানিও তাঁর সম্পাদিত। সুকান্ত চৌধুরী কৃত সুকুমার রায়ের কবিতায় ইংরেজি অনুবাদ বহু আলোচিত এবং উচ্চ প্রশংসিত।

মুচি

দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

সোমবার ১৪ই আগস্ট, ১৯৮৯ সন। আমার বড় মেয়ের বিয়ে। আমাকে সম্প্রদান করতে হবে — লগ্ন মাঝ রাতে। সারাদিন কিছু খাওয়া চলবে না। তাই বাড়ির সবাই কাজে ব্যস্ত হলেও আমার পুরো ছুটি। শুধু সন্ধ্যায় অতিথিদের অভ্যর্থনা এবং রাত্রে কাজ। কাছেই আর একটা বাড়িতে বিয়ের ব্যবস্থা — নিজেদের বাড়িতে তেমন ভীড় বা কর্মব্যস্ততা নেই। বসার ঘরে চেয়ারে বসে আছি জানলার দিকে তাকিয়ে। অনন্ত কাল ধরে ভারতীয় বাবা-মাদের যা হয়ে এসেছে আমারও তাই — আনন্দ বিষাদ মিশ্রিত এক অদ্ভুত অনুভূতি। বিচ্ছেদ সে তো আগেই হয়ে গেছে। তিন বছর আগে মেয়ে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হয়ে আমেরিকায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে এখন সেখানের পশ্চিম কূলের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছে। সে বাড়ি ছেড়েছে অনেকদিন। কিন্তু মন্ত্র পড়ে অগ্নি সাক্ষী রেখে তাকে দান করে পিতৃদায় থেকে মুক্তি আজ রাত্রে — ভাবতে যেন মনে কেমন খচ্‌খচ্‌ করছে।

রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছি, কিন্তু চেনা মুখ, চোখে পড়ছে না। একভাবে বলতে গেলে '৭৪ সাল থেকেই বাড়ি ছাড়া। মাঝে তিন বছরের জন্য কলকাতায় ফিরেছিলাম বটে কিন্তু নতুন করে আর কারুর সঙ্গে পরিচয় হয় নি। '৭৪ সালের আগে যাঁরা কিশোর এখন তাঁরা পরিণত বয়স্ক সাংসারিক যুবক। এবং তখন যাঁরা যুবক ছিলেন এখন তাঁরা প্রৌঢ়ত্বে পা দিচ্ছেন। তাছাড়া কে কোথায় চলে গেছেন কাজকর্মের জন্য, তার খবর কে দেবে এই আট দিনের কর্মব্যস্ত ছুটির ভেতর!

আগে যখন থাকতাম তখন "মোচি ম্লাই জুতি" এই আওয়াজ শুনতে খুব অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। ছোটখাটো কালো দেখতে — হাঁটু পর্যন্ত কাপড় পিঠে মুচির ঝোলা, হাতে একটা ছাতা — ঐ আওয়াজ দিতে দিতে সপ্তাহে কয়েকবার আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যেত সে। মুখে তার সবসময় এক সুন্দর হাসি। এবং হাসলেই গোঁফের ভেতর থেকে ঝকঝকে দাঁত বেরিয়ে আসত। খুব নরম স্বরে কথা বলত অর্ধেক হিন্দি ও অর্ধেক বাংলায়।

কবে প্রথম দেখেছিলাম তা মনে নেই। আমার বড় মেয়ে মডার্ন স্কুলে আপার ইন্‌ফ্যান্ট ক্লাসে ভর্তি হয় ১৯৭০ সালে। প্রায় তখন থেকেই ও আমাদের পরিবারের এক পরিচিত বন্ধু হয়ে যায়। আমার

মেয়ের তখন ছোটো পায়ে ছোট্টো কালো জুতো। বৃহস্পতিবার তার ছুটি। তাই দুপুরে যখন মুচি যেত সে তাকে দিয়ে জুতোর পালিশ করাতো। সম্ভবত মেয়ের সূত্রেই আমার সংগে ওর আলাপ। বৃহস্পতিবার দুপুরে আমার সঙ্গে দেখা হত না কেননা আমি অফিসে থাকতাম। এক রবিবার দুপুরে খাওয়াদাওয়া সেরে বই পড়ছি এমন সময় মেয়ে ডাকলো উত্তেজিত হয়ে যে মুচি এসেছে আমি যেন তাড়াতাড়ি ওর সংগে কথা বলি। বেরিয়ে এলাম মেয়ের তাড়া খেয়ে। আমাকে দেখে একগাল হেসে মুচি বলল যে 'বিটিয়া' ওকে আমার কাবুলি চপ্পল সেলাই করার জন্য রবিবারে আসতে বলেছিল। এই প্রথম শুনলাম যে আমার মেয়ে ওর 'বিটিয়া' হয়ে গেছে। সত্যিই আমার কাবুলি চটিটা বেশ ছিঁড়ে গিয়েছিল। ওর অনেক কাজ করতে হবে। আমি জুতো জোড়াটা এনে ওর কাছে দিয়ে কি কি কাজ করতে হবে তা দেখিয়ে দিলাম। দেখে শুনে ও জানালো যে দুটাকা চার আনা লাগবে সারাতে। আমি একটু দরাদরি শুরু করলাম। মুচি একটু থেমে বলল যে, "নিশ্চয়ই আপনি দর করবেন? দর না করে ঠকবেন কেন? কিন্তু আমি যদি আপনাকে ঠকিয়ে বেশি নিয়ে চলে যাই তাহলে তো আপনি আমাকে আর কাজ দেবেন না। আমার একটা বাঁধা ঘর হাত ছাড়া হয়ে যায় তাতো আমি চাইব না। তবে যখন বলছেন কথাতে আমি দুটাকায় রাজি।"

দরাদরি করে আমি কখনওই খুব দাম কমাতে পারি না। এখানে সামান্য হলেও আমার জিত হওয়াতে খুব আনন্দ পেলাম। ঘন্টা দেড়েক পরে মেয়ে ডাকলো। গিয়ে দেখি আমার পুরনো ছেঁড়া জুতো নতুন হয়ে গেছে। ঝকঝকে পালিশ। আমি ওকে দুটাকা দিলাম। খুব খুশি হয়ে বলল, "বিটিয়া লছমী।" খুব ভাল কথা বলে আমার সঙ্গে, যতক্ষণ আমি কাজ করি। বাবুজী বিটিয়াকে খুব বকবেন না।" আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন ও কি তোমার কাছে নালিশ করেছে?—"না বাবুজী তা নয়। ওর কথা শুনে মনে হয় ও আপনাকে ভয় পায়। তাই বলছিলাম কি বিটিয়া যখন বড় হবে সব বুঝতে পারবে তখন তো আর দুষ্টুমি করবে না। আর কদিনই বা করবে বাবুজী? দেখবেন, দেখতে দেখতে বড় হয়ে যাবে। তখন আপনি ওর শাদির জন্য বর খুঁজবেন। শাদি হয়ে গেলে তো ও আপনার ঘর ছেড়ে চলে যাবে চিরদিনের মতো। যতদিন আছে আপনার কাছে বিটিয়াকে প্রেমসে খেলতে দিন।"

আমাকে জ্ঞান দিয়েছিল — আঁতে লাগল বটে — তবে কথাটা তো বেঠিক বলে নি। মনে পড়ে গেল যে ছেলেবেলায় আমি আমার দিদির সঙ্গে খেলতাম ঝগড়া করতাম তারপর হঠাৎ বাড়িতে হৈচৈ তারপর দিদির বিয়ে হয়ে চলে গেল। এও অজান্তে কবে বড় হয়ে যাবে। এবং হয়তো হঠাৎই চলেও যাবে। কিন্তু তা বলে খুব দুষ্টুমি করলে বকাঝকা করব না সে তো হয় না। এমনিতেই একটু বকলেই ওর মা তেড়ে আসেন, আমার বাবা চেয়ারে বসে হুঙ্কার দেন। তবে ছোট্টো মেয়ের পাকামিটা খুব খারাপ লাগল না। নিজের বলার সাহস নেই — সাহস করে বললেও ডেঁপোমির জন্য আরও ধমক খেত। তাই সে তার বন্ধু মুচিকে দিয়ে ভাল উপদেশ শুনিয়ে দিল।

কথাটা আর বেশি বাড়াতে না দিয়ে আমি ওর হাতের কাজের খুব প্রশংসা করলাম। খুব পুরনো চপ্পল। আগে এতে অনেক তাপ্পি লাগান হয়েছিল। তাকে সুন্দরভাবে পরবার উপযুক্ত করে তোলায় আমি সত্যিই খুব খুশি হয়েছিলাম।

মুচি তার বোঁচকা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। বোঁচকাটাকে পিঠে ফেলতে ফেলতে ঘুরে জিজ্ঞেস করল ও যদি একটা কথা বলে আমি রাগ করব কিনা। আমি তখন ওর ওপর বেশ খুশি — উপদেশ পাওয়া সত্ত্বেও। আমি জানালাম বিনা দ্বিধায় সে যা বলতে চায় বলতে পারে। আবার একটা মন ভোলানো হাসি দিয়ে বলল "আপনার ব্যাগে চার আনা সিকি আছে কিনা তা আমি জানিনা কিন্তু যদি থেকে থাকে তা হলে ঐ সিকি আপনার কোন কাজে লাগবে আপনি কিন্তু তা জানেন না। ঐ সিকিটা পেলে আমার কাল দুপুরের ছাতু খাওয়া হয়ে যেত।"

ওর এতক্ষণ ধরে এত ভাল কাজ করার পর আমারই নিজের মনে একটু সন্দেহ হচ্ছিল যে ওকে একটু কম পারিশ্রমিক দিয়েছি কিনা। এই কথা শুনে আমি একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। সত্যিই তো ব্যাগে সিকিটা আছে কিনা জানিনা — এবং যদি থেকেই থাকে তাহলে আমার কি ভীষণ কাজে লাগবে তাও অজানা। অথচ যে লোকটা এত খেটে

এত ভাল কাজ করল সে ঐ সিকিটা পেলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হত? খুবই লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি পকেট থেকে ব্যাগটাকে বার করলাম। এই দেখে মুচি বলে উঠল "না বাবুজী যা ঠিক হয়েছে তার চেয়ে আমি কমও নেব না আর বেশিও নেব না। যা দিয়েছেন সে তো আমরা দরাদরি করেই ঠিক করেছি। আমি এতেই খুশি।" এই বলে একটু স্মিত হাসি হেসে আমাকে উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়ে গেট খুলে বেরিয়ে গেল। আমি বিদ্যুত-স্পৃষ্টের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর ঠিক করলাম যে এমন ভদ্রলোকের সঙ্গে দরাদরি করে নিজেকে আর ছোট করব না।

এর পর থেকে আমার ছুটির দিন যখনই মুচি আসে আমি মেয়ের হাত দিয়ে টাকা পাঠিয়ে দিই — আর ও কেটে নিয়ে যা ফেরৎ দেবার দিয়ে দেয়। একদিন চার-পাঁচ জোড়া জুতোর কাজ করল বেশ অনেকক্ষণ ধরে। কাজের শেষে মেয়ে জানাল যে মুচি দুটাকা চাইছে। আমার সন্দেহ হল যে মেয়ে বোধ হয় মুচির কথা ঠিক বুঝতে পারে নি কেননা এত কাজ এত কমে হবে কি করে। বাইরে এসে বললাম "যে তোমার বিটিয়া সম্ভবত তোমার কথা বোঝে নি — ও বলেছে দুটাকা দিতে। কত দিতে হবে বলো?" ও হেসে জানাল যে বিটিয়া ভুল বলে নি, ও দুটাকাই চেয়েছিল। আরও বলল যে খুচরো থাকলে তাই দিতে কারণ ওর কাছে সেদিন ভাঙানি ছিল না আর কোন কাজ করে নি বলে। আমি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম "ব্যাপারটা কি? এতগুলো জুতোর কাজ করে এত কম চাইছ কেন? কারণটা তো ঠিক ধরতে পারছি না।"

—"বাবুজী আপনি কথাটা তুলে ভালই করেছেন। সেই কবে আপনাকে একটা সিকির কথা বলেছিলাম তারপর থেকে রাগ করেই হোক বা বিশ্বাস করেই হোক আপনি আর কোনও দিন দর করেন নি। তাই পাছে আপনি ভাবেন যে আপনাকে ঠকাচ্ছি এই ভয়ে আমি বাজার ভাও চাইতে সাহস করি নি। আপনি বাবু আমার সঙ্গে দরাদরি করুন তাহলে আমি একটু বেশি পেতে পারি। তবে বাবু আমার কোন ক্ষতি হয় না। আমি বিটিয়ার সঙ্গে এত বাতচিত্ করি যে আমি সব মেহনত ভুলে যাই। তাই যা পাই তাই মুফৎ বলে মনে হয়।" এবারে একটু বিরক্ত হয়ে বললাম "দেখ তুমি আমাকে ঠকাবার দায় মুক্ত হতে গিয়ে যদি আমাকে তোমায় ঠকাবার দায়ে ফেল আমার অজান্তে, সেটা কি ঠিক? বিটিয়ার সঙ্গে তোমার সুখ দুঃখের কথা হয় সেটা অন্য ব্যাপার তার সঙ্গে কাজের পারিশ্রমিকের কোনও সম্পর্ক নেই।"

খুব হেসে ও উত্তর দিল, "সত্যিই আমার গলতি হয়েছে — এরপর আর হবে না। তবে কখনও কখনও অন্য মুচিকে দিয়ে কিছু কাজ করিয়ে নেবেন তাহলে কাজের ভাও কি চলছে তা বুঝতে পারবেন।" আমি বললাম "তুমি ভাল করেই জানো যে তোমার বিটিয়া অন্য কাউকে এখানে ঢুকতে দেবে না। কাজেই অন্য মুচিকে দিয়ে দর যাচাই করার প্রশ্নই ওঠে না।" একটু গম্ভীর হয়ে ও উত্তর দিল "আমারও তো সেই মুশকিল। এক বৃহস্পতিবার আমার খুব বোখার ছিল। তাই আমার এক দেশওয়ালী ভাইকে বললাম যে ও যেন একবার আপনার বাড়ি ঘুরে যায় বিটিয়ার জুতো পালিশ করে দেবার জন্য। বিটিয়া ওকে জুতো দিল না এই বলে যে সে বিটিয়ার মুচি নয়। তারপর আমার বোখার হয়েছে শুনে বিটিয়া ওর হাতে পাঁচটা গোলি দিয়েছিল আমার খাবার জন্য। বাবুজী কি তেজী দাওয়াই দিয়েছিল বিটিয়া যে এক গোলিতেই আমার ঘাম দিয়ে বোখার ছুটে গেল। আমি তিন গোলি খেয়ে একদম ফিট। বিটিয়া বড় হলে ভাল ডাক্তার হবে। যাক বাবুজী এখন যখন ভরসা পেলাম এর পর থেকে আমি আপনার প্রতি বা আমার প্রতি অন্যায় করব না।"

মেয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ডাক্তারি করছে জেনে একটু ঘাবড়ে গেলাম। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম যে ও কি ওষুধ দিয়েছিল। ও চট করে ঘরে গিয়ে এক পাতা "ক্রোসিন" এনে বলল "কেন আমার খুব জ্বর হলে মা যে ওষুধ আমাকে দেয় আমি তাই দিয়েছিলাম। আর মুচি তো আমাকে আগে বলে গেছে যে সেই ওষুধ খেয়ে ওর জ্বর সেরে গেছে। ও তো বসে রয়েছে, ঠিক কিনা জিজ্ঞেস করো না।" আমি মেয়েকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে যদিও এই ওষুধ ঠিক ছিল এবং তাতে মুচির উপকার হয়েছে — কিন্তু ডাক্তার ছাড়া কারুরই ওষুধ দেওয়া উচিত নয় কারণ ভুল ওষুধ হলে

মানুষের অসুখ বেড়ে যেতে পারে। কিন্তু আমার মেয়ে কিছুতেই বুঝতে চাইল না যে ও ভাল কাজ করার পর ওকে আমি কেন সাবধান করছি। ঠিক বচসা না হলেও আমাদের কথাবার্তা একটু বেশ উঁচু স্বরে হতে আরম্ভ করেছিল।

এবার মুচি আমাদের কথায় যোগ দিয়ে বলল "বাবুজী আপনি যা বলছেন তা বেঠিক নয়, তবে বিটিয়াকে বকবেন না। কোন অসুখ দাওয়াইতে সারে না, বাবুজী,সারে প্যায়ারে। ছোটোবেলায় দেশে যখন আমার ভাইবোনেদের অসুখ হত তখন আমার মা তো বৈদ্য ডাকতে পারতেন না — মার হাতে পয়সা থাকতনা — মা জঙ্গল থেকে জরিবুটি নিয়ে এসে কোনটাকে পিষে কোনটাকে ছাল দিয়ে কি দাওয়াই তৈরি করতেন তাতেই আমাদের ইলাজ হত — আমরা ভাল হয়ে যেতাম। দাওয়াই আমাদের ভাল করত না বাবুজী — আমরা ভাল হতাম মার প্যায়ারে। বিটিয়া যে গোলি পাঠিয়েছিল সে তো ছিল প্যায়ার। আমি তো তাতে ভাল হয়েছি। মায়ের প্যায়ার আর বিটিয়ার প্যায়ার তে একই হয় — তাই বিটিয়ার দাওয়াই এত তেজী ছিল। আর কোন গরিবের ইলাজ যদি করতে চায় বিটিয়া, তাহলে ওকে বাধা দেবেন না।"

এই করে মুচি যে কবে থেকে আমাদের পরিবারের প্রায় একজন হয়ে গিয়েছিল তার দিনক্ষণ মনে নেই। মেয়ে তার সব সুখদুঃখের কথা আমার বা তার মার বা তার ইস্কুলের ক্লাসটিচারের বিরুদ্ধে সব নালিশ মুচিকে জানাত। আর মুচি ওকে যা বোঝাত বা উপদেশ দিত তা ওর কাছে বেদবাক্য হয়ে দাঁড়াত।

এক ছুটির দিন দুপুরে শুনতে পেলাম একটা চেঁচামেচি হচ্ছে আমার মেয়ে ও মুচির সঙ্গে। খুব অস্বাভাবিক ব্যাপার। আমি বেরিয়ে এলাম কি হচ্ছে দেখার জন্য। বেরোতে বেরোতে শুনতে পেলাম মুচি বলছে "বাবুজীকে ডাকো", আর মেয়ে তেমনি জোর দিয়ে বলছে "যা দিয়েছি ঠিক দিয়েছি বাবাকে ডাকবো না।" আমি বাইরে এসে পড়ায় মুচি বেশ আশ্বস্ত হয়ে বলল "বাবুজী বোঝান তো বিটিয়াকে, যে দশ রুপিয়া আর দশ আনা এক নয়।" এই বলে সে একটা দশ টাকার নোট আমার হাতে দিয়ে দিল। কথা শুনে যা বুঝলাম তা হচ্ছে যে কাজ করার পর মুচি মেয়েকে বলেছিল দশ আনা নিয়ে আসতে। আমার মেয়ে এখন ইংরেজি পড়তে শিখেছে। সে আমাকে বা তার মাকে বিরক্ত না করে আমার মানিব্যাগ হাতড়াতে শুরু করে দশ আনার জন্য। ইংরেজি পড়তে পারলে কি হবে ওর হাতে খড়ি তো মেট্রিক পদ্ধতিতে হয়েছিল। কাজেই সে আনা জানে না। তাই ব্যাগে একটা দশ টাকার নোট পেয়ে ভেবেছিল যে সেটাই মুচির প্রাপ্য। দশ আনার জন্য দশ টাকার নোট পেয়ে একটু হকচকিয়ে গেলেও প্রথমে মুচি নিজের কাছে কতো খুচরো আছে তার হিসাব করে। যখন দেখল যে তার কাছে ভাঙানি নেই তখন নোটটা ফেরত দিয়ে মেয়েকে বলে যে এটা নয়, বাবুজীকে বলে দশ আনা নিয়ে আসতে। মেয়ের ইংরেজি জ্ঞানের ওপর এরকম সন্দেহ প্রকাশ করাতে মেয়ে খেপে গিয়ে ঝগড়া শুরু করে। আমি মীমাংসা করলাম দশ টাকার নোটটা ফেরত নিয়ে মুচিকে এক টাকার নোট দিয়ে এবং ভাঙানি না চেয়ে। মুচি যখন এক টাকার নোট পেয়ে খুশিতে হাসতে হাসতে চলে গেল তখন আমার মেয়ের একটু সন্দেহ হল যে সে ইংরেজি পড়তে পারলেও কখনও কখনও "এক" "দশের" চেয়ে বেশি হতে পারে।

গ্রীষ্মকাল। সেদিন দুপুরে দারুণ গরম পড়েছে। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ। পাখা চলছে কিন্তু ঘরের ভেতরেও গরম হাওয়া। মুচি তার সাপ্তাহিক রাউন্ডে আমাদের বাড়ি এসেছে। এসে মেয়ের কাছে জল চেয়েছে। সে এক বোতল ঠাণ্ডা জল আর একটা কাচের গেলাস নিয়ে হাজির। তখনই হাঙ্গামার সূত্রপাত। মুচি কিছুতেই গেলাসে জল খাবে না। আর মেয়েও ছাড়বে না। এই বাদানুবাদের মধ্যে আমি গেলাম শালিসি করতে। আমি যেতেই মুচি বেশ রাগত ভাবে বলে উঠল "দেখুন আপনাদের কাউকে না জানিয়ে বিটিয়া একটা কাচের গেলাস নষ্ট করতে চায় আমাকে জল খাইয়ে।" আমার মেয়ের উলটো নালিশ যে মুচির হাত এত নোংরা যে ও যদি আঁজলা করে জল খায় তাহলে অসুখ করে যাবে। ওকে গেলাসে জল খেতেই হবে। ঝগড়া যখন তুঙ্গে তখন মুচি রাগ করে বলে উঠল যে বিটিয়া যদি ওর কথা না শোনে তাহলে দূরে করপোরেশনের যে টিউবওয়েল আছে সেখানে যাবে জল খেতে। তখন বাধ্য হয়ে আমাকে বলতে হল

"দ্যাখো এই গরমে তুমি পিপাসায় বিটিয়ার কাছে জল চেয়েছ। সে জল এনেছে। তুমি যদি না খেয়ে চলে যাও তাহলে শুধু ও যে মনে কষ্ট পাবে তাই নয়, তুমি আমাদের সবাইকে তৃষ্ণার্তকে জল না দেবার পাপের ভাগী করবে। এতদিনের পরিচয়ে এটা কি তোমার পক্ষে উচিত হবে? যদিও আমাদের কোন আপত্তি নেই তোমার জল খাওয়া গেলাস ধুয়ে ব্যবহার করতে। কিন্তু যদি তোমার সংস্কারে বাধে তাহলে আজ এখন এই গেলাসে জল খাও এবং পরে নিজের বাড়িতে গেলাসটা নিয়ে গিয়ে চা খেও।" আর কোন কথা না বলে ঢক্ ঢক্ করে সমস্ত বোতলটার জল খেয়ে, গেলাসটা মুছে নিজের কাছে রেখে ছাতা খুলে কাজ করতে শুরু করল। মুচি তার সঙ্গে তর্কে হেরে যাওয়ায়, মেয়ে মহানন্দে মোড়া টেনে এনে বসে গল্প শুরু করে দিল।

সালটা ঠিক মনে পড়ছে না — সম্ভবত ১৯৭২ হবে। সেদিন ১৫ই আগস্ট। বিকেলে রাজভবন যেতে হবে। আমার জুতোটা বেশ পুরনো হয়ে গেছে — সাত আট বছর হবে। শুকিয়ে যাওয়া মাটিতে যেমন ফাটা দাগ হয় আমার জুতোর সামনে সেরকম দাগ হয়ে গেছে। কেবল ভাবছি কি করে এটাকে একটু রঙ দিয়ে বা বেশি পালিশ করে খানিকটা চলনসই করে আজকের বিকেলের রিসেপশনটা পার করা যায়। বছরে দুবার রাজভবনে যাওয়া এবং সে সময়ে কচিত কখনও শীতকালে দিল্লি বা উত্তরবঙ্গে যাওয়া ছাড়া এই জুতোর আর কোন ব্যবহার নেই। তাই একে বাতিল করে দিয়ে আর এক জোড়া নতুন জুতো একশ-দেড়শ টাকা দিয়ে কেনার কোন যুক্তি নেই। আমাদের মুচি বাঁধা দিনে আসে । আজ তার আসার দিন নয়। ভাবছি যদি আসত তাহলে কি ভালই না হত। নিজে বুরুশ চালাচ্ছি আর মুচির কথা ভাবছি। হঠাৎ মনে হল দূরে কোথায় যেন সেই সুর "মোচি ল্লাই জুতি-ই"। তাড়াতাড়ি রাস্তায় বেড়িয়ে দেখি দূরের মোড় থেকে মুচি অন্য কোথাও চলে যাচ্ছে। দৌড়ে গিয়ে তাকে ডেকে এনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। জুতো জোড়াটাকে ওর সামনে রেখে জিজ্ঞেস করলাম এটাকে কাজ চালাবার মত ভদ্রস্থ করতে পারবে কিনা। জুতো দেখে ও বলল যে, এর জান চলে গেছে। নতুন জুতো কিনতে হবে। উত্তরে আমি বললাম যে জুতোটা পুরনো হয়ে গেছে তা আমি জানি। কিন্তু বছরে দুবার রাজভবনে যাবার জন্য এত টাকা খরচ করতে আমি রাজি নই; ও কি করতে পারে তা বলুক। রাজভবনের নাম শুনেই দেখলাম ও খুব উৎসাহিত হয়ে পড়ল। জিজ্ঞেস করল " ওখানে গেলে লাটসাহেবের সঙ্গে আপনার মোলাকাত হবে।" আমি জানালাম "হ্যাঁ হবে।" এবার সে শুধু উৎসাহিত নয়, রীতিমত উত্তেজিত হয়ে বলল "আমি তো কোনদিন এই প্রাসাদে ঢুকতে পাবো না — তবে আমার হাতের কেরামতিতে আপনার জন্য লাটের জুতো এমন করে দেব যে জহরতের মতো চক্‌মকাবে — তবে হ্যাঁ ডবল দাম নেব — লাটের জুতোর জন্য। ওকে শুধরে দেবার জন্য বললাম যে এটা লাটের জুতো নয়, আমার জুতো। উত্তরে সে জানাল যে ওর কাছে এটাই লাটের জুতো। তারপর থেকে সে বরাবর ১৫ই আগস্ট ও ২৬শে জানুয়ারি দুপুর বেলায় এসে "লাটের জুতো" পালিশ করে যেত।

১৯৭৪ সালে আমরা দিল্লি চলে যাই। মা কলকাতায় থাকতেন। মার কাছে শুনলাম যে মুচি নিয়মিত না হলেও মাঝে মধ্যে এসে বিটিয়ার ও মার খবর নিয়ে যেত। এবং ১৫ই আগস্ট ও ২৬শে জানুয়ারি ঠিক আসত খোঁজ নিতে আমি কলকাতায় এসেছি কিনা। সত্তরের শেষে আমরা আবার কলকাতায় ফিরি তিন বছরের জন্য। ততদিনে আমার মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। তাহলেও মুচি তার বিটিয়ার সঙ্গে সেই একরকম ব্যবহার করত। শুধু তফাতের মধ্যে বিটিয়া আর ওর কাছে নালিশ করে না। উলটে মুচি তার পরিবারের সমস্যা বস্তির বাড়িওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া এসব জানাত আর পরামর্শ নিত। ১৯৮২ সালের জানুয়ারি মাসে আমরা বহুদিনের জন্য দিল্লি চলে গেলাম — এক হিসেবে এখনও ফিরি নি, যদিও দিল্লিতে নেই মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতাম কাজে দু-একদিনের জন্য; কিন্তু মুচির সঙ্গে আর দেখা হয় নি। ক্রমে ক্রমে সেও আমাদের বাড়িতে আসা কমিয়ে দিল। শেষের দিকে ও আর আসত না। মা একবার খবর দিলেন যে অন্য কোন মুচি ওঁকে জানিয়েছে আমাদের মুচির অসুখ হওয়ায় দেশে চলে গেছে। বহুকাল সে আর আমাদের বাড়ি আসে নি। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছি আর ভাবছি

মুচি যদি কলকাতায় ফিরে এসে থাকে তাকে কি করে খবর দেব যে, আজ তার বিটিয়ার বিয়ে। বহুকাল আগে ও-ই আমাকে বলেছিল যে দেখতে দেখতে বিটিয়া বড় হয়ে যাবে, তার শাদি হবে আর চিরকালের মতো আমার ঘর ছেড়ে চলে যাবে — যা বলেছিল আজ তা সত্যি হচ্ছে। চিন্তা করছি কাকে বলব ওকে খোঁজ দিতে। ভাবলাম যদি অন্য কোন মুচি যায় তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করব। কিন্তু কি জিজ্ঞেস করব তাকে? এই বিশ বছরে ওর নাম তো কোনদিন জানতে চাই নি — ওর ঠিকানা তো কখনও জিজ্ঞেস করি নি — আমি। কি অন্যায় করেছি আমরা, যাকে পরিবারের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছি, তার ন্যূনতম মানবিক পরিচয় — নাম ও ঠিকানা কোনদিন জানি নি বা জানবার চেষ্টা করি নি। ও আমাদের কাছে শুধু নামহীন, গোত্রহীন, ঠিকানাবিহীন মুচি-ই রয়ে গেল। ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে শুধু নিজেদের অহংকে তৃপ্ত করেছি — ওকে মানুষের মর্যাদা দিই নি। ক্ষোভে লজ্জায় মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করল। এক ভরসা হচ্ছে বহুকালের অভ্যাসবশত "লাটের জুতো" পালিশ করতে যদি কাল দুপুরে আসে। আমাদের বাড়িতে যাঁরা ছিলেন এবং আগামীকাল দুপুরে যাঁরা থাকতে পারেন তাঁদের সবাইকে অনুরোধ করলাম যে কাল দুপুরে যদি কোন মুচি আসে তাকে যেন সঙ্গে করে বিয়েবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। আমাদের সামনের বাড়ির কাজের লোকটি বহুকালের। তাকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলাম মুচির কথা। ও বুঝতে পারল। জিজ্ঞেস করল "সেই মুচি যে আপনার বড়মেয়ের ছোটবেলায় ইস্কুলের জুতো পালিশ করত? তাকে তো দেখি নি বেশ কিছুদিন।" আমি অনুরোধ করলাম যে ও যদি আজ বা আগামী কাল কোথাও তাকে দেখতে পায় এপাড়ায় তাহলে যেন সঙ্গে করে তাকে নিয়ে বিয়েবাড়িতে যায়। নিজের থেকে হয়তো মুচি বিয়ে বাড়ি যেতে চাইবে না।

পরের দিন দুপুরে বরভোজন হয়ে গেল। মেয়ের যাবার সময় এগিয়ে আসছে। সবায়ের মন ভার। মেয়েকে সাজানো হচ্ছে। একবার ওর ঘরে গেলাম। হঠাৎ মেয়ে জিজ্ঞেস করল "বাবা আজ 'লাটের জুতোর' দিন না? মুচি যদি আসত তাহলে কি খুশিই না হত আমার বিয়ে দেখে। ছোটবেলায় আমার বিয়ে নিয়ে কত গল্প করত — ঘোড়ায় চড়ে বর আসবে হাতিতে করে দানসামগ্রী যাবে আরও কত কি।" আমি তাকে জানালাম যে আমি সবাইকে বলে রেখেছি যে ও যদি আমাদের বাড়ি বা রাস্তায় আসে তাহলে সঙ্গে করে এখানে নিয়ে আসতে ওর সঙ্গে দেখা করাবার জন্য। "সে শুধু খুশি হত তাই নয়, তোর যাত্রার সময় তোর ঠাকুমা, মা ও আমার মতোই আনন্দে-বিষাদে চোখের জল ফেলত একই সঙ্গে।" শাঁখ ও উলুধ্বনির মধ্য দিয়ে স্বামীর সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করতে মেয়ে যখন এ-বাড়ি ছাড়ল তখন বেলা সাড়ে তিনটে। মুচি তখনও আসে নি।

আজ আমার বড়মেয়ে আর মুচির 'বিটিয়া' তার স্বামীর সঙ্গে লস্ এনজেলেসে — আর যদি বেঁচে থাকে তবে সেই বহু পরিচিত নামহীন ঠিকানাহীন মুচি উত্তর বিহারের কোন অজানা গ্রামে কি করে জীবন কাটাচ্ছে — কে জানে? মিনি-কাবুলিওয়ালা, বিটিয়া-মুচি, এবং তাদের এই পবিত্র সুন্দর মধুর সম্পর্ক স্থান ও কাল অতিক্রম করে চিরন্তন ও অবিনশ্বর হয়ে থাকুক।

আত্মকথনের ত্রিধারা

পিনাকী ভাদুড়ী

১৩১৭ সনের ২৮শে ভাদ্র রবীন্দ্রনাথ পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। ইংরেজি ১৯১০ সাল—কবির বয়স তখন উনপঞ্চাশ। সম্ভবত কবির কাছে তাঁর জীবনবৃত্তান্ত জানতে চাওয়া হয়েছিল, তারই জবাবে এই চিঠিটি লেখা হয়। গোড়াতেই কবি লিখেছেন—'আমার জীবনচরিত্র লিপিবদ্ধ করিবার যোগ্য নহে।' তথাপি, বোধহয় অনুরোধ এড়াতে না পেরেই চিঠিতে নিজের জীবনের একটি সংক্ষিপ্তসার তুলে দিয়েছিলেন। প্রায় দায়সারা ভাবে জীবনের ঘটনাপঞ্জী বলে গিয়েছেন। জন্মের তারিখ, কবে বিলেত গেলেন, বিয়ে হল কবে, কিভাবে কবিতা লিখছেন, বই ছাপাচ্ছেন, ইত্যাদি তথ্য দিচ্ছেন নীরসভাবে। যেন শুকনো, বাসি খবর সব এদের মধ্যে খুব একটা আগ্রহ দেখা যায় না। নিজের বই কবে কোনটা ছাপা হয়েছে তাও তাঁর মনে নেই, লিখছেন একথা। মনে না পড়লেও বইগুলো উলটে দেখে নিলেই প্রকাশকাল জানা যেত, সেটুকু পরিশ্রমও করতে চান নি রবীন্দ্রনাথ। আসলে এভাবে সালতারিখ মিলিয়ে নিজের কথা বলতে তাঁর ইচ্ছে হয় নি।

জীবনী বলতে যা বুঝি সেইভাবে রবীন্দ্রনাথের জীবনী লিখেছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর সুবৃহৎ গ্রন্থে কবির জীবনের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথ নিজে এ ধরনের জীবনীগ্রন্থে উৎসাহিত না হলেও তাঁর জীবনের তথ্য পাবার জন্য অনেককে প্রভাতকুমারের বইটিকেই দেখতে বলতেন। সাম্প্রতিককালে এই জীবনী নতুন করে লিখতে শুরু করেছেন প্রশান্তকুমার পাল। ঠাকুরবাড়ির কাগজপত্র, হিসেবের খাতা প্রভৃতি পরীক্ষা করে তিনি রবীন্দ্রজীবনীতে বহু নতুন তথ্য যোজনা করেছেন। প্রভাতকুমারের গ্রন্থের স্বাধীন পরিপূরক হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রশান্তকুমারের গ্রন্থ।

রবীন্দ্রনাথ নিজে অবশ্য এই দুই গ্রন্থের ধরনকে পছন্দ করতেন বলে মনে হয় না। এই দুটি বই আমাদের কাছে যত প্রয়োজনীয় হোক না কেন, রবীন্দ্রনাথ যখন নিজের কথা বলেছেন, তখন তার ভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে উঠেছে। তাঁর জীবনযাপনের তথ্য দেবার বদলে জীবন গড়ে ওঠার অন্তর্নিহিত তত্ত্বটিই তিনি বলতে চেয়েছেন। এই কাজটি তিনি বিভিন্নভাবে করেছেন। ওপরের চিঠিটি লেখার আগেই কিছু কিছু প্রবন্ধে তিনি এসব কথা বলতে আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। সেইসব প্রবন্ধ জড়ো করে কবির মৃত্যুর পরে ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত হল 'আত্মপরিচয়'। এ নাম কবির দেওয়া নয়। প্রবন্ধগুলির সংখ্যা হল ছয়, ১৯০৪-এ লেখা

প্রথমটি, শেষটি লিখেছেন ১৯৪০-এ। স্বভাবতই তাঁর চিন্তার পরিণতি এতে পাওয়া যাবে, সেইসঙ্গে পাওয়া যাবে ভাষার বিবর্তন। সাধুভাষায় লেখা শুরু, ক্রমশ চলে গেছেন চলতিভাষায়। এও তাঁর অন্য পরিচয় বইকি।

এসবের মধ্যেই ১৯১২-এ লিখেছেন 'জীবনস্মৃতি'— ১৯৪০-এ লিখলেন 'ছেলেবেলা'। তিনটি গ্রন্থেই তাঁর আত্মজীবনী ধরা রইল ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। অবশ্য ঘোষণা না করেও কবি নিজের জীবনের কথা বলতে পারেন — রবীন্দ্রনাথও বলেছেন তাঁর কবিতায়, তাঁর উপন্যাসে। 'গোরা' বা 'ঘরেবাইরে'র কথা আমরা ভাবতেই পারি এ প্রসঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় বলেছেন — 'কবিরে পাবে না জীবনচরিতে।' প্রতিদিনের মানুষ প্রতিদিনের স্তুতি-নিন্দায় বিচলিত হয়, কিন্তু তার গড়ে ওঠার খবর ঐ প্রতিদিনের ঘটনাপঞ্জীতে থাকে না। প্রকৃতির মধ্যে, মানুষের মধ্যে, শিল্পে সংগীতে কবি দিনে দিনে হয়ে উঠতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের জীবন সেই হয়ে ওঠার কাহিনী। সেইজন্যই কবি যখন আত্মজীবনী লেখেন তার মধ্যে দিনক্ষণ মিলিয়ে ঘটনার আবৃত্তি করেন না।

১৯৩২ সালের নভেম্বর মাসে কবির লেখা দুটি চিঠির কথা এখানে উল্লেখ করা চলে। ৫ই নভেম্বরের যে চিঠিটি তিনি বুদ্ধদেব বসুকে লিখেছিলেন, তার প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি হল এইরকম—

> আমার নিজের জীবনবৃত্তান্ত আমি যথাযথ জানি নে মনেও থাকে না। যারা বাইরে থেকে জানে ও সংগ্রহ করে, এ সম্বন্ধে তারাই আলোচনার অধিকারী। প্রশান্ত এই কাজ করে আসছে তার দফতরও ভারি। তার নীচেই, দ্বিতীয়স্থান দেওয়া যেতে পারে অমিয়কে। তার নীচেই প্রভাতকুমার—চীনের পুরাবৃত্ত ও রবীন্দ্রনাথের ইতিবৃত্ত তার বিশেষ আলোচ্য। সকলের চেয়ে অযোগ্য হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ। তার কাজ সে করে এসেছে, এই সত্তর বছর ধরে বেঁচে আছে। গাল খেয়েছে যথেষ্ট কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আজও মরে নি।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, অমিয় চক্রবর্তী এবং প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—এই তিনজনের নাম করেছেন কবি যাঁরা তাঁর জীবনের খুঁটিনাটির খবর রাখেন। ভবিষ্যৎ কালকে কবির সংবাদের জন্য এঁদের সংগৃহীত এবং সংরক্ষিত তথ্যের দিকেই নজর দিতে হবে।

এর তিনদিন পরেই আরেকটি চিঠি লিখলেন শ্যামাদাস লাহিড়ীকে—

> আমার জীবনের ইতিহাস আমার পক্ষে লেখা সম্ভব হবে না। ইচ্ছাও নেই, সময়ও নেই। আমার বচনার মধ্যে দিয়েই আমার জীবনের যেটুকু প্রকাশ পায় আমি বোধ করি পাঠকদের পক্ষে তাই যথেষ্ট। মানুষ হিসাবে নিজেকে আমি বিশেষভাবে আলোচ্য বলে মনেই করিনে। আমার সম্বন্ধে অন্যেরা যা লিখেছে তা নিঃসন্দেহেই নির্ভরযোগ্য নয়।

পাশাপাশি দুটি চিঠি পড়লে একটু অবাক হতেই হয়। তিন দিন আগে যিনি তাঁর জীবনের সংবাদ পাবার জন্য তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম করছেন, তিনিই আবার এখন কেন বলছেন যে তাঁর সম্বন্ধে অন্যেরা যা লিখছে তা নির্ভরযোগ্য নয়? অর্থাৎ ঘটনাবহুল জীবনবৃত্তান্তকে তিনি তো জীবনী বলতেই চাননি। এইজন্যই 'আত্মপরিচয়ের' প্রথম প্রবন্ধে তিনি বলে নিয়েছেন— 'এইলে আমার জীবন বৃত্তান্ত হইতে বৃত্তান্তটা বাদ দিলাম।' সেইসঙ্গে বলেছেন যে তাঁর কাব্যের মধ্যেই তাঁর যে জীবনটা প্রকাশিত সেইটাই বলার মতো। এই প্রবন্ধটি লেখা হয় ১৯০৪ সালে, ১৯৩২-এ শ্যামাদাস লাহিড়ীকে লেখা চিঠিতেও সেই একই কথা—

'আমার রচনার মধ্যে দিয়েই আমার জীবনের যেটুকু প্রকাশ পায় আমি বোধ করি পাঠকদের পক্ষে তাই যথেষ্ট।' সমসাময়িক খাতাপত্র থেকে তথ্যসংগ্রহকে জীবনচরিত বলতে চাননি।

বাংলা সাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথও আত্মজীবনীতে নিজের কথা না বলে বলেছেন নিজের বিশ্বাসের কথা। এই আত্মজীবনী রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হয়তো সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথ নিজের বেলায় ভিন্ন ধরনের আত্মকথনে প্রবৃত্ত হতে পেরেছিলেন। এই ধরনটি ভিন্ন বলেই একে অনেকে প্রচ্ছন্ন অহংকার বলে মনে করতে পারেন। দেবেন্দ্রনাথ সেজন্য লিখেছিলেন—'আমি এই পৃথিবীতে জীবিত থাকিতে ইহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিবে না।' রবীন্দ্রনাথের বেলাতে তো দ্বিজেন্দ্রলাল স্পষ্টই বলেছিলেন—'রবীন্দ্রবাবু তাঁর আত্মজীবনীকে Inspiration দাবি করে যখন নিজের কবিতাবলি সমালোচনা করতে বসেছিলেন তখন তাঁর দম্ভ ও অহমিকায় আমি স্তম্ভিত হয়েছিলাম।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার মধ্যেই নিজের পরিণতিটি অনুভব করতে পেরেছিলেন। এটা ঠিকই, লেখক তাঁর রচনায় নিজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জাগতিক অভিজ্ঞতাকে তাঁর মানসিক অনুভূতির বিকাশে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। সেইজন্যই তাঁর আত্মকথন শুধু সনতারিখের পুঞ্জীভূত আর্কাইভ হয়নি। কেবল অভিজ্ঞতাই যখন লেখকের অবলম্বন হয় তখন তিনি ঘটনাসংস্থান বা পাত্রপাত্রীর চরিত্র ঐ অভিজ্ঞতার রসে জারিত করে তোলেন। যেমন যেমন তিনি ঘটতে দেখেন, তাই নিয়েই বানিয়ে তোলেন কাহিনী। রবীন্দ্রনাথের বেলায় তাঁর রচনার পটভূমিকে কিঞ্চিৎ ভিন্ন কৌশলে তিনি ব্যবহার করেছেন। তাঁর 'গোরা' উপন্যাসে কবি যা দেখেছেন, তাই শুধু লিখছেন ঠিক তা নয়, বরং বলা চলে যা ভাবছেন তা-ই নিয়ে সৃষ্টি করছেন।

রবীন্দ্রনাথ নিজে একসময়ে তথাকথিত হিন্দুয়ানিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। সংকীর্ণ অর্থেই। ১৮৯৮ থেকে, ১৯০৩ বা ১৯০৪ পর্যন্ত। 'হিন্দুর ঐক্য' প্রবন্ধে তার উগ্র প্রকাশ ছিল। 'মাভৈঃ' প্রবন্ধে সতী রমণীদের আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সাবাসি দিয়েছেন। 'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধে ব্রাহ্মণত্বের জয়গান করছেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার পরে প্রথম প্রথম সেখানে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের ভেদ মানা হচ্ছিল।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঢেউ এল যখন, তখন থেকে রবীন্দ্রনাথ বদলে যেতে শুরু করলেন। ১৯১০-এ লিখলেন 'গোরা'। ১৯১৬তে 'ঘরে বাইরে'। এই দুটি উপন্যাসেই রয়েছে রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর অংশ। গোরাকে প্রথম থেকেই আমরা গোঁড়া হিন্দু হিসেবেই দেখি, যে সবরকম আচার অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে থাকে। ঠিক যেভাবে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুত্বের বড়াই করেছিলেন একসময়ে, প্রায় সেইভাবেই গোরা তার যুক্তিকে ধোপা করে ধরেছে। আবার যেমনভাবে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে মিশে গেলেন জনসাধারণের সঙ্গে, যেমনভাবে রাখীবন্ধনের ডাক দিলেন—যা কোনো কবিই শুধু ভাবতে পারেন—তেমনিভাবে গোরার কাছে এসে পৌঁছল বৃহত্তর জীবনের আহ্বান। স্টীমারে বিদেশির হাতে স্বদেশি দীনজনের অপমান তার চোখে পড়ল, তার বুকে এইজন্যই আঘাত লাগল, কারণ 'দেশের এই চিরন্তন অপমান ও দুর্গতিকে শিক্ষিত লোক আপনার গায়ে লয় না'। লক্ষ করতে হবে যে গোরা যত প্রবলভাবে জাত মানে, ছোঁয়া বাঁচিয়ে খাওয়াদাওয়া করে, তার চেয়ে প্রবল হয়ে ওঠে স্বদেশের প্রতি তার মমত্ববোধ, স্বজাতির জন্য বেদনা।

আরও পরে, গোরা যখন নিজের দেশকে দেখতে বেরিয়েছে তখন সে প্রথম দেখল যে তথাকথিত ভদ্রসমাজের বাইরে দেশটা কেমন। দেশ যে কত বিচ্ছিন্ন, কত সংকীর্ণ, কত দুর্বল—সেইখানে তার হৃদয়ের সব আবরণ টুকরো হয়ে যেতে শুরু হল। রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহে থাকছেন, উত্তরবঙ্গে ঘুরছেন জমিদারি দেখার জন্য, সেই সময়ে তিনি মানুষকে কাছ থেকে দেখলেন। সেই বোধহয় ভেতরে ভেতরে তাঁর পরিবর্তনের ভিৎ গড়া হচ্ছিল। গোরা হিন্দুত্বের ধ্বজা তুলে জাত মানবার সঙ্গে সঙ্গে বিচলিত হচ্ছিল দরিদ্র মানুষের দুর্দশায়—রবীন্দ্রনাথেরও কি তাই ঘটছিল? উপন্যাসের শেষভাগে গোরার সমস্ত সীমাবদ্ধতা চূর্ণ হয়ে গেল। এতক্ষণ গোরার প্রতি আমরা কখনো উত্তপ্ত হয়েছি বৈকি, তথাপি তাকে ভাল না বেসে পারিনি। কারণ সে যা বিশ্বাস করত, তাই সে বলেছে এতদিন। আর যখন তার সেই বিশ্বাস ভেঙে গেল, তখন তেমনই আন্তরিক স্বরে গোরা বলে উঠল—'আমি দিনরাত্রি যা হতে চাচ্ছিলুম, অথচ, হতে পারছিলুম না, আজ আমি তাই হয়েছি। আমি আজ ভারতবর্ষীয়। ...আজ এই ভারতবর্ষের সকল জাতই আমার জাত।'

এই পর্যন্ত গোরার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল। গোরা এইখানে থামলেও, রবীন্দ্রনাথ থামেননি। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম আর তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ শুধু ভারতবর্ষীয় হয়েই জীবন সমাপন করেননি, তিনি বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছিলেন।

১৯১৬ সালে লেখা 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসেও রবীন্দ্রনাথ নিজের কথা বলেছেন। গোরার মতো করে নয়। এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ কেবল একটি চরিত্রের মধ্যে নিজেকে ভরে দেননি। উপন্যাসটির দুটি প্রধান চরিত্রের মধ্যেই কোন না কোন ভাবে তিনি উপস্থিত। সন্দীপ যেভাবে স্বদেশীর নামে সবরকম বিকৃতির সাধনা করেছে, রবীন্দ্রনাথও একসময়ে হিন্দুর ঐক্যের জয়গান করেছেন একইভাবে। অবার নিখিলেশের ঔদার্য, স্বদেশী সম্বন্ধে তার ধারণা—এসবের মধ্যে রবীন্দ্রনাথেরই উত্তরণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি নিজে যেভাবে বিদেশি বয়কট আন্দোলনের সমালোচনা করেছিলেন, নিখিলেশও তাই করেছে। রবীন্দ্রনাথকে সেজন্য বহু নিন্দা সইতে হয়েছিল,

নিশ্বিলেশকেও তাই করতে হয়েছে। সারাজীবন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বাসকে ত্যাগ করেননি, নিশ্বিলেশও সেই বিশ্বাসের মূল্য দিতে তার প্রাণ পর্যন্ত পণ করেছে। গোরার মধ্যে দুই রবীন্দ্রনাথই ছিলেন—'ঘরে বাইরে'তে কবি তাঁর কথা বলার জন্য দুজনকে খাড়া করলেন। নিজের প্রাক্তন অন্ধতার ছায়া পড়ল একটি চরিত্রের মধ্যে, আরেকটির ভিতরে নিজের আলোটুকু ছাড়িয়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' গল্প বা 'ডাকঘর' নাটক—দুটিতেই কবির পরিচয় আছে। তারাপদ, অমল —এরা দুজনেই রবীন্দ্রমানসেরই প্রক্ষেপণ। এরা দুজনই কোথাও বাঁধা পড়ে থাকতে চায় না। কেবলই তারা সরে সরে যায়। তারাপদকে একজায়গায় আটকে রাখা অসম্ভব। কখনো যাত্রার দলে, কখনো কারো বাড়িতে সে থাকে—কিন্তু ততটুকুই থাকে, যতক্ষণ তার থাকার ইচ্ছে হয়। মায়ের স্নেহ, বা নারীর হৃদয় কিছুই তার কাছে কিছু নয়। অমল পড়ে আছে গৃহবন্দী হয়ে। কিন্তু তার আকাঙ্ক্ষা শুধু বেরিয়ে পড়া। কেবলই সে দেখে বেড়াবে, চলে যাবে পাহাড় প্রান্তর পার হয়ে। ঠিক যেমন রবীন্দ্রনাথ নিজেকে সুদূরের পিয়াসী বলেছেন, শরীরের উপর জবরদস্তি করে বেরিয়ে পড়েছেন ভ্রমণে—আপশোস করেছেন, 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি'।

এমনিভাবে নিজের কথা তার রচনায় বারে বারে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। সেইটি পড়তে পারলেই তাঁর কথা আমাদের পড়া হয়ে যাবে।

তবু, আলাদা করে ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গীতে আত্মকথনে প্রবৃত্ত হয়েছেন তিনি। সেইগুলো পরীক্ষা করে দেখা যাক।

'জীবনস্মৃতি' অনেকটাই নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গীতে লেখা। যেন নিজের নয়, অন্য কারো কথা বলেছেন লেখক। পাঠক এ বই পড়তে পড়তে যা জানবে, লেখক যেন এ বই লিখতে লিখতে তা-ই জানছেন। নিজের দিকে তাকাচ্ছেন যেন বাইরে থেকে। যেন অন্য কেউ। রবীন্দ্রনাথ একদিন নিজের কথা ভেবেই একটি গান লিখেছিলেন—

যে আমি ওই ভেসে চলে কালের ঢেউয়ে
আকাশতলে
ওরই পানে দেখছি আমি চেয়ে

ধুলার সাথে, জলের সাথে, ফুলের সাথে,
ফলের সাথে
সবার সাথে চলছে ও যে ধেয়ে।

ও যে সদাই বাইরে আছে, দুঃখে সুখে নিত্য
নাচে
ঢেউ দিয়ে যায়, দোলে যে ঢেউ খেয়ে
একটু ক্ষয়ে ক্ষতি লাগে একটু ঘায়ে ক্ষত
জাগে
ওরই পানে দেখছি আমি চেয়ে।

যে আমি যায় কেঁদে হেসে তাল দিতেছে
মৃদঙ্গে সে
অন্য আমি উঠতেছি গান গেয়ে—

এও সেই কথাই বলা হচ্ছে—নিজেকে যেন দেখছেন বাইরে থেকে, দূরের থেকে। 'এই যে আমি ওই আমি নই'—নিজের জীবন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই তত্ত্ব তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছে যে তিনি যা, তা তিনি নন। যা ঘটছে, যা তিনি করছেন, সেসবের কোন অন্য নিয়ন্তা আছেন। রবীন্দ্রনাথ তাই চেষ্টা করেছেন নিজের দিকে অন্য কেউ হয়ে দৃষ্টি ফেলতে। ডারউইন তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছিলেন—I have attempted to write the following account of myself as if I were a dead man in another world looking back at my own life—রবীন্দ্রনাথ অবশ্য নিজেকে মৃত ভাবেননি, তবে নিজের থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে নিজেকে দেখতে চেয়েছেন, বুঝতে চেয়েছেন।

সাধারণভাবে মানুষ তার বেঁচে থাকার গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকে না। জীবনযাপনের বাইরে কিছু থাকতে পারে, এভাবে কেউ ভাবে না। রোজকার জীবনের তুচ্ছতা পার হয়ে বৃহত্তর জীবনের ডাক সবার কাছে এসে পৌঁছয় না। রবীন্দ্রনাথের কাছে তা এসেছিল। বেঁচে থাকার বাইরে বা বেঁচে থাকাকে ছাড়িয়ে যেতে পারা যায় কিনা এটাই ছিল তাঁর তপস্যা। তাঁর জামাই নগেন্দ্রনাথকে তিনি লিখেছিলেন যে শুধু জীবিকার্জনের জন্যই বাঁচাটা কোন বাঁচা নয়। কোন বড় আইডিয়ার কথাও ভাবতে হবে। তাঁর নিজের জীবনে এই আইডিয়া কি ছিল, কতটা তিনি তা সফল করতে পেরেছেন এই সমস্ত কথা তাঁর আত্মকথনের মধ্যে বেরিয়ে এসেছে। এগুলো তাঁর অনুভূতির কথা। তাই তিনি ইতিবৃত্ত লেখেননি, লিখেছেন তাঁর আন্তর চেতনার কথা, এঁকেছেন

সেই সমস্ত স্মরণীয় এবং অবিস্মরণীয় ছবি। সূর্যোদয় দেখার কোন তারিখ দেননি তিনি, দিয়েছেন সেই সূর্যোদয়ের অভিঘাতের বিবরণ। একসময়ে ঠাট্টা করে বলেছেন যে বাগানে রোজ সূর্য উঠতে দেখেছি, একদিন চরিতকার তার ছবি তুলতে আসবে হয়তো।

গান্ধিজী তাঁর যে আত্মজীবনী লিখেছেন তার মধ্যেও তাঁর যা উদ্দেশ্য ছিল সেটি তিনি প্রস্তাবনাতে বলেছেন—'যাহা আমি খুঁজিয়া আসিতেছি, সে তো আত্মদর্শন...'। এই রচনার নাম My experiments with truth —জীবন জুড়ে সত্য নিয়ে যেসব পরীক্ষা তিনি করেছেন, তারই কথা বলতে চেয়েছেন তিনি। অবশ্য তাঁর জীবনীতে কালানুক্রমিকতা বজায় আছে, তবু এর মধ্যে তাঁর উপলব্ধির কথা বলাই তাঁর লক্ষ্য ছিল।

রবীন্দ্রনাথও তাঁর উপলব্ধির কথাই লিখেছেন, যদিও ঘটনার ইতিহাস তিনি লেখেননি। তাছাড়া কবির ভাষা এই রচনার সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে, যা অন্য কোন রচনায় পাওয়া সহজ নয়।

রবীন্দ্রনাথ আত্মপরিচয়ের প্রবন্ধগুলি দীর্ঘদিন ধরে লিখেছেন। 'জীবনস্মৃতি' যখন লিখেছেন তখনও তিনি নোবেল প্রাইজ পাননি, দেশের বাইরে তখনও তাঁর খ্যাতি ছড়ায়নি। 'ছেলেবেলা' লিখেছেন তাঁর শেষবেলায়—তখন তিনি শুধু বিশ্ববিখ্যাত নন, বিশ্বকে ছেড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু সেজন্য বইটিতে কোন ম্লানতা স্পর্শ করেনি। 'জীবনস্মৃতি' এবং 'ছেলেবেলা'—দুটিতেই আছে একই ধরনের ভালবাসা। 'জীবনস্মৃতিতে' রয়েছে অনায়াস স্মৃতিচিত্রণ, 'ছেলেবেলা'তে তেমনিই রয়েছে ভাষার চেষ্টাহীন ঐশ্বর্য। 'জীবনস্মৃতি' লেখা হয়েছিল সাধুভাষায়, 'ছেলেবেলা' লিখেছিলেন চলতি ভাষায়। এই দুই গ্রন্থেই ভাষার প্রবাহ মুগ্ধ হয়ে দেখতে হয়।

'জীবনস্মৃতি' শুধুই স্মৃতিপোষা নয়। এর মধ্যে রয়েছে গল্প বলার আনন্দ। রয়েছে রবীন্দ্রনাথের তৈরি হওয়ার কাহিনী। নিজের শিক্ষালাভের সময়টা কবির পক্ষে কেমন পীড়াদায়ক হয়েছিল, সেইটি জানতে পারলে আমরা কবির পরবর্তী জীবনে শিক্ষাদানের প্রয়াসটিকে বুঝতে পারি। সদর স্ট্রীটে থাকার সময়ে একটি সূর্যোদয় তাঁর মনে আশ্চর্য ধাক্কা দিয়েছিল যার জন্য তিনি 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' লিখেছিলেন প্রচণ্ড আবেগতাড়িত হয়ে। এই কবিতাটি কাব্য হিসেবে যে উঁচুদরের নয়, সেকথা পরে কবি অন্য প্রসঙ্গে স্বীকার করেছিলেন, বলেছিলেন কবিতাটা যদি নির্মলনলিনী দেবীর নামে চালানো যেত তবে তিনি বেঁচে যেতেন। কিন্তু কবিতাটি তাঁর জীবনের একটি বিশেষ মুহূর্ত সৃষ্টি করেছিল এবং তিনি জগতের 'অফুরান রসের উৎস'কে দেখতে পেয়েছিলেন। কোনো সাল তারিখ দেন নি, শুধু ঘটনাটি বলেছেন। 'একদিন', 'কিছুকাল'—এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করে গিয়েছেন—কারণ তিনি ইতিহাস লিখছেন না, লিখছেন তাঁর জীবনের উদ্ভাস।

কিছু কিছু সংবাদ 'জীবনস্মৃতি' এবং 'ছেলেবেলা' দু-জায়গাতেই বলা হয়েছে। হতেই পারে, কারণ কবি তো দুভাবে নিজের কথা বলতে বসেছেন। যেমন, শিক্ষালাভের ব্যাপারটা—'জীবনস্মৃতি'তে লিখছেন—'ভোরে অন্ধকার থাকিতে উঠিয়া লংটি পরিয়া প্রথমেই এক কানা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি করিতে হইত'; ঐ একই বিষয় যখন 'ছেলেবেলা'তে লিখেছেন তখন কুস্তি লড়বার আখড়াতে কিভাবে জমি তৈরি হয়েছিল, তাও বলেছেন। অর্থাৎ দুধরনের পাঠকের ছবি ছিল তাঁর সামনে।

'জীবনস্মৃতি'র একটি আশ্চর্য গুণ হল নির্লিপ্ততা। সমগ্র বইটিতে রবীন্দ্রনাথই প্রধান, প্রধানত তাঁর দৃষ্টি, তাঁর প্রতিক্রিয়াই এতে বলা হচ্ছে, কিন্তু রচনার কৌশলে তাঁকে সর্বদাই, একজন দর্শকমাত্র মনে হয়। অথবা মনে হয়, যেন একটি পার্শ্বচরিত্র। এই নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিটাই 'জীবনস্মৃতি'কে পরম সুখপাঠ্য করে তুলেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে কবির পরিচয়ের কথাই হোক, পেনেটির প্রকৃতির বর্ণনাই হোক, অথবা হোক অক্ষয় চৌধুরীর বর্ণনা—সমস্তটাই যেন একজন দর্শক বাইরে থেকে দেখছে। যখন মৃত্যুশোকের কথা বলছেন তখন তাতে বেদনার স্পর্শ লাগলেও তা নিরাসক্ত। আসক্তিহীন অথচ মমতাময় এই দ্বিবিধ ভূষণে ভূষিত 'জীবনস্মৃতি'—নিরলংকার অথচ লাবণ্যময়। 'মৃত্যুশোক' পরিচ্ছেদ থেকে দুটি অংশ উদ্ধৃত করি—

ইহার পরে বড়ো হইলে যখন... একমুঠা..
বেলফুল চাদরের প্রান্তে বাঁধিয়া খ্যাপার মতো
বেড়াইতাম, তখন সেই কোমল চিক্কণ কুঁড়িগুলি
ললাটের উপর বুলাইয়া প্রতিদিনই আমার মায়ের
শুভ্র আঙুলগুলি মনে পড়িত... সেই স্পর্শই
প্রতিদিন এই বেলফুলিগুলির মধ্যে নির্মল হইয়া

ফুটিয়া উঠিতেছে... তা আমরা ভুলিই আর মনে রাখি।

এবং

তবু এই দুঃসহ দুঃখের ভিতর দিয়া আমার মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে একটা আকস্মিক আনন্দের হাওয়া বহিতে লাগিল... যাহাকে ধরিয়াছিলাম তাহাকে ছাড়িতেই হইল, এইটাকে ক্ষতির দিক দেখিয়া যেমন বেদনা পাইলাম তেমনি সেইক্ষণেই ইহাকে মুক্তির দিক দিয়া দেখিয়া একটা উদার শান্তি বোধ করিলাম।

মৃত্যুকে এই, দুভাবে দেখার মধ্যে একই সঙ্গে যে বিষাদ এবং যে নির্লিপ্ত সহনশীলতা রয়েছে তা পড়লে পুণ্যস্নান হয়।

এই গ্রন্থের গদ্যভঙ্গীর সরলতা বাংলাসাহিত্যে বিরল। তাঁর প্রবন্ধ অনেক সময়ে উপমা প্রয়োগে ভারাক্রান্ত অথবা প্রচুর কাব্যপ্রয়োগে আচ্ছন্ন, অনেক রচনাতেই আছে অমিতকথন। কিন্তু 'জীবনস্মৃতি'তে আছে পরিমিতি, সেজন্যই এর প্রসাদগুণ অনন্য। এ-বই পড়ে প্রসন্ন না হয়ে উপায় নেই।

যে কোনো ঘটনার পরিবেশনে লেখক কৌতুকরস মিশিয়ে দিতে পেরেছেন অনায়াসে। দুঃখের ঘটনাও তাঁর হাতে মৃদু এবং নম্র হয়ে অনন্তের আস্বাদ নিয়ে এসেছে। আবার যখন তাঁর কাছে কেউ গতজন্মের পুত্র সেজে আসে, তাকে প্রবঞ্চক বলে চিনলেও, রচনার গুণে তাকে হীন মনে হয় না।

সর্বত্র এই কৌতুকময় সরসতা। ভালো লাগা। সব ভালোলাগার কথাকে মনে রেখেছেন কবি এবং স্মৃতিমন্থন করে এনে উপহার দিয়েছেন আমাদের। পিয়ানোর সুরে তিনি যে কথা বসাতেন, বউদির কাছে বাহবা চাইতেন কবিতা লিখে, বাড়িতে স্বদেশি কর্মের গোপনতার রহস্য কেমন ছিল, তাঁর লেখাপড়ায় নিয়মের চাপ এবং অনিয়মের ঝোঁক, শিক্ষকদের মধ্যে কাদের তাঁর খারাপ এবং কাদের ভাল লেগেছিল—সব কথাই বলতে বলতে কবি নিজেও সেইসব দিনের আস্বাদ নিয়েছেন আবার। পড়তে পড়তে আমরা লেখকের সেই অনুভূতি টের পাই। মনে হয়, আমাদের পাশে বসে আরো একজন এই বইয়ের রম্যতা পরম কৌতুকে উপভোগ করছেন, তিনি এই বইয়ের লেখক।

'জীবনস্মৃতি যেখানে শেষ হয়েছে, 'ছেলেবেলা' শেষ হয়েছে তার আগেই। সেইটিই স্বাভাবিক। 'কড়ি ও কোমল' বইটি প্রকাশের প্রসঙ্গ দিয়েই শেষ হয়েছে 'জীবনস্মৃতি,' অর্থাৎ ১৮৮৬ সালে এসেই কবি তাঁর জীবন গড়ার ছবি আঁকা শেষ করলেন, কারণ এর পরে তাঁর জীবনের অনেকটাই প্রকাশ্যে চলে এল। তার ব্যাখ্যায় তিনি গেলেন না, কেবল তাঁর ভিত্তি রচনার আনন্দটুকু পরিবেশন করেই থামলেন তিনি। এই গ্রন্থের সূত্র ধরে কবির বাকি জীবনের সৃষ্টি-কর্মকে চেনা যায় কিনা, বোঝা যায় কিনা, তা সন্ধানের দায়িত্ব বর্তালো পাঠকদের উপরে।

'ছেলেবেলা' শেষ হয়েছে তাঁর প্রথম বিলেতযাত্রার ঘটনায় তখন তাঁর বয়স আঠারো, আজকের দিনে যখন ভোটাধিকার পাওয়া যায়। অর্থাৎ ছেলেবেলার সময় সারা হল। এখন থেকে সারা জীবন এই ছেলেবেলার কথা তাঁর মনে পড়বে, জীবন সারা হবার সময়ে এই সময়ের জন্য ব্যাকুলতা বেড়ে উঠবে তাঁর, তবু এই বেলাটুকু আর ফিরবে না। জীবনের শেষ সময়ে লেখা এই প্রথম জীবনের কথার মধ্যে কিন্তু সেজন্য কোনো বিষণ্ণতা লাগেনি, সেই ভালো লাগাকে পরিণত বয়সের বোধ দিয়ে বিকশিত করে তুলেছেন। 'ছেলেবেলা' শুধু কবির নয়, বিশ্বের সব শিশুর হয়ে লেখা এই বইতে একটি মুক্ততার সঙ্গে বড় হওয়ার ইতিহাস বিবৃত। এ বইতে লেখকের যে মানসিকতার পরিচয় আছে, তার সবটা হয়তো ছোটদের পক্ষে সর্বত্র প্রযোজ্য নয়, কারণ এতে বিশ্ব কবির পরিণতির ছাপ সর্বত্র। শুধুমাত্র কথকতার কৃতিত্বে এটি অপূর্ব সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। শিশুর মনে যে বিশ্বাস অবিশ্বাসের ভেদরেখা বিলুপ্ত হয়ে যায়, সেটি এই বই পড়েই আমরা পরম তৃপ্তিতে অনুধাবন করি। শিশুটির বড়ো হওয়ার তাগিদে মানসিক বিবর্তনের চলচ্চিত্রটি দেখতে পাই। যখন লিখেছেন—

> ...আমার জীবনে বাইরের খোলা ছাদ ছিল প্রধান ছুটির দেশ। ... ঐ ছাদের উপরে যাওয়া লোক-বসতির পিলপেগোড়ি পেরিয়ে যাওয়া। ওখানে গেলে কলকাতার মাথার উপর দিয়ে পা ফেলে ফেলে মন চলে যায়—যেখানে আকাশের নীল মিশে গেছে পৃথিবীর শেষ সবুজে।...আমি লুকিয়ে ছাদে উঠতুম দুপুর বেলায়।...

তখন 'ডাকঘরে'র অমলের কথা মনে পড়ে যায়—

> আমাদের জানলার কাছে বসে সেই যে দূরে পাহাড় দেখা যায়—আমার ভারি ইচ্ছে করে ওই পাহাড়টা পার হয়ে চলে যাই.. আমার ঠিক বোধহয় পৃথিবীটা... নীল আকাশে হাত তুলে ডাকছে। .. যারা ঘরের মধ্যে বসে থাকে তারাও দুপুরবেলা একলা জানলার ধারে বসে ওই ডাক শুনতে পায়।

এবং বুঝতে পারি অমলের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের আত্মকথন রয়ে গেছে। 'ছেলেবেলা'র ভিতরে কবি তাঁর কৈশোরের বান্ধবীর কথা বলেছেন পরম মমতায়। আশি বছর বয়সে সেকথা মনে করতে বসে হয়তো আর্দ্র হয়ে উঠেছিলেন, তাই সেদিনের স্মৃতিচারণে ভালো লাগাটুকুকেই ধরে দিয়েছেন।

> ...জীবনযাত্রার মাঝে মাঝে জগতের অচেনা মহল থেকে আসে আপন মানুষের দূতী.. চলে যেতে যেতে ... বরাবরের মতো দিনরাত্রির দাম দিয়ে যায় বাড়িয়ে।

'ছেলেবেলা'র মূল চাবিকাঠি হল এর ভাষা। এত সহজ, অথচ এত আশ্চর্য। মনে হবে কোনো চেষ্টাই করা হয়নি লিখতে। লক্ষ করলে ধরা পড়বে যে ঐ চেষ্টাহীনতা আসলে কবির সুদীর্ঘ জীবনের নিরলস প্রচেষ্টার ফল। এবিষয়ে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন—

> ...ছেলেবেলা নায়কবিহীন যুগচিত্র ....আপনার অন্যান্য রচনার তুলনায় ছেলেবেলার ভাষাও অগভীর: রাবীন্দ্রিক উপমা বিলাস তাতে প্রায় নেই; বাক্যবন্ধের যে সমস্ত মোচড়ে আপনি আজকাল আমাদের মনে অনিবচনীয় ভাবের ঝংকার জাগান তাও এখানে একরকম অনুপস্থিত। ...আপনার শ্রেষ্ঠ গদ্যের মধ্যেও ছেলেবেলার তুলনা নেই। ... এ গদ্যকে অগভীর বলেছি, কারণ এটা একেবারে গদ্য, এতে পদ্যোচিত অলঙ্কারের লেশমাত্র নেই, মুখের কথা এ গদ্যের আদর্শমাত্র নয়, তাই এর প্রাণ... ফলত এ গদ্য পড়ে ধিক্কারবোধও অনিবার্য: এর পরে লিখে কি হবে?

ওইটাই সেই জাদু—'মুখের কথা'ই হল এ বইয়ের প্রাণধর্ম, সেজন্য এর পরে আর কোন কথা থাকে না—সেজন্যই সুধীন্দ্রনাথের মত কবি, যিনি দুরূহ শব্দসম্ভারের আয়োজনে ব্যাপৃত থাকতেন, তিনিও এই 'অগভীর' ভাষার কাছে নতজানু হলেন, 'ধিক্কারবোধ' করলেন, ভাবলেন, 'লিখে কি হবে? 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে বাংলা কথাভাষার সীমাহীন সম্ভাবনা উন্মোচিত হয়েছে—বাক্যরচনার ক্ষেত্রে অনেক সময়েই যোজক বা বিয়োজকের প্রয়োজন হয়নি, অনুচ্ছেদ বিভাগে বিশেষ সঙ্গতি রক্ষা জরুরি মনে করা হয়নি, প্রতিদিনের অনবরত ব্যবহারে মলিন শব্দগুলো দিয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটাতে কোন বাধা ঘটেনি। কবির একার সাধনায় মাতৃভাষা এতটাই উন্নত যে এখন আর বিশেষ কোন বক্তব্যের দরকার হয় না—সুধীন্দ্রনাথ এইরকমই ভেবেছেন।

তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে জীবনটা যেভাবে প্রকাশ হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ সেকথা বলেছেন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লেখা কয়েকটি প্রবন্ধে, যেগুলি সংকলিত করেই 'আত্মপরিচয়' বইটি বেরিয়েছিল। এ বই কবি আলাদা করে ভেবেছিলেন এমন বলা যায় না, অবশ্য এ বই তাঁরই লেখা। নিজের কাব্যজীবন আলোচনা করেছেন, কিন্তু লোকমতের দ্বারা বিচলিত না হয়ে নিজে স্থির থেকেছেন। উপেক্ষা করেননি, আবার উৎসুকও হননি। কারণ তাঁর জীবন নিজে নিজেই গড়ে উঠছিল। জীবনের কথা না বলে, জীবনের প্রত্যয়ের বিশ্লেষণ করেছেন। অনেক সময়েই তাঁকে নানাভাবে আঘাত পেতে হয়েছে। অশোভনতা তাঁকে পীড়িত করেছে, তবু দুর্বল করেনি। কারণ তিনি নিজের ভিতরেই নিজের শক্তিকে চিনে নিতে পারছিলেন।

এ বইয়ের প্রথম প্রবন্ধে তিনি নিজের কাব্যের সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে দেখতে চেয়েছেন। এ বস্তু তখন নতুন। কেউ সেকথা তখন বুঝতে পারেনি। মানুষ তার নিজের ক্ষেত্রে অনেকসময়েই হয়তো অনুভব করে থাকে যে কোন পৃথক চেতনা তার সত্তাকে কোনো কর্মে উদ্বুদ্ধ করেছে। সেই কথাই কবি এই প্রবন্ধে বললেন। তাঁর সেই উপলব্ধি অনেকে মেলাতেও পারলেন না, কবির অহংকার বলে ভুল করলেন।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে বলেছেন ব্যক্তি এবং স্রষ্টার সম্পর্ক, সংঘর্ষ সম্বন্ধে। স্রষ্টার সম্মান যেন ব্যক্তির অহংবোধকে উস্কে না দেয়, এইটির ছিল তাঁর প্রার্থনা।

কবির ধর্মমত কি—এই প্রশ্নের আলোচনা আছে তৃতীয় প্রবন্ধে। দুঃখের নিবৃত্তিতে নয়, দুঃখের চরিতার্থতাতেই আনন্দ, এই ছিল কবির জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর। এই প্রবন্ধ থেকেই কবির ভাষা সাধু থেকে চলতি হয়ে গিয়েছে। আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে প্রকাশভঙ্গী।

চতুর্থ প্রবন্ধে কবি তাঁর জীবনসাধনার শেষ কথাটি

বলেছেন। যত রকম ভূমিকাতেই তিনি কাজ করে থাকুন না কেন—আসলে তিনি কবি। একসময়ে বড়ো দায়িত্ব নিয়েই মাস্টারি করেছেন, তবু তিনি তা নন—তিনি শুধু কবি, মাস্টারির মধ্যেও তিনি বালক-বালিকার লীলাসহচরই হয়েছেন। এর চেয়ে বড়ো কিছু নন তিনি, হতেও চাননি—'আমি সকলের বন্ধু, আমি কবি।'

পঞ্চম প্রবন্ধে আছে কলকাতার কথা, তাঁর বাড়ির কথা। এই বর্ণনার মধ্যে 'জীবনস্মৃতি' এবং 'ছেলেবেলা'র ছায়া পড়েছে বটে, কিন্তু সেই ছায়ার ঘেরাটাকে ছাড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে তাঁর জীবনের অনুসন্ধান। বিদ্যুতির মধ্যেও তাঁর 'অপূর্ণ জীবনের অসমাপ্ত সাধনা'র ইঙ্গিত দিয়েছেন এই প্রবন্ধে। জীবনে 'প্রীতিরই প্রয়োজন' একথাই বলেছেন; বলেছেন, 'মর্তলোকের শ্রেষ্ঠ দান এই প্রীতি আমি পেয়েছি, বলেছেন 'প্রণামের সঙ্গে'।

ষষ্ঠ প্রবন্ধে কবি তাঁর জীবনভোগের আনন্দের কথা বলেছেন। বিশ্ববন্দিত মনীষী বলেননি যে তাঁর কখনও অহংকার হয়নি, কিন্তু তাকে অতিক্রম করেই জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন তিনি।

'জীবনস্মৃতি' 'ছেলেবেলা', 'আত্মপরিচয়' — একই কবির আত্মকথনের ত্রিবেণী ধারা। নিজেকে যিনি সারাজীবন ধরে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, দেখতে চেয়েছেন নানাভাবে, অনুভব করেছেন নানাভঙ্গিতে—তিনি যে নিজের কথাও বিভিন্নভাবে বলতে চাইবেন এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। বরং লাভ আছে। যিনি নিজের জীবন দিয়ে বাঁচাবার আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন তাঁর পরিচয়ের দৃষ্টিকোণগুলোও আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হলে তৃপ্তি আমাদেরই।

কবির জীবনকথার মধ্যে কোন না কোনভাবে আমাদের সকলেরই ছেলেবেলা, সকলেরই স্মৃতিগম্য সময় কখনো ধরা পড়ে যায়। নিজেদের যদি আমরা এর মধ্যে খুঁজে পাবার ক্ষমতা অর্জন করি তবে সেটাও আমাদের শক্তিসঞ্চয় হতে পারে। আর যদি তা না-ও পারি তবে অন্তত জীবনযাপনের একটা আদর্শ দেখে উজ্জীবিত হওয়া সম্ভব। বাংলাভাষার নিয়ত বৃদ্ধি পাওয়া শক্তিকেও আমরা এ তিনটি বইয়ের মধ্যে আবিষ্কার করতে পারি। জীবনকে ভালো লাগাই যে বাঁচবার মূল রস, জীবনের সীমাবদ্ধতার মধ্যেই যে সীমাছাড়ানোর মহিমা বর্তমান, তাও আমাদের বোধগম্য হয়ে উঠে।

সহায়ক রচনা :

বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী—সোমেন্দ্রনাথ বসু।
ঋড়দহে রবীন্দ্রনাথ—তাপস মুখোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি :

ডঃ পিনাকী ভাদুড়ীর জন্ম ১৯৩৫ সালে। তিনি ইংরেজির এম. এ. এবং বাঙলার পি. এইচ. ডি.। লেখকের প্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থের নাম, "উত্তরসূরীদের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ"। রবীন্দ্র গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্গে জড়িত শ্রী ভাদুড়ীর কবিতা, রম্যরচনা এবং অনুবাদ বিষয়ক আরও কিছু গ্রন্থ আছে।

পশ্চিম বাঙলার উদ্বাস্তু ইতিবৃত্ত

জ্যোতির্ময় বসু

পূর্ব বাংলা থেকে প্রথম উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবাঙলায় আসেন স্বাধীনতার আগে ছেচল্লিশে নোয়াখালির দাঙ্গার পরে। তার পরে কয়েক দশক ধরে অবিশ্রান্ত শরণার্থী স্রোত, শিয়ালদা স্টেশন, রিলিফ ক্যাম্প, অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট আর তার মধ্যে মানুষ যে কেমন করে আর কি ভাবে বেঁচে থাকতে পারে তার প্রত্যক্ষদর্শী, বিশেষ করে যাঁদের বয়স ষাটের কোঠায়, এমন লোক পশ্চিম বাঙলায় এখনও অসংখ্য। আর উদ্বাস্তু ? ১৯৭৭ সালেও সরকারি সমীক্ষা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে প্রতি ছ-জনে একজন উদ্বাস্তু, যাঁদের পুনর্বাসন একান্ত প্রয়োজনীয়। সে বছর পশ্চিমবঙ্গ সরকার শেষ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা রচনা ও তার জন্য কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে পাঁচশো কোটি টাকা দাবি করেন। পরিকল্পনা, অর্থ দাবি পূর্বেও হয়েছিল। ত্রাণ পুনর্বাসনের জন্য মধ্যে মধ্যে সামান্য হলেও কিছু সাহায্য পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবাংলায় উদ্বাস্তুদের সার্থক পুনর্বাসন বলতে যে বিশেষ কিছু হয় নি একথা সকলেই জানেন। বাংলাদেশ থেকে এখনও যাঁরা আসছেন, যাঁদের বলা হয় অনুপ্রবেশকারী, তাঁদের মধ্যে প্রকৃত শরণার্থী কেউ নন তাও কি নিশ্চয় করে বলা যায়? প্রকৃতপক্ষে উদ্বাস্তু সমস্যা আমরা পাঁচ দশকেও সমাধান করতে পারি নি। তা আজও বিদ্যমান। এ সত্ত্বেও এখন মনে হয় সমস্ত বিষয়টিই যেন বাঙালীর স্মৃতি থেকে মুছে গিয়েছে। সম্পর্কিত রচনা, তথ্য সংকলন বা গবেষণাপত্র এত দিনে যা প্রকাশিত হয়েছে তাও সংখ্যায় নগণ্য। আমাদের এই বিস্মৃতি কি চেষ্টাকৃত? অক্ষমতা বোধ পীড়াদায়ক। মানবিকতাবোধের অহঙ্কার ক্ষুণ্ন হলে অস্বস্তি। এ-কথা সত্য পাঞ্জাবেও কেউ মনে রাখে নি সর্বস্ব হারিয়ে কে কবে কোন শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় পেয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে কারণ বোধ হয় সফলতাবোধ। কয়েক বছরের ব্যবধানে তাঁরাই তো ভারতের সফলতম জনগোষ্ঠীগুলির অন্যতম। উদ্বাস্তু প্রসঙ্গে পাঞ্জাবের কথা এসেই যায়। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ভারতের দুই অংশে দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পার্থক্য, সাহায্য এবং বিনিয়োগের পরিমাণ ও নিবিড়তার বৈষম্য ভোলা শক্ত। আবার স্মরণ না করে উপায় নেই এতবড় শরণার্থী সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে পাঞ্জাব পৃথিবীর ইতিহাসে একটি উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। কল্পনা করতে ইচ্ছা হয় পশ্চিমবাঙলায় কি ঘটতে পারত। এখানে 'The Marginal Men' থেকে গ্রন্থকারের কথা কিছু উদ্ধৃত করা যাক। "...Sir Jadunath (Sarkar) wanted the people of West Bengal to 'engraft this rich racial branch upon its old decaying trunk and rise to a new era of prosperity and power'. But he was not heeded. They got 'alarmed about losing your personal gains, about sharing what you have gained by political jobbery'. They refused to admit this infusion of new blood. They felt that the energetic 'Bangals' would leave them far behind in every sphere of life and would make life difficult for their children. The mind of the people of West Bengal moved in the grooves of placid pre-partition life and their leaders could not visualise the overriding importance of the imponderables introduced into the West Bengal scene by partition. The cascading events unnerved them and their reaction was snail-like non-recognition of the new reality. They withdrew into the shell of

---

The Marginal Men by Prafulla K. Chakraboti, Lumiere Books 1990, 499 pages, Rs.255

the old society hoping that the whole thing was a bad dream and that it would pass. The reaction was entirely negative. They did not realise that what looked like an intolerable burden was in reality an asset gifted to them by an uncivilised Islamic state which hoped to profit by the expulsion, bag and baggage, of the most creative section of its citizens..... The people of West Bengal could have appropriated to itself these dispossessed millions and together they could have set out on a new adventure of ideas and creative action: a joint movement of the refugees and the people of West Bengal against the Centre for making good its pre-partition promises and for a planned programme of economic rehabilitation of as many refugees as West Bengal could contain through a vast programme of land reclamation and the construction of a network of industrialised and self sufficient townships by a Central Government agency, could have transformed the rural back water of West Bengal into an industrialised modern state like Punjab..... East Punjab stood solidly behind the refugees from West Pakistan and together they forced the Centre to harness the resources of the whole of India for the economic rehabilitation of the refugees and create in the process a new Punjab where the dividing line between the refugees and the non-refugees had been completely obliterated."

শ্রী প্রফুল্ল চক্রবর্তী রচিত The Marginal Men বইটি প্রকাশিত হয়েছে পশ্চিম বাংলায় প্রথম শরণার্থীরা আসার চুয়াল্লিশ বছর পরে। বিষয় বাঙালি উদ্বাস্তু। স্বাধীনতা-উত্তর বিশ বছরে পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক পট বিবর্তনের চিত্রও উপস্থাপিত। উদ্বাস্তু সম্পর্কিত সম্ভবপর সমস্ত তথ্য (প্রফুল্ল চক্রবর্তীর দশ বছর পরিশ্রমের ফল), ঘটনাপ্রবাহের বিবরণ ও বিশ্লেষণ, সব মিলিয়ে বইটি অসাধারণ। তুলনীয় আর কিছু এ পর্যন্ত ইংরেজি বা বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। বিষয়গুণ ছাড়া আরও একটি কারণে এই সুবৃহৎ বইটিতে পাঠকের আকর্ষণ ও মনোযোগ শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকে তা গ্রন্থকারের জীবন্ত বর্ণনা ভঙ্গী ও স্বচ্ছন্দ ভাষা। যদিও তা কিছুটা আবেগধর্মী, সামান্য উচ্চগ্রামে বাঁধা। ইতিপূর্বে দেওয়া উদ্ধৃতি থেকে তার আভাস পাওয়া যাবে। মুখবন্ধে প্রফুল্ল চক্রবর্তী বলেছেন তিনি নিজে শরণার্থী ছিলেন এবং শরণার্থীদের সব রকম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাঁকে একদিন যেতে হয়েছে। লিখতে বসে পুরোপুরি নৈর্ব্যক্তিকতা রক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

বই এর আরম্ভে উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবাঙলায় আসা, পূর্ব বাংলার (পূর্ব পাকিস্তান) অবস্থা ও কারণ ঘটনাবলী, আশ্রয়ের সন্ধানে শরণার্থী, শিয়ালদা স্টেশন, রিলিফ ক্যাম্প, উদ্বাস্তু প্রশ্নে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মনোভাব, তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সরকারী ত্রাণ উদ্যোগ, ক্যাম্প উদ্বাস্তুদের আন্দোলন ইত্যাদি বর্ণিত। তার পরে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি, যার সূত্রপাত জবরদখল উদ্বাস্তু কলোনির জন্ম। সরকারি সাহায্যে পুনর্বাসন হবে এই আশা ভঙ্গ হতে শরণার্থীদের বেশি সময় লাগে নি। তাঁদের এক বৃহৎ অংশই স্বনির্ভরতার জোরে বেঁচে থাকা যায় এমন কোন রাস্তা প্রাণপণে খুঁজছিলেন। অবশ্যই প্রথম লক্ষ্য ছিল মাথা গোঁজার জায়গা এবং সেই সঙ্গে প্রাণধারণের জন্য জীবিকা। ফলে ১৯৪৯ সালে শুরু হয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে কলকাতার উপকণ্ঠে জবরদখল কলোনিগুলির দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে (কয়েক বছরে তা প্রায় এক হাজার)। এর পূর্বে কয়েকটি রিলিফ ক্যাম্পের কথা বাদ দিলে শরণার্থীদের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান বলে কিছু ছিল না। তাঁদের গোষ্ঠীগত জীবনেরও শুরু এই জবরদখল কলোনিগুলিতে। এখান থেকে উচ্ছেদ

ও দ্বিতীয়বার বাস্তুচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা (পশ্চিমবঙ্গের উচ্ছেদ আইন) তাঁদের সংঘবদ্ধ আন্দোলন ও সংগ্রামের পথে চালিত করে। উদ্বাস্তু সংগঠনের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, স্বল্পকালের মধ্যে United Central Refugee Council (UCRC)-র অবিসম্বাদী নেতৃত্ব, বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির বিশেষত কমিউনিস্ট পার্টির (পরে CPIM সঙ্গে তাদের ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা, কলোনি উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলন, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ, খাদ্য আন্দোলন ইত্যাদি বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনে এবং নির্বাচন যুদ্ধে উদ্বাস্তু সংগঠনগুলির ভূমিকা — এগুলির বিস্তৃত ইতিহাস,অনেকটা ধারাভাষ্যের ভঙ্গিতে 'The Marginal Men' এ বিবৃত। এবং তার সঙ্গে মিলিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির, বিশেষত কম্যুনিস্ট পার্টির, সমস্যাবলী ও আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, নীতির বিবর্তন, কর্মপন্থা ও দলীয় নেতৃত্ব আর উদ্বাস্তু সংগঠনের দূরত্বের ক্রমসংকোচনের চিত্র। সূত্র অনুসরণ করে প্রফুল্ল চক্রবর্তী যে প্রধান সিদ্ধান্তগুলিতে পৌঁছেছেন মোটামুটি ভাবে তা — (১) দেশ ভাগের পর লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু মানুষের অসহায় ও অনিশ্চিত অবস্থিতি পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে একটি সম্পূর্ণ নতুন মাত্রা আনে যদিও তার সমাক গুরুত্ব বুঝতে রাজনৈতিক দলগুলির কিছু সময় লেগেছিল। (২) United Central Refugee Council (UCRC)-র নেতৃত্ব পশ্চিম বাংলায় রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি নতুন এবং অবশ্যই সার্থক technique এর পথিকৃত যাকে বলা হয়েছে "the mass line of Liu Shaoqui for the total mobilisation of the refugees"। (৩) বামপন্থী মার্ক্সবাদী দলগুলি, মুখ্যত কম্যুনিস্ট পার্টি (পরে CPIM) তাঁদের রাজনৈতিক কর্মকৌশল ও কর্মীদের অসাধারণ পরিশ্রম ও দক্ষতার গুণে UCRC-র পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অর্জন করেন এবং ফলত উদ্বাস্তুদের তাঁদের সক্রিয় সহযোগীতে পরিণত করেন। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে তাঁদের অভাবনীয় শক্তিবৃদ্ধি ও অনতিবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গের শাসন ক্ষমতায় আসার এটি একটি প্রধান কারণ। বইয়ের এটি মুখ্য বিষয় বা থিসিস গ্রন্থকার নিজেই তা বলেছেন। আর একটি বিষয়ও আছে — কলোনি এবং রেল লাইন খোলা রাস্তার ধারে ধারে গজিয়ে ওঠা অসংখ্য উদ্বাস্তু অধ্যুষিত ঝুপড়ি বস্তিতে যাদের জন্ম, এই নতুন প্রজন্ম, ষাটের ও সত্তরের দশকে যারা কিশোর বা তরুণ কিন্তু যাদের বর্তমান নেই ভবিষ্যত নেই, যারা "Uninhibited by the values and moves of a settled society and responding to the inner urges and compulsions of an animal nature", বই-এ যাদের নাম দেওয়া হয়েছে The marginal Men । 'হিংসাশ্রয়ী রাজনীতি, রাজনৈতিক দলের মস্তান নির্ভরতা, সর্বব্যাপী হিংসার আধিপত্য — এ সবের উৎসমূলে প্রফুল্ল চক্রবর্তীর দৃষ্টিতে এরাই।

পঞ্চাশের শুরুতে, উচ্ছেদের আশঙ্কা যখন প্রায় বাস্তব, কলোনি উদ্বাস্তুদের দ্রুত সংগঠিত হয়ে ওঠা যেমন অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল তেমনই অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল কোন শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের নির্ভরযোগ্য সাহায্য। স্বার্থবদ্ধ গোষ্ঠী, যেমন ট্রেড ইউনিয়নের আর রাজনৈতিক দলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং এক ধরনের symbiosis স্বাভাবিক ঘটনাই বলা যায়। আভ্যন্তরীণ স্বার্থদ্বন্দ্বের কারণে, যার ইঙ্গিত প্রফুল্ল চক্রবর্তীর বইটিতে আছে, তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের পক্ষে কলোনি উদ্বাস্তুদের সেই সমর্থন দেওয়া সম্ভব ছিল না। শূন্যতা দ্বিতীয় শক্তি অর্থাৎ বামপন্থী দলগুলির দ্বারাই পূরণ হবে তা অপ্রত্যাশিত নয়। পরিণতি মার্ক্সবাদীদের শক্তিবৃদ্ধি অবশ্যই, কিন্তু তার গভীরতা ও বিস্তৃতির মূল্যায়নের জন্য আরো ব্যাপক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের অবকাশ ছিল মনে হয়। কারণ প্রফুল্ল চক্রবর্তীর থিসিসটির মধ্যে একটি আপেক্ষিক গুরুত্বপূর্ণতার প্রশ্ন প্রচ্ছন্ন। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে পশ্চিমবঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টির (অন্যান্য মার্ক্সবাদী দলেরও) সংগঠনশক্তি সামান্যই ছিল। পঞ্চাশের দশকে উদ্বাস্তু সংগঠনগুলির মধ্য দিয়ে কম্যুনিস্ট পার্টি প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করে এবং কলকাতার উপকণ্ঠ জুড়ে বিস্তৃত অঞ্চলে একটি শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য ভিত্তি স্থাপন করতে সমর্থ হয়। পরিষদীয় নির্বাচনে তার প্রতিফলন ঘটে। অনস্বীকার্য, কিন্তু তার পরে, যে প্রশ্নের আলোচনা হতে পারত, এই প্রক্রিয়া কত দিন ধরে আর কত গভীরতায় প্রবহমান থাকে? ষাটের দশকে (বা তার

কিছু আগে থেকেই) উদ্বাস্তু আন্দোলন স্তিমিত। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনগুলির তীব্রতা ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। ৬৭ সালের নির্বাচনের আগে পর্যন্ত, মূল্যবৃদ্ধি, অসন্তোষ, ৬৬ সালের খাদ্য সংকট, দেশব্যাপী খাদ্য আন্দোলন ও তাতে বামপন্থীদের সহযোগীরূপে উদ্বাস্তুদের অংশগ্রহণ, কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব, বাংলা কংগ্রেসের আবির্ভাব ইত্যাদি ঘটনাবলী 'The Marginal Men'-এ বিবৃত। কিন্তু সেখানে মার্ক্সবাদীদের শক্তিবৃদ্ধির (এবং পরিষদীয় শক্তিবৃদ্ধির) একাধিক রাজনৈতিক কারণগুলির মধ্যে উদ্বাস্তুশক্তির আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ের নির্দেশনা প্রকট নয়। ৫২ এবং ৫৭-র নির্বাচনে কম্যুনিস্ট পার্টির (এবং বামপন্থী মার্ক্সবাদী দলগুলির) সদস্য সংখ্যা বাড়ে যদিও অংকের হিসাবে তা খুব একটা বড় সংখ্যা হয়ে ওঠে নি। অনেকে উদ্বাস্তু অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু ৬২-তে মোট নির্বাচিতের সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পেল না। নির্বাচন যুদ্ধে উদ্বাস্তু শক্তির প্রয়োগ কি ৫৭ তে নিঃশেষিত? কলকাতা ও উপকণ্ঠের কলোনিগুলি ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র আরও অনেক উদ্বাস্তু ছড়িয়ে ছিলেন। বিভিন্ন নির্বাচনে সেই সব কেন্দ্রগুলিতেই বা কি ঘটছিল? আর উদ্বাস্তু সম্পর্কশূন্য অঞ্চলগুলিতে? নির্বাচন বিজ্ঞান ভিত্তিক বিশ্লেষণগুলি হয়ত প্রফুল্ল চক্রবর্তীর রচনাটিকে সমৃদ্ধতর করত।

বই এর যারা নায়ক সেই উদ্বাস্তুদের, বিশেষত কলোনি উদ্বাস্তুদের গোষ্ঠী চরিত্র বিশ্লেষণের প্রশ্নটিও প্রাসঙ্গিক। কলোনি উদ্বাস্তুদের অধিকাংশ, নেতৃত্ব স্তরের অধিকাংশ তো নিশ্চয়ই, এসেছিলেন পূর্ববাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে। স্বাধীনতা পূর্বকালের রাজনীতি এঁদের সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল না। তৎকালীন পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলির প্রভাবে অথবা পরম্পরাগত কারণে অনেকে কম্যুনিস্ট বিরোধীও ছিলেন। প্রকৃত অর্থে নিঃসম্বল এঁরা ছিলেন না। জবরদখল করা জমির ন্যায্য দাম দিতে এঁরা প্রস্তুত ছিলেন। দখল করা জমির উন্নতি সাধন, যথাসম্ভব পরিকল্পিত রূপে বাসস্থান ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত গঠনকর্মগুলির সম্পাদন, যার ব্যয়ভার এঁরা নিজেরা বহন করেছেন ও পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে আদর্শ স্থাপন এ সকল বিষয়ে এই উদ্বাস্তুদের কুশলতার কিছু পরিচয়ও আমরা প্রফুল্ল চক্রবর্তীর লেখা থেকে পাই। পঞ্চাশের দশক ধরে কম্যুনিস্ট পার্টির দৃঢ় ভিত্তি ও সংগ্রামের হাতিয়ার রূপে এঁদের ক্রম পরিণতি (মতাদর্শ কত গভীরে পৌঁছেছিল?) এবং এই প্রক্রিয়ায় পারস্পরিক প্রভাব নিঃসন্দেহে বিশেষ উপজীব্য। বিষয়টি 'The Marginal Men' এ উত্থাপিত এবং নানাস্থানে স্বল্পাধিক আলোচিত। মানস বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করতে গিয়ে প্রফুল্ল চক্রবর্তী উদ্বাস্তু মানস (Refugee Mind) ধারণাটির (concept) অবতারণা করেছেন (তিনি কম্যুনিস্ট পার্টির refugee-isation এর কথাও বলেছেন)। সন্দেহ নেই এটি বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে যদিও উদ্বাস্তুদের রাজনৈতিক ক্রিয়া আচরণ ব্যাখ্যা করার জন্য ধারণাটির অপরিহার্যতা সম্পর্কে ভিন্ন মত সম্ভব। অপর পক্ষে উদ্বাস্তু মানসের লক্ষণগুলি (attributes) যথা 'trauma of uprooting', 'ineffaceable nostalgia for a paradise lost', 'millenarianism', 'sense of not belonging' 'emotionally unstable', 'anti establishment' ইত্যাদির গুরুত্ব ও স্থায়িত্ব স্বীকার করে নিলে সেই আলোকে উদ্বাস্তুদের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি প্রথম থেকে, ৬৭ সালের পরেও, অধুনা কাল পর্যন্ত আলোচিত ও বিশ্লেষিত হলে পাঠকের তৃপ্তি সাধন হত।

সমকালীন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি ও সমাজজীবনে হিংসার অনুপ্রবেশ ও তার সূত্রপাতে দ্বিতীয় প্রজন্ম উদ্বাস্তু তরুণের ভূমিকা 'The Marginal Men' এ স্থান পেয়েছে। প্রফুল্ল চক্রবর্তীর পর্যবেক্ষণের যথার্থতা মেনে নিয়েও প্রশ্ন থেকে যায় উৎস কি উদ্বাস্তু বস্তি? না কি আরও আগে? ছেচল্লিশের দাঙ্গা? তারও আগে পঁয়তাল্লিশ ছাত্র বিক্ষোভ? উৎস কি একাধিক নয়? এই পশ্চিমবঙ্গেই উদ্বাস্তু সম্পর্কশূন্য অঞ্চলেও কি হিংসাশ্রিত রাজনীতির উদ্ভব প্রত্যক্ষ করা যায় নি? ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে? বস্তুত বিষয়টি অনেক ব্যাপক, একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা গ্রন্থের বিষয় হওয়ার যোগ্য। বর্তমান গ্রন্থের সীমিত পরিসরে তার সম্পূর্ণ আলোচনা প্রত্যাশিতও নয়।

প্রফুল্ল চক্রবর্তীর বইটিকে যদি রাজনৈতিক ইতিহাস রূপে দেখি তা হলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকতা ও উপস্থাপনার অভিনবত্ব স্বীকার করে নিয়েও মনে হয়

তাঁর মূল থিসিসটি পাঠক মনে আংশিক অসম্পূর্ণতার বোধ আনবে। তবুও স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাসের যাঁরা ছাত্র গবেষক তাঁদের কাছে এই পথিকৃৎ রচনাটি provocation এমনকি inspirationও হতে পারে। আশা রাখি ভবিষ্যতে বিষয়টির উপরে আরো পূর্ণাঙ্গ রচনা আমাদের সামনে উপস্থিত হবে। তুলনায়, উদ্বাস্তু ইতিবৃত্ত হিসাবে বইটি অনেক সম্পূর্ণ ও সার্থক। দশম পরিচ্ছেদটির বিশেষ উল্লেখ করতে হয়। এই সুদীর্ঘ অধ্যায়ে (১২০ পৃষ্ঠা ব্যাপী) চার দশক ধরে সরকারি-উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন যা কিছু হয়েছে তার পূর্ণ বিবরণ ও পরিসংখ্যান (যা এখন দুষ্প্রাপ্য) সন্নিবিষ্ট। পাঞ্জাবের পুনর্বাসন সংক্রান্ত তথ্যাদিও এখানে পাই। এই বইটি প্রধানত পশ্চিম বাঙলার উদ্বাস্তুদের নিয়ে। এর দ্বিতীয় খণ্ড The Wanderers, যার বিষয় বাংলার বাইরে বাঙালি উদ্বাস্তু, প্রকাশিত হবে। শেষ করার আগে গণেশ হালুই কৃত অপূর্ব প্রচ্ছদ চিত্রটিরও উল্লেখ না করলেই নয়। মোটা দাগে টানা স্কেচটি মুহূর্ত মধ্যেই বিস্মৃতির আবরণ ছিন্ন করে। আর, কেন জানি না, মনে পড়ে যায় জয়নাল আবেদীনের তেতাল্লিশের রেখাচিত্রগুলির কথা।

স্বপ্নের দিনগুলো

গৌতম ভদ্র

১৩৮৮ সনের শারদীয় 'এক্ষণ'-এ অপ্রকাশিত ডায়েরিটা ছাপা হবার সঙ্গেই নজর কেড়েছিল। ইংরাজিতেও অনুবাদ বেরিয়ে গেছে। আছে দারুণ সব স্কেচ। তেভাগা কৃষক আন্দোলনের প্রথম পর্বের প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য হিসাবে ভারি ভারি প্রবন্ধের পাদটীকায় লেখাটি এর মধ্যেই জায়গা পেয়েছে। আছে নানা খবর, বিশ্লেষণের জন্য প্রচুর রসদ। আন্দোলনে কৃষকের চেতনা কীভাবে গড়ে ওঠে, তার অনুপুঙ্খকে বিবরণে ধরা হয়েছে।

তেভাগার ডায়ারি: সুবর্ণ রেখা, ১৯৯১, মূল্য ২০ টাকা

শুধু ধানের ভাগ নয়, সুযোগ-সুবিধা নয়, বরং আধিয়াররা আন্দোলনেনূতন মর্যাদা পায়, তারা বলে, 'স্বাধীন হইছি'। ধান কাটা যেন তাদের কাছে 'উৎসব'। যাঁরা আবার অর্থনীতি খুঁজবেন, তাঁদের জন্যও মালমশলা আছে; যেমন খাদু বর্মন বা টোগরু মহম্মদের জমি হারাবার করুণ কাহিনী। আছে চৈতন্যের রূপান্তরের আভাস। জমি জোতদারের নয়, এইরকম ধারণাও দানা বাঁধছিল। লেখকের জবানিতে "এবারের তেভাগার আন্দোলনের গর্ভে লাঙল যার, জমি তার দাবির ভ্রূণ দেখা দিয়েছে।" টুকিটাকি কত কথা, জামসেদ আলি, বাবুরি বর্মনের মায়ের মতো কত চরিত্র। ছেচল্লিশের ডিসেম্বর মাসে হিন্দু-মুসলমান আধিয়ারদের সংগ্রামী ঐক্যের নানা ঘটনায় লেখক ভবিষ্যতের জন্য আশ্বাস খুঁজেছেন। ছেচল্লিশের দাঙ্গার দগ্‌দগে স্মৃতির পটে হিন্দু ও মুসলমান আধিয়ারদের একজোট হবার, লীগের হেনস্তা হবার এক টুকরো খবরও ডায়েরিতে বাদ যায় নি। তার সঙ্গে দেখা সেই লোকের, 'স্বাধীনতা' যাঁর চোখের মণি আর 'আনন্দ-বাজার'-এর উপর যিনি চটে কাঁই। এইরকম কোন বই হাতে পেলে যে কোন ইতিহাসের পাঠক হামলে পড়বেন।

কিন্তু সোমানাথ হোর তো ঐতিহাসিক নন। তাঁর লেখার মাধ্যমও রোজনামচা। একান্ত যেটাকে মনে ধরছে সেটাকেই টুকে রাখছেন। পাতায় পাতায় আঁকা স্কেচে আছে আধিয়ারদের ভাঙ্গাচোরা কুটির, হতদৈন্য অবস্থা। তারই মধ্যে বাবুরি বর্মনের মায়ের কৌচকানো মুখের অসংখ্য বলিরেখার কাঠিন্য, জামসেদ আলি ও কালাচাঁদদের চৌকো বলিষ্ঠ মুখের রেখায় ধরা পড়েছে প্রত্যয়। পার্টির নেতাদের স্নেহময়ী সোমনাথ হোর খুঁজতে গিয়েছিলেন এক স্বপ্নকে, ডায়েরির পাতায় পাতায় আছে সেই স্বপ্ন-দর্শন। রেখায় বর্ণনায় তিনি অবিরাম গতির সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। ধানকাটার ছন্দে, শোভাযাত্রার প্রস্তুতিতে, কিসানের চেহারায় তিনি গতির নানা বিন্যাসের খোঁজ করেছিলেন। স্বভাবতই তাঁর মতো সাম্যবাদীর রোজনামচা শেষ হয় রক্তিম অভিনন্দনে, গাঢ় রক্তপ্রলেপের উপমায়; সোনালি ধানখেত যেন বিন্দু বিন্দু রক্তে রাঙান। পার্টি কর্মীর প্রিয় রঙ লাল। এর মধ্যেও দেখা যায় শিল্পী সোমনাথ হোরের নিজস্বতা। ধানকাটায় লেগে

পড়া কৃষকদের সঙ্গে তুলনা টানা হয়েছে এই ভাবে: "এক আঁক খঞ্জনা পাখি সোনার বালুকার চরে লেজ নাড়িয়ে আহার্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।" ননী ভৌমিক, চিত্তপ্রসাদরা চল্লিশের দিনগুলিতে যে স্বপ্ন দেখতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন, সেই স্বপ্নকেই সোমনাথ হোর কয়েকটি মুহূর্তের জন্য বাস্তবে যেন প্রত্যক্ষ করেছিলেন ডিমলা বা গয়াবাড়িতে, দীনবয়াল বা শঙ্করুদ্দিনের মধ্যে।

কিন্তু সময় বদলায়, মানুষ বদলায়, স্মৃতির মতো চতুর খেলা খুব কম খেলোয়াড়ই খেলতে পারে। ১৯৪৬-এর ডিসেম্বরে লেখা ডায়েরি ছাপা হয় ১৩৮৮ সনের 'এক্ষণ'-এ। সেইটারই পুস্তক সংস্করণ বইটা। কিছু কিছু বদল হয়েছে, সোমনাথ হোর মহাশয় ভূমিকায় কিছু বক্তব্য জুড়ে দিয়েছেন। বইয়ের প্রথম স্কেচটাই সংযোজিত, স্কেচের উপর আঁকা রয়েছে কয়েকটি ছত্র, "কোথা সে খোলা মাঠ, উদার পথঘাট, কোথা সে ছায়া সখি কোথা সে জল।" শহরের মানুষের নস্টালজিয়া, মোহমুদ্গরের আকৃতি। ভূমিকাতে সেইদিনের ডায়েরি লেখক গ্লানি ও অপরাধবোধের কথা স্বীকার করেছেন। কারণ তিনি শহরে জীবন বেছে নিয়েছেন, দীনবয়াল ও শঙ্করুদ্দীনের মতো গ্রামবাসী লোকদের সংগ্রামের বিনিময়ে তাঁর মতো নাগরিকরা আরাম কিনেছেন। এই দূরত্ব বোধই কি ধরা পড়েছে তাঁর আঁকা প্রথম স্কেচে? অথচ ডায়েরিতে কিন্তু গ্রাম ও শহরের ভেদবোধ অনতিক্রম্য নয়। শঙ্করুদ্দীনরা লড়ছিল তাদের গ্রামস্থ শোষকদের বিরুদ্ধে, রঙবেরঙের জোতদারদের বিরুদ্ধে। গ্রামের সেই লোকেরা শহর থেকে আসা তেভাগা আন্দোলনের নেতাদের দেখতে জড়ো হয়, কিসান সংগীত বা স্থানীয় নাচে আসর জমে না বরং শহরে স্বদেশী গানই "কৃষকের স্বাভাবিক জীবনের সংস্কৃতি হয়ে গেছে।" 'কমোরেড' 'র‍্যালি' এই শব্দগুলি কৃষকরা বোঝে জানে, নিত্য ব্যবহার করে। কিন্তু সোমনাথবাবু খুঁজে চলেছেন লড়াকু কৃষকের এক অতিমানবীয় নির্ভেজাল চেহারা। মধ্যবিত্ত শহরে মানুষ যা হতে চায় কিন্তু অনেক সময়ই পারে না, সেই সব অক্ষমতার ইচ্ছাপূরণ যেন গ্রামস্থ কৃষকের সংগ্রামী চিত্রায়ণের মাধ্যমে করা হয়েছে। এই মনোভাব মধ্যবিত্তকে সংগ্রামের শরিক করে না; এমন কি লেখাতেও নূতন কোন মাত্রা যোগ করে না। ভূমিকায় বিষণ্ণ সোমনাথ হোর আশা করেন "তারা নিজেরাই একদিন নিজেদের ইতিহাস লিখবে। অন্যের প্রয়োজনে ইতিহাসের বিষয়বস্তু হবে না।" অথচ খেয়াল করেন না যে তাঁর প্রত্যাশিত ইতিহাসবিদ্ কৃষক কিন্তু সংগ্রামী দীনবয়াল ও শঙ্করুদ্দীনের চেয়ে অন্যরকম মানুষ হবে। তার লেখা ইতিহাস হবে একরকম এবং মধ্যবিত্ত শহরে সংবেদনশীল লোকের লেখা ইতিহাস হবে আরেকরকম, একটা যে আরেকটার চেয়ে বেশি সত্য বা মিথ্যে, তা বলা যাবে না; শুধু দুই ধরনের লেখার স্বাদ হবে ভিন্ন। এই দুই ধরনের লেখার টানাপোড়েনের বিন্দুগুলো কোথায়, সেই জরুরি প্রশ্নের উত্তর কিন্তু অপরাধবোধ বা খেদোক্তিতে পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে না কোন শিশুর সরল বিশ্বাসে।

তাই ভূমিকার ছেলেমানুষি যুক্তি বোঝা যায় না, কী করে আজকের পঞ্চায়েতি সাফল্য সেইদিনের তেভাগা আন্দোলনের ফল। এই আনুষ্ঠানিক ফল বাংলাদেশে দেখা দেয় নি, ধরা পড়ে নি আজকের রঙপুরে। এক যাত্রায় পৃথক ফল হল কেন? আর বোঝা যায় না কোন কারণে 'এক্ষণ'-এ প্রকাশিত ডায়েরির সঙ্গে সংযোজিত দরকারি প্রসঙ্গ নির্দেশ বইতে বাদ গেল।

দুটি উপন্যাস এবং ছটি গল্পসংকলন

কান্তি গুপ্ত

চিত্রিতা দেবী 'একটি সুন্দর মুহূর্তে' বাঙ্ময় করে তুলেছেন বৌদ্ধযুগের শ্রাবস্তী অবন্তী বৈশালীর প্রান্তর। তখন বুদ্ধদেবের পদসঞ্চারে ভারতের মৃত্তিকায় মৈত্রী ও প্রেমের স্পর্শ। ভারতের জীবনে নতুন আশার কাকলি। চিত্রিতা দেবী বৌদ্ধ সাহিত্যের সান্নিধ্যে উদ্ভাসিত করেছেন সে সব কথা। তাঁর গভীর অধ্যয়নের স্বাক্ষর তিনি রেখেছেন উপন্যাসের প্রতি ছত্রে।

নিঃসম্বল সোমদত্ত হংসাবতীর শ্রেষ্ঠ বণিক রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নগরে তাঁর বৃহৎ অট্টালিকা, মনিদীপা। স্ত্রী, পুত্র পৌত্র-পৌত্রী পরিবেষ্টিত জীবন পরিক্রমার অন্তে তিনি বেরুলেন বৈশালীর পথে বুদ্ধ দর্শনে। অতঃপর তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি বুদ্ধের স্পর্শলাভে। সোমদত্তের এই জীবন কাহিনীতে প্রধান স্থান নিয়েছে তাঁর কন্যা উত্তরার প্রবজ্যা গ্রহণের বিষয় এবং পৌত্র সুভদ্র ও দাসী মালিকার প্রেম-উপাখ্যান। কাহিনী সূত্রে এসেছে অজাতশত্রুর পিতৃহত্যার সংবাদ সেকালের কর্মান্ত (কারখানা?) পরিচালনা, শ্রমিকদের ধর্মঘট, গানের স্বরলিপি লেখার আয়োজন, ইতিহাসের তথ্য লিপিবদ্ধ করার ভাবনা, তৎকালীন চিকিৎসা ব্যবস্থা, একালের মতো স্বার্থরক্ষায় অমাত্যদের সঙ্গে শ্রেষ্ঠীদের মেলামেশা প্রভৃতি।

সমগ্র গ্রন্থে তৎকালীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের পরিচয় দানে চিত্রিতা দেবী দৃষ্টি প্রসারিত রেখেছেন। বিভিন্ন চরিত্রের নামকরণে, বিভিন্ন পেশা উল্লেখে, দৈনন্দিন ব্যবহৃত গৃহস্থালী উপকরণ ও ঘর-দোরের নামাঙ্কনে নরনারীর পরস্পর সম্বোধনে এবং পারস্পরিক সম্বন্ধের পরিচয় দানে প্রযুক্ত পালি-প্রাকৃত ভাষা বৌদ্ধযুগের পরিমণ্ডলটি পাঠকের চিত্তে উদ্ভাসিত করে তুলতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে।

উপন্যাসে বহু বিচিত্র মানুষ, বহু চিত্র, বহু ঘটনার মিছিল। এ মিছিলের যাত্রা কখনো আবশ্যকতার সচল পথে, কখনো অনাবশ্যক রুদ্ধ পথে। আবশ্যক-অনাবশ্যকতার বাছবিচারের অপেক্ষায় চিত্রিতা দেবী তাঁর অনুধ্যানী মনের মগ্নতাকে বাহত করেন নি। উপন্যাসের কাহিনীকে গতিশীল করা অপেক্ষা স্থান পেয়েছে নানা ঘটনার বর্ণচ্ছটার মুগ্ধতা। খণ্ড খণ্ড বিষয়কে উপভোগ্য করে তোলার প্রয়াস। গভীর রসসৃষ্টির সাহায্যে চিত্রিতা দেবী বিস্মৃত নিমজ্জমান অতীতকে বর্তমান-তটভূমিতে স্থাপিত করেছেন। এই শক্তির সামর্থ্যে 'একটি সুন্দর মুহূর্তে' যথার্থ সুন্দরের স্পর্শে পাঠক হৃদয়কে মুগ্ধ করে।

পিতার পদাঙ্ক পুত্র অনুসরণ করে। হয়তো তার ব্যতিক্রম রয়েছে। কিন্তু এরকম উদাহরণকেই যথার্থ বলে আমাদের মেনে নিতে *'সময়ের অপেক্ষায়' অনিন্দ্য ভট্টাচার্য* গৌরীপদের জীবন বৃত্তান্তে প্রাধান্য দিয়েছেন। পিতা তারাপদ পাহাড়ীর দু-তিন হাজার দাদন খাটছে বাইরে। গাঁয়ের লোধা ভূমিজ বৌদের সঙ্গে চলছে মহাজনী কারবার। এ ছাড়া, জমি জায়গা ধন-দৌলত খেত-খামার ইঁটের দালান রকমারী ব্যবসা। সবই ছলে-বলে কৌশলে, মানুষকে বঞ্চনা করে, অনাচার-ব্যভিচারের পথে। পুত্র গৌরীপদ প্রথম জীবনে পিতার এই সব জয়কীর্তির দিকে বিরূপ দৃষ্টিই নিক্ষেপ করত, সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা নিয়ে এম. এ. পড়ার কালে বর্তমান শাসকদলের ছাত্র-সংস্থার সঙ্গে জড়িত হয়ে পিতার অর্থস্ফীতির দিকে সুনজর দিতে পারেনি। কিন্তু এম. এ. পাশ করে গাঁয়ে এসে সে যখন পিতার অবর্তমানে সকল সম্পদের অধিকারী হল, তখন দেখা গেল, গৌরীপদ শাসকদলের সঙ্গে তার রাজনৈতিক যোগ আরও নিবিড় করে পিতৃদত্ত সম্পদকে অপেক্ষাকৃত স্ফীত করে তুলছে।

গৌরীপদের জীবন বৃত্তান্তে বর্তমান শাসকদল সম্পর্কে লেখকের প্রত্যাশা ভঙ্গের আঘাত বড়ো হয়ে উঠেছে। শাসকদলের সঙ্গে যুক্ত রাজনৈতিক কর্মীরা এখানে আপন আপন স্বার্থ রক্ষায় বিসর্জন দিয়েছে উচ্চতর আদর্শ। পূর্বের মূল্যবোধ ভ্রষ্টাচারের ধুলায় লুণ্ঠিত। গ্রাম জীবনের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনায় মাঝে-মধ্যে এসব কথা নানাভাবে উঁকিঝুঁকি দিয়েছে।

'সময়ের অপেক্ষায়' দুটি কাহিনী সমান্তরাল ধারায়

'একটি সুন্দর মুহূর্ত'—চিত্রিতা দেবী। এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩। পয়ত্রিশ টাকা

'সময়ের অপেক্ষায়'—অনিন্দ্য ভট্টাচার্য। প্রমা প্রকাশনী, ৫, ওয়েস্ট রেঞ্জ, কলিকাতা-১৭। তিরিশ টাকা।

'পান পাত মুখ'—বীরেন শামসল। লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণা কেন্দ্র, ১৮/এম ট্যামার লেন, কলিকাতা-০৯। পঁচিশ টাকা

'জার্মানের মা'—অনিল ঘড়াই। অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, ডাকবাংলো রোড, মেদিনীপুর। কুড়ি টাকা।

'হুঁদুর'—তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশনা, মেদিনীপুর। পনের টাকা

'দাবার চাল'—মিহির ভট্টাচার্য। দি থার্ড ওয়ার্ল্ড প্রেস, কলিকাতা-১৬। পঁচিশ টাকা।

'স্বদেশ কথা ও অন্যান্য গল্প'—সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলম, ৩২/বি সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলিকাতা-০৬। বারো টাকা।

'অনৈসর্গিক'—প্রশান্ত মাল। লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণা কেন্দ্র, ১৮/এম ট্যামার লেন, কলিকাতা-০৯। বারো টাকা।

অগ্রসর। একটি পল্লীর, অপরটি কলকাতার। পল্লীকাহিনীতে রয়েছে অর্থগৃধ্নু তারাপদ পাহাড়ীর অর্থ সংগ্রহে ইতরতা, বাম রাজনৈতিক কর্মীদের আদর্শহীন কর্মকাণ্ড, সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের অর্থসঙ্কট প্রভৃতি বিষয়। অঞ্চলের বুভুক্ষিত লোধা ও সাঁওতালদের দুর্ভাগ্যের বিবরণ কথা রয়েছে বিক্ষিপ্ত ভাবে। কলকাতার কাহিনী গৌরীপদ নির্ভর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গৌরীপদের বাংলায় এম. এ. পঠন, হস্টেলের জীবন, বাম ছাত্র রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং সহপাঠিনীর সঙ্গে প্রণয়লীলা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে গড়ে উঠেছে কলকাতার কাহিনী। সমকালীন সমস্যা কণ্টকিত পল্লীর জীবনকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে অনিন্দ্য যে প্রয়াস করেছেন কলকাতার কাহিনী বর্ণনায় তা অটুট থাকে নি। ছাত্রসুলভ অর্বাচীন কৌতূহল সেখানে বড়ো স্থান নিয়েছে। উপন্যাসের বৃহৎ অংশ জুড়ে এই কলকাতার কাহিনী অভিপ্রেত লক্ষ্য থেকে লেখককে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

আধুনিক বাংলা ছোটগল্পে পল্লীজীবন দুর্লভ নয়। অনেক গল্পকার মুখ ফিরিয়েছেন পল্লীর দিকে। আত্মীয়তা অর্জনে, পল্লীপথের পরিক্রমায় গল্পকারদের মধ্যে যাঁরা সচেষ্ট হয়েছেন তাঁদের মধ্যে *বীরেন শাসমল* নিজেকে সংযোজিত করেছেন তাঁর *'পান পাতার মুখ'* গল্পগ্রন্থ অবলম্বনে। মোট তেরটি গল্পে পল্লী মাটির গন্ধ ঘ্রাণ। যে 'পান পাতার মুখ' গল্প অবলম্বনে গল্পগ্রন্থের নামকরণ সেই গল্পটিতে স্থান পেয়েছে অর্থলালসায় অতি পরিচিত বধূ নির্যাতনের বিষয়। অব্যূঢ় কন্যার পাত্রস্থ না হওয়ার অতি পরিচিত যন্ত্রণার বিষয় নিয়ে গড়ে উঠেছে 'খোঁয়াড়'। উভয় গল্পে রয়েছে গ্রামের ছন্নছাড়া জীবনের ছবি অঙ্কনের সামর্থ্য। 'ভাগাড়' গল্পের পল্লীপথে ধনিক সন্তানদের হাতে ছাত্রী ধর্ষণ কাহিনী, 'পথের সরস্বতী' গল্পের দরিদ্র চাষীর সন্তানের স্কুলে পড়ার স্বপ্ন ধ্বংস হওয়ার কাহিনী পাঠক হৃদয়কে বিমূঢ় করে। 'কলকাতা ৮৯' তে কলকাতার কান্না, 'জননী'র সন্তান রক্ষায় মাতার বরাভয় মূর্তি প্রভৃতি গল্পের উপকরণ সংগ্রহে বৈচিত্র্য নেই., অভিনব হয়ে উঠেছে এমনও বলা চলে না। হিন্দু-মুসলমান সংঘাতের পটভূমিকায় রচিত 'বর্ণপরিচয়' গল্পটি লেখকের সমাজ সচেতনতার পরিচয়বাহী। বীরেন আস্বাদনের চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছেন 'বাসি খাবার ও জনৈক ভানুমণ্ডলের কাহিনী' এবং 'একজন মানুষ কয়েকটি ধেড়ে ইঁদুরের গপ্পো'—এই উভয় গল্পে। 'ভানুমণ্ডলের কাহিনীর পরিসমাপ্তিতে বীরেন তির্যক ধ্বনিতে ক্ষুধিতের চিরকালের বিপজ্জনক মূর্তি আভাসিত করেছেন। 'ধেড়ে ইঁদুরের গপ্পো'তে বঞ্চিতের আপন শক্তিতেই বঞ্চনার গর্ভ থেকে মুক্তির সংকেত রসসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

বীরেন শাসমল মানব প্রকৃতির অনিবার্য বিস্ময়কর রূপে আঁকেন নি। তিনি মানবজীবনের সুখ দুঃখের রূপকার। তবে, এই রূপ অঙ্কনে অমিতভাষ বীরেনের অনেক গল্পের ঔজ্জ্বল্য ম্লান করে দিয়েছে।

পল্লীপথে পরিভ্রমণ করেছেন অনিল ঘড়াই। এ পথে তিনি অভ্যস্ত পথিক, *'জার্মানের মা'* গ্রন্থের দশটি গল্প সে কথা বুঝে নিতে পাঠককে নিশ্চিত করে। 'জার্মানের মা' গল্পের নামে নামাঙ্কিত হয়েছে সংকলন গ্রন্থটি। এই গল্পের অনিন্দ্য সুন্দর মানবপ্রেমকেই জয়ী করেছেন অনিল। জার্মানের মা, রম্ভাধাই অনায়াসেই পতিহন্তা হারুঘোষের নবপ্রসূত সন্তানকে হত্যা করে পতি হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারত। কিন্তু তার অন্তরে প্রবাহিত মাতৃহৃদয় তাকে জিঘাংসা থেকে দূরে সরিয়ে আনে। রম্ভাধাই অপেক্ষা করে হত্যাকারীর প্রতি বিধাতার অমোঘ দণ্ডের জন্য। এর বিপরীত রস বাহিত হয়েছে 'কাকমারা' গল্পে। প্রতিহিংসার ভীষণ মূর্তি! ভিক্ষাম্বর দেনা শোধ করে মহাজনের হাত থেকে মুক্ত করে বউকে আপন ঘরে নিয়ে আসতে মহাজনের বাধার সম্মুখীন হয়। কিন্তু কোনো বাধা তাকে সংকল্পচ্যুত করতে পারে না। সে নৃশংসভাবে হত্যা করে মহাজনকে। এই গল্পে জুগুপ্সা রসের অবশ্যম্ভাবী প্রবাহ। 'জার্মানের মা' ও 'কাকমারা' গল্পের দুটির ভিন্নতর পরিণতি দানে অনিল অনিবার্যতাকে প্রধান স্থান দিয়ে সার্থক গল্পকার রূপে নিজেকে চিহ্নিত করেছেন। 'কাকমারা' গল্পের ক্রোধ সঞ্চারিত হয়েছে 'কামড়' ও 'নুনা সামাডের গল্প' দুইটিতে। 'কামড়' গল্পে অধঃস্তনের প্রতি উচ্চপদস্থের দাস ব্যবহারের প্রতিবাদ। 'নুনা সামাডের গল্পে' অর্থবানদের লুটেরার মনোবৃত্তির প্রতি তীব্র ধিক্কার। 'আকাশ পুত্র' গল্পে অনিল বর্তমানের কালো অধ্যায়ে দাঁড়িয়ে আগামী ইতিহাসের প্রতি আস্থা অর্পণ করেছেন। পাগলা ফণী যে মুশাতে দেশ খায় সে দেশের মুশার রাজ মানে না। সে বলে, সব মুশাকে জেলে দিয়ে চাবি নিজের হাতে রাখবে। 'দেশ চালাবে কে'—এর উত্তরে সে বলে, 'যারা এখন মার দুধ খায়,—তারা।' বর্তমান কালের অনুচ্চারিত বাণীকেই বাঙ্ময় করে তুলেছেন অনিল। 'ভুই ফোঁড়' গল্পে কালের ভাবনাই ভিন্ন সুরে অভিব্যক্ত হয়েছে। 'কানাকড়ি' গল্পটিতে একালের পল্লীবাংলার হঠাৎ-রাজাদের দাপটের চিত্র। গল্পকারের প্রসন্নতাকে অবলম্বন করেই অনিল নবউদ্ভূত পল্লীবাংলার হঠাৎ-রাজারূপ রাজনৈতিক নেতাদের কীর্তির কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। গল্পের নকড়ি নিজেই গান রচনা করে গান গেয়ে বেড়ায়। তার গানে গণপতিবাবুর অস্বস্তি। নির্ভীক নকড়ি তবু গানের এক আধলা পাল্টায় না। ফলে প্রাণটা দিতে হয় তাকে। 'কানাকড়ি'তে প্রতিবাদের ভাষা ধ্বনিত। 'পাচন বাড়ি', 'আদিম', 'গ্যাংম্যান' প্রভৃতি গল্পে অনিল নানাবিধ মানুষকে রসসমৃদ্ধির আয়োজনে দেখায় সচেষ্ট থেকেছেন।

জীবন সত্যের ক্রমাভিব্যক্তিতে অনিল ঘড়াই জয়ী হয়েছেন। গল্প রচনায় প্রতিবেশ আর জীবনকে আপন অভিপ্রেত আবেদনের মধ্যে বিলীন করার সাধনায় অনিল সাহিত্য প্রাণতার স্বাক্ষর রেখেছেন 'জার্মানের মা' গল্প গ্রন্থে।

হাল আমলে হাসির আকাল। ক্ষীণ হাসির কালে *তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের* না হাসির গল্প *'ইঁদুর'* প্রসন্নতা বয়ে আনে। রঙ্গ পটুতায় নিমগ্ন হওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করে। না হাসির গল্পগ্রন্থ 'ইঁদুরে'র নয়টি গল্পে যে হাসির প্রবাহ তা কবিকল্পনাশূন্য ঠাট্টারঙ্গ তামাসার আয়োজনেই বাহিত হয়নি। সকল গল্পেই ভণ্ডামি অসাধুতার প্রতি তীব্র ধিক্কার, কশাঘাতের উত্তপ্ত অভিপ্রায়।

'ইঁদুর' নামাঙ্কিত গল্পে সরকারী দপ্তরের কর্মবিমুখ, জড় অভ্যাসের অনুবর্তনায় অনুবর্তিত অকর্মণ্য, সহানুভূতিশূন্য মানুষদের প্রতি শ্লেষ বিদ্রূপ। এই গল্পের হাসির দমকা হাওয়া আছড়ে পড়েছে 'ফড়িং হইল পক্ষী' এবং 'লঙ্গরখানায় ভিটামিন' গল্প দুটিতে। সহাস্যাবেগে তপন উন্মোচিত করেছেন, সাম্প্রতিক গণনেতাদের গণ ছেড়ে গণ্যমান্য হওয়ার কর্মতৎপরতার ইতিবৃত্ত। উভয় গল্পেই প্রহসনের তীব্র ঝাঁঝ। তপনের ভ্রূকুটি নিক্ষিপ্ত হয়েছে পুলিশ, সমাজসেবক, ইংরেজি স্কুলের শিক্ষিকাদের প্রতি 'জ্যান্ত এবং মরা', ' আলোচনা চক্র', 'বর্ণপরিচয় : প্রথম ভাগ' প্রভৃতি গল্পে। 'ইনস্পেকশন' গল্পের রসিকতার উত্তপ্ত প্রলেপ কিঞ্চিত ব্যাহত হয়েছে গল্পের পরিসমাপ্তিতে Poetic justice প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে। 'প্রধান মন্ত্রীর সফরে'র হাসির ফল্গুধারা অতিকথন দোষে অব্যাহত থাকে নি। রসকল্পনার প্রসন্নতায় বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি ব্যঞ্জিত হয়েছে 'মুখ্যমন্ত্রীর উপহার' গল্পে। গল্পটি তপনের সরস রচনায় সহজ সঞ্চারের পরিচয় বহন করে। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইঁদুরে'র নয়টি গল্পেই রয়েছে শিল্পীর বুদ্ধিদীপ্ত ভঙ্গী, রুচিসম্মত চাতুর্যের প্রত্যাশিত স্বাদ।

মিহির ভট্টাচার্যের 'দাবার চাল' গ্রন্থের মোট উনিশটি গল্পের অবস্থান। মিহির ভট্টাচার্যের গল্পের অঞ্চল কলকাতা ও শহরতলী। চেনা জানা মধ্যবিত্ত-নিম্নবধ্যবিত্ত মানুষদের আচার আচরণ ভাবনা প্রধানত মিহিরের গল্পের উপাদান। মিহিরের নায়ক-নায়িকারা চাকুরীজীবী, ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী, গৃহিণী। মিহির 'লড়াই', 'খরা', 'দাবার চাল' গল্পে বর্তমান কালের শাসকদলের সঙ্গে যুক্ত রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের স্বার্থপরতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত করেছেন। এরকম দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে নারীদের অবদামিত মনের কল্পনা বাসনায় বেসামাল অবস্থার দিকে—'খণ্ডিত', 'বাসনার মনে', 'ভেবলা', প্রভৃতি গল্পে। মিহিরের অন্যান্য গল্পে স্থান পেয়েছে মানুষের নানবিধ চাওয়া-পাওয়া, আশা নিরাশার সংঘাতে আলোড়িত মনের কথা। এদের মধ্যে 'ডাইনী' গল্পের ভিন্নতর স্বাদ নজর কেড়ে নেয়। প্রত্যেক গল্পের উপকরণ সংগ্রহে মিহিরের পরিশ্রম-স্বীকার প্রশংসনীয়। তবে স্বতঃস্ফূর্ত এলোমেলো উপকরণকে সাহিত্য মর্যাদায় উন্নীত করতে যে অকৃত্রিম অনুরাগ প্রত্যাশিত, তার স্বল্পতা মনকে পীড়িত করে। সামাজিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে সকল মানুষের জীবনের সকল কথাই সর্বকালের গল্পের উপজীবিকা বটে কিন্তু শৈল্পিক সাধনায় মানুষের অভিনব পরিচয় অনির্বচনীয় স্বাদ না পেলে সবই যে মাটি। হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত মূল্যবান গল্পটি 'ফুলজান বিবির কেচ্ছা' আঙ্গিক বা কলাবৈচিত্র্যের শৈল্পিক চেতনার অভাবে পাঠক হৃদয়ে কোনো দাগই কাটে না।

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বদেশ কথা ও অন্যান্য গল্পে'র অধীন মোট নয়টি গল্পের বিচিত্র জীবনের মেলা। এই মেলার মানুষের ভিড়কেই সন্দীপ রূপায়িত করেন নি। তিনি কোলাহল ও কাকলিকেই বঞ্চিত করতে চেয়েছেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থানভূমিতে দাঁড়িয়ে গভীরতম উপলব্ধি ও অনুভবের সাহায্যে আত্মলীন ভাবনাকে সন্দীপ বাহিত

করেছেন প্রতিটি গল্পে। এই গ্রন্থের 'স্বদেশ কথা' এবং 'চিত্রকরে চিত্র লেখে' গল্প দুটি বাংলা গল্পের ভাণ্ডারে সার্থক সংযোজন। উভয় গল্পেই অকৃত্রিম শিল্পীমন নিয়ে গল্পকার বিষয়কে দেশ কাল পাত্রের উপর ক্রিয়াবান করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। ক্ষমতার দীপ্তিতে সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় আগামী প্রত্যাশার দিকে আমাদের মুখ ফেরাতে হাতছানি দেয়।

'অনৈসর্গিক' গল্প সংকলনে প্রশান্ত মাল সম্পর্কে ভেতরের প্রচ্ছদ পত্রে বেনামে লেখা হয়েছে, 'প্রশান্তের হাতে শব্দ ছবি হয়ে যায়। পরিবেশ মূর্ত হয়ে ওঠে। উন্মোচন ঘটে গভীর গোপন কোনো এক সঙ্কটের—এই সঙ্কট এক মানবিক সঙ্কট ' ইত্যাদি। নামে বা বেনামে কোনো গল্পকার সম্পর্কে এরকম পরিচয় পত্র বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গল্পর আস্বাদনই গল্পকারের পরিচয় পাঠক মনে মুদ্রিত হয়, বাড়তি প্রয়াসে বিরক্তির বোঝা বাড়ে। প্রশান্ত মালের 'অনৈসর্গিক' গ্রন্থ সংকলনে স্থান পেয়েছে চৌদ্দটি গল্প। কাহিনীর নিটোল বৃত্ত রচনা অপেক্ষা প্রশান্তের দৃষ্টি আত্মলীন ভাবনার বিস্তারে। তবে আত্মলীন ভাবনাকে রসাস্বাদ্য করে তোলার মুন্সিয়ানার অভাব এখানে লেখক অতিক্রম করার সামর্থ্য অর্জন করেন নি।

ভদ্রলোকদের উলঙ্গ আত্মার নাটক

মেঘ মুখোপাধ্যায়

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের নাট্য সংকলন প্রকাশে 'রূপা' যে প্রশংসনীয় পরিকল্পনা নিয়েছে সেই ধারার চতুর্থ খণ্ড আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। বাংলা নাটামঞ্চের জন্য নাটক রচনা করে যেসব নাট্যকার স্থায়ী কীর্তির অধিকারী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অজিত গঙ্গোপাধ্যায় বিশিষ্ট। তাঁর সম্বন্ধে শম্ভু মিত্র বলেছিলেন — "আজকের দিনে ভাল নাটক লেখার বা অভিনয় করার জন্য এমন লোক চাই যাঁদের সংস্কৃতি-রুচি প্রতি মুহূর্তে তাঁদের অনলস পরিশ্রমের পথে উদ্যম জোগাবে। সে পথে অজিত গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় সহকর্মী। তাঁর প্রগাঢ় উৎসাহ আর কর্মোদাম বহুবার আমাকে বিস্মিত করেছে।" এরকম একজন নাট্যকারের রচনা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য গ্রন্থাকারে পরিবেশনের প্রয়োজন স্বীকার করে নিয়ে 'রূপা' এক মহার্ঘ দায়িত্ব সম্পাদন করে চলেছে। বিশেষ করে আমাদের দেশে প্রসিদ্ধ প্রকাশন সংস্থাগুলি উপন্যাস প্রকাশের ব্যাপারে যে তৎপরতা দেখান, নাটক প্রকাশের ক্ষেত্রে তার কণামাত্র নয়। এমনকি বাংলা মঞ্চের বিপুল খ্যাতি পাওয়া, দর্শকপ্রশংসাধন্য নাটকগুলি প্রকাশের ব্যাপারেও প্রথিতযশা প্রকাশকদের এগিয়ে আসতে দেখা যায় না। এরকম এক পরিবেশে 'রূপা' কর্তৃক অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের নাট্যসংকলন প্রকাশের উদ্যম নানা দিক দিয়ে উৎসাহব্যঞ্জক।

বহুরূপী, এল টি জি, নান্দীকার, রূপকার, মাস থিয়েটার্সের মতো বাংলা নাট্য আন্দোলনের প্রথম সারির দলগুলি বিভিন্ন সময়ে অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের নাটক অভিনয় করেছে। লিখিত নাটক শুধুমাত্র মঞ্চ সাফল্যের জন্যই নয়, উচ্চমানের সাহিত্য হিসাবেও যে তার মূল্য আছে এ বিষয়ে অজিতবাবু ছিলেন সর্বদা সচেতন। এখানে সাধারণ নাট্যকারদের সাহিত্যিক হিসাবে গণ্য করা হয় না, নাট্যকাররা যেন সাহিত্য জগতের বাইরের লোক, মঞ্চাভিনয়ের প্রয়োজনে তাঁরা ভাষাকে প্রয়োগ করেন — এই যা — অনেকের ধারণা এরকম। কিন্তু অজিতবাবুর নাটকগুলি পাঠ করার পর এ ভুল ভাঙতে দেরি হয় না।

নাট্য সংকলনের চতুর্থ খণ্ডে রয়েছে চারখানা নাটক। *মৌন মুখর, সুধাময়, বদনচাঁদের বজ্জাতি এবং থানা থেকে আসছি।* চারখানা নাটকই কোন না কোন ইউরোপীয় নাটকের ভাব অবলম্বনে কিংবা অনুপ্রেরণায় রচিত। মৌন মুখর ও সুধাময়ের জন্য নাট্যকার যথাক্রমে আনাতোল ফ্রাঁস এবং মেরী চেজের কাছে ঋণী। বদনচাঁদের বজ্জাতি মলিয়ের-এর বিখ্যাত Les Fourberries de Scapin এবং থানা থেকে আসছি জে বি প্রিস্টলের An Inspector Calls অনুপ্রাণিত। চারটি নাটকই

নাট্য সংকলন (চতুর্থ খণ্ড)-অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, রূপা-১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, জুলাই, দাম-ষাট টাকা

বিষয়বস্তুতে গভীর কিন্তু রচনাকৌশলে কৌতুক-সঞ্চারী। নাটকগুলির পাত্রপাত্রী আধুনিক নাগরিক সমাজের এবং তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও তাদের মধ্যে ঘনানো সংকটের রূপ আধুনিক স্বার্থান্বেষী সংকীর্ণ সমাজের যেখানে সততার চেয়ে ভণ্ডামির, খোলামনের চেয়ে ভান-ভড়ঙের, সকলকে নিয়ে বাঁচার তুলনায় নগ্ন আত্মপ্রীতির চল বড় বেশি। এই সংকলনের মুখবন্ধে নাট্যকারকৃত একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রয়েছে। সেখানে এক জায়গায় তিনি বলেছেন—"জীবনের একটা বহিরাবরণ আছে। তথাকথিত ভদ্রলোকদের দিক থেকে সে আবরণ আপাতদৃষ্টিতে বেশ মজবুত। কৌতুক-নাট্যের উদ্ভট রঙ্গ বাইরে থেকে এই আবরণকে আঘাত করে — আঘাতের পর আঘাত। তারপর সে পাঁচিল ভেঙে পড়ে, আবরণ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসে ভদ্রলোকদের উলঙ্গ আত্মারা।" এই সংকলনের পরপর চারটি নাটকেই আমরা তথাকথিত ভদ্রলোকদের উলঙ্গ আত্মাদের বেরিয়ে আসতে দেখি যদিও মৌন-মুখর নাটকটিতে নির্মল হাস্যরসের পরিমাণ কিঞ্চিত বেশি। এই উদ্ঘাটনের প্রক্রিয়া 'থানা থেকে আসছি'তেই চরম মাত্রা অর্জন করেছে। তাই এই নাটকের আগে উৎপল দত্তের ভূমিকার সংযোজন নাটকটির মর্মবিশ্লেষণে সকলের কাছেই সহায়ক হবে। কোনো শক্তিমান নাট্যদল এই নাটকটির সার্থক মঞ্চায়নের চ্যালেঞ্জ নিতে আজও এগিয়েআসতে পারেন। আপাতদৃষ্টিতে সুখী ও সম্পন্ন এক নামজাদা পরিবারের এক সুখের দিনে আচমকা এক পুলিশ ইন্‌সপেক্‌টরের আবির্ভাব ঘটে সদ্য আত্মঘাতী এক অসহায় তরুণীর মৃত্যুর তদন্তের উদ্দেশ্যে এবং ক্রমে ক্রমে সুখী ও সম্পন্ন মানুষগুলির মুখোশ খসে যেতে থাকে — তাদের সুখ ও সন্তোষের জন্য কিভাবে ওই তরুণীটির জীবনে মর্মন্তুদ বিপর্যয় নেমে আসে তারা নিজেরাই তা স্বীকার করে নেয়। কিন্তু ইন্‌সপেক্‌টরের অন্তর্ধানের পর প্রমাণ হয় যে সে সত্যিকারের ইন্‌সপেক্‌টর ছিল না। তখন তাদের মধ্যে আবার নতুন আলোড়ন এবং নিজেদের ভাঙাচোরা লণ্ডভণ্ড মুখাবয়বগুলিকে ফের সাজিয়ে গুছিয়ে তোলার নির্লজ্জ আয়োজন। নাটকটির গঠনশৈলী রহস্যমাখা এবং ক্রমশ কয়েকটি জটিল প্রশ্নে দর্শক-পাঠক মনকে কৌতূহলী করে রাখতে দক্ষ। এই নাটকটি যখন প্রথম রচিত হয়েছিল তারপর তিন দশক পেরিয়ে গিয়েছে কিন্তু আমাদের সমাজে চন্দ্রমাধব সেন ও তাঁর পুত্র কন্যা স্ত্রী ও জামাতার মতো চরিত্রের সংখ্যা কমা তো দূরের কথা উত্তরোত্তর বেড়েই গিয়েছে। তাই এ নাটকের পুনরাভিনয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। উৎপল দত্তের ভাষায় এ নাটক নিয়ে 'স্পর্ধিত পরীক্ষা চালাবারও অনেক সুযোগ রয়েছে'।

এক জন্মবোবা তরুণী, যে এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রৌঢ় ব্যারিস্টারের পত্নী, যদি পতির আগ্রহাতিশয্যে এক বিরল বিস্ময়কর শল্যচিকিৎসাপদ্ধতির ফলে কণ্ঠস্বর ফিরে পায়, তাহলে তার মুখরতা পতির জীবনে কী কাণ্ড ঘনাতে পারে সেই নিয়ে নাটক মৌনমুখর। পড়তে পড়তে হাসির চোটে পেটে খিল ধরে যাবার জোগাড়। সমাজসচেতন গুরুগম্ভীর তত্ত্ব সমাকীর্ণ নাটকের আবহে একটু অন্য ধরনের হাওয়া বইয়ে দিতে নাটকটি যথেষ্ট। এই নাটকে ছড়া ও গানের ব্যবহার চমকপ্রদ। সংকলনটির প্রচ্ছদশিল্পী মনোজ মিত্র।

তুমি কি কেবলই ছবি

প্রসঙ্গ হুসেনের ছবি আঁকা
আর ছবি মোছা

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

ভূমিতল ছেড়ে লিফট দ্রুত নিয়ে এল সপ্তদশ তলে। সামনের প্রশস্ত কক্ষে প্রবেশ করে দেখা গেল মঞ্চের উপর কোমর সমান উঁচুতে রাখা পরপর চারটে সাদা বড়ো বড়ো ক্যানভাস আর একই মাপের দুটো সাদা ক্যানভাস দুপাশের মেঝের উপর সাজানো। দর্শকদের জন্যে পর্যাপ্ত সংখ্যায় আসন পাতা থাকলেও সমবেত দর্শকের সংখ্যা ছাপিয়ে গেছে আসন সংখ্যা। ঔৎসুক্য ও কৌতূহল ঘরের পরিবেশকে করেছে ঈষৎ চঞ্চল। সেলুলয়েড ফিল্ম, ইউমেটিক ভিডিও ফিল্ম ও স্টিল ফোটোগ্রাফাররা নিজের নিজের জায়গা নিয়ে প্রস্তুত।

জ্বলে উঠল উজ্জ্বল আলো। নেপথ্যে বেজে উঠল উত্তাল পাশ্চাত্য সংগীতের ঐকতান। এক অর্থে সমরবাদ্য। হুসেন রং থেকে বের করলেন তুলি। উদ্যত তুলি হাতে এগিয়ে গেলেন ক্যানভাসের সাদা ক্ষেত্রের দিকে। আক্রমণ। একবার এই সাদা ক্ষেত্রকে, একবার ওই ক্ষেত্রকে, পর মুহূর্তে লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেলেন একেবারে ডান দিকে মেঝের উপরে রাখা সাদা ক্ষেত্রের দিকে, এবার নুঁকে পড়ে আক্রমণ, বারবার আক্রমণ। আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, কেশর ফোলানো সিংহের মতো ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন মাঝামাঝি রাখা কোমর সমান উঁচু একটা সাদা ক্ষেত্রের দিকে, সংগীতে নতুন ধ্বনি-তরঙ্গে ভেসে গেলেন ক্যানভাসটার দিকে। এক টুকরো কাপড় তুলে নিয়ে তুলিটাকে মুছে নতুন রঙে চুবিয়ে নিলেন। আবার আক্রমণ, আক্রমণের পর আক্রমণ।

১৯৯২ ফেব্রুয়ারি ২১ কলকাতা চৌরঙ্গি রোডে টাটা সেন্টারের সভাঘরে মকবুল ফিদা হুসেনের এক অভিনব প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন হল। বিভিন্ন জননীরূপের চিত্রাঙ্কনের প্রদর্শনী। দর্শকের দৃষ্টির আড়ালে শিল্পীর ব্যক্তিগত জগতে আঁকা চিত্রের প্রদর্শনী নয়, দর্শক সমাজের চোখের সামনে ছবি আঁকার প্রদর্শনী। একটি ছবির পর আর একটি ছবি আঁকা নয়, এক সঙ্গে ছ-টি ছবি আঁকা হবে। দুর্গার ছবি কিছুটা এঁকে কিছুটা আঁকবেন সরস্বতীর ছবি, তারপর সরে গিয়ে কিছুটা আঁকবেন জননী তেরেসার ছবি, কয়েক পোঁচ দিয়ে উলটো দিকে গিয়ে আঁকবেন লক্ষ্মীর ছবি, তারপর কালীর ছবি, একটুখানি এঁকে আবার অন্য দিকে গিয়ে গণেশ জননী পার্বতীর ছবি—এইভাবে একই সঙ্গে এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত বারবার এপাশ ওপাশ করে ছটি ছবি আঁকবেন ছ-দিন ধরে, কিন্তু সারাদিন ধরে নয়, নেপথ্যে পাশ্চাত্য সংগীতের সময়সীমাতে যতক্ষণ আঁকা যাবে শুধু ততক্ষণ।

এর আগে ভীমসেন যোশির সংগীতের সঙ্গে হুসেন একবার ছবি আঁকার যুগলবন্দীর অনুষ্ঠান করেছিলেন। সে অনুষ্ঠানে অন্যে কী করছেন না করছেন সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে একজন তাঁর খুশি মতো গাইলেন আর অন্য জন আপনমনে ছবি আঁকলেন — তাতে ছবি বা গান কোনটাই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল ছিল না, ছিল পরস্পরের থেকে নিরপেক্ষ রূপে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন।

'৯২এর ২১-২৬ ফেব্রুয়ারির ছ-দিনের অনুষ্ঠান আগের অর্থে 'যুগলবন্দী' না হলেও ছিল ঐকতান বা সমবেত শিল্প, সমবেত পাশ্চাত্য বাদ্যবৃন্দের ঐকতান এখানেও চিত্রশিল্পের পরিচালক নয়, কিন্তু অবশ্যই আবেগ উদ্দীপনে চিত্রশিল্পের পরিপূরক। সংগীতের তরঙ্গ বিভঙ্গের ছন্দে ছন্দে একজন চিত্রশিল্পী একটার পর একটা ক্যানভাসে কখনও রেখা আঁকছেন আবার কখনও রঙ বসাচ্ছেন। রেখা টানা বা রঙ লাগানোর থেকে রেখা আঁকা অথবা রং বসানো ভিন্ন প্রকৃতির কাজ একথাটা বলে রাখা ভালো। শিল্পীর সামনে সাজানো সাদা ক্যানভাস শুধু চৌকো মাপের ছবি আঁকার উদ্দেশ্যে রাখা পট মাত্র নয়, শিল্পীর আক্রমণের লক্ষ্য হল ক্যানভাসের চাইতে আরও অনেক বেশি কিছু — তাঁর লক্ষ্য গোটা মঞ্চের উপরে অর্ধচন্দ্রাকারে বৃাহের মতো দণ্ডায়মান এক মর্মর প্রাচীর, এই প্রাচীর লম্বাতে বিশ-চব্বিশ ফুট আর সর্বোচ্চ খাড়াইয়ে আট-দশ ফুট উঁচু হলেও শিল্পীর কাছে

স্বর্গমর্ত্যব্যাপী এক চূড়ান্ত প্রতিস্পর্ধা। এখানে হুসেন একাধারে দুইই — তিনিই তুলি, তিনিই শিল্পী। হুসেন-রূপী শিল্পীর ক্রমাগত তীব্র সঞ্চালনে নানা রঙে ভরা হুসেন-রূপী তুলির অব্যর্থ আঘাতে আঘাতে, অতিকায় ক্যানভাসের জায়গায় জায়গায় প্রথম বসন্তে প্রাচীরের গায়ে ফুল ফোটার মতো করে প্রেরণায় উদ্দীপ্ত গ্রাফিক বিন্যাস ও বহুতর চেনা-অচেনা জ্যামিতিক ও প্রাকৃতিক রূপ ফুটে উঠতে থাকে, তারপর সেই বিন্যাস ও আকৃতিগুলি অংশে অংশে বিচ্ছিন্ন হয়েও— দর্শকের চোখের সামনে অনবদ্য ইন্দ্রজালের মতো — শিল্পের অন্তর্নিহিত সাশ্রয়ী শৃঙ্খলায় সংহতি লাভ করতে থাকে, তখন সেই সন্নিবেশিত সামগ্রিক রূপ কখনও বিভিন্ন ভঙ্গিময় কতকগুলি আদি নারী মূর্তির ইঙ্গিত, কখনও গোপন রিরংসায় বিচিত্র তরঙ্গমালা, আবার কখনও অধরা আকাশে রূপান্তরশীল মেঘমালার আভাস — সুদূর ও নিস্পৃহ, আবার কখনও পরিচিত বাসনা কামনার রূপকল্পে অপ্রত্যাশিতের অনন্ত বিভ্রম। সমস্ত শিল্পই কি কোন-না-কোন অর্থে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যে ভেসে বেড়ানো এক অলৌকিক বিভ্রম নয়?

মকবুল ফিদা হুসেনের ক্ষেত্রে এই বিভ্রমের সরল সূচনা হয় ১৯১৫ সালে। মহারাষ্ট্রের সোলাপুরে তাঁর জন্ম। শৈশবেই নিম্নবিত্ত পরিবারের সঙ্গে চলে যান ইন্দোরে, সেখানেই বড়ো হন এবং ২২ বছর বয়েসে বম্বেতে আসেন ভাগ্যান্বেষণে। সিনেমার হোর্ডিং আঁকা দিয়ে শিল্পীর জীবন শুরু। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন বিদেশী ও দেশী সৈন্যতে শহরের পথঘাট ছেয়ে যায় তখন হুসেন সৌখিন সমাজের জন্য কাঠের আসবাবপত্র ও খেলনাপত্র বানাতে থাকেন। স্কুল-কলেজের স্বীকৃত বা সম্মানিত পথে শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ তিনি পান নি, কিন্তু চূড়ান্ত ব্যবসায়ীকদের কর্মশালাতে কাজ করে করে তিনি প্রথম যৌবনেই শিল্প কী আর শিল্প কী নয় এই সত্যটা শিরায় শিরায় অনুভব করেছেন, তখন তিনিও অনুভব করেছেন: 'চারিদিকে মোর এ কী কারাগার ঘোর!'

ফলে হুসেন ৩০ বছরের মধ্যেই বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মাধ্যমে একেবারে স্বশিক্ষিতভাবে শিল্প সৃষ্টির দক্ষতা অর্জন করেন এবং ৪০ বছরে যখন তিনি সিরিয়াসলি চিত্রশিল্পের দিকে মন দেন তখনও অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলাল প্রমুখের গৌরবময় যুগ চলছে, ছবি আঁকার ক্ষেত্রকে ভেঙেচুরে নতুন করে সাজাবার চেষ্টায় যামিনী রায়ের পরীক্ষা তখনও উপরিতলের দ্বিমাত্রিক আবরণ ভেদ করে ভেতরে যায় নি, বরং চিত্রক্ষেত্রের ভেতরে কী আছে না আছে দেখবার জন্যে ক্যালকাটা গ্রুপের নীরদ মজুমদার, পরিতোষ সেন, প্রাণকৃষ্ণ পাল, রথীন্দ্র মৈত্র প্রমুখ শিল্পীরা উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করেছেন। হুসেন যখন পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের আর্টিস্ট্‌স হাউসে একক প্রদর্শনী করেছিলেন, তখন তাঁর দর্শক জোটে নি, ভিড় হওয়া তো দূরের কথা, এবং ট্রেন ভাড়া ধার করে ছবিগুলি ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকার কলাসমালোচক ছবিগুলিকে বলেছিলেন, যামিনী রায়ের রোমাঞ্চহীন নিকৃষ্ট অনুকরণ।

'রোমাঞ্চহীন', 'লোকশিল্পের আর একজন অনুকারী,' 'স্বশিক্ষিত আসলে অশিক্ষিত', 'সিনেমা হোর্ডিঙের আর্টিস্ট', 'আসবাবপত্রের ব্যবসায়ী' ইত্যাদি বলে বর্ণনা করার ছলে হুসেনকে খাটো করার চেষ্টা প্রচুর একদা হয়েছে, এখনও যে একেবারে হয় না তা নয়। কিন্তু উদ্যোগ ও প্রতিভা কোনোটাই কোনও সময়ে হুসেনকে পরিত্যাগ করে নি। সিনেমা হোর্ডিং আঁকতে আঁকতে অত্যন্ত কাঁচা বয়সেই ড্রয়িঙে অত্যন্ত পাকা হাতের অধিকারী হয়ে ওঠেন। আর আসবাবপত্রের পরিকল্পনা করতে করতে শূন্য স্থানে বা স্পেসে বস্তু-বর্ণ-রূপ-পাত্রের বিন্যাস সম্বন্ধে তাঁর এমন চোখ খুলে যায় যাকে বলা উচিত দিব্যদৃষ্টির উন্মোচন। শিল্পীর সামনে একটা ক্যানভাস আছে, ক্যানভাসটার শুধু দৈর্ঘ-প্রস্থ-ই নেই, তার একটা ঘনত্ব বা গভীরতা আছে যা সাদা চোখে দেখা যায় না, ছায়া দিয়ে যার অস্তিত্ব বোঝানো যায় না, শিল্পী যার মধ্যে বস্তু স্থাপন করে তার অস্তিত্বকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তোলেন। শূন্য স্থানের মধ্যে রেখায় রঙে নিপুণ গৃহিনীপনাতেই হুসেনের অনন্যতা।

প্রথমে ছিল মঞ্চ জুড়ে ছ-টি সাদা ক্যানভাস বা শূন্যস্থান। সংখ্যার হিসেবে একে ছ-টি শূন্য স্থান না বলে একটাই বিশাল শূন্য স্থান বলা বাঞ্ছনীয়। তারপর হুসেন শুরু করলেন এই বিশাল শূন্য স্থানকে রঙ দিয়ে রেখা দিয়ে বিষয় দিয়ে সাজানো। হ্যাঁ, আস্তে আস্তে বিষয়টিও ফুটে উঠছে — বিষয় হল সমস্ত

শক্তির ও সৃষ্টির উৎস: জননী। দুর্গার মধ্যে জননীর এক রূপ, তিনি সিংহবাহিনী, আবার পার্বতীর মধ্যে জননীর আর এক রূপ, তিনি গণেশ জননী, সরস্বতী বিদ্যাজননী, লক্ষ্মী বিত্তজননী, কালী বিশ্বজননী এবং জননী তেরেসা করুণাময়ী আর্তজননী। কিন্তু দুর্গার যে-রূপ আমরা দোকানে বাজারে দেখতে অভ্যস্ত সে-রূপকে তিনি আঁকেন নি। তিনি এঁকেছেন দুর্গা বর্ণনার অতিরিক্ত অংশগুলিকে বাদ দিয়ে, অ্যাবস্ট্রাক্ট করে, দুর্গার রূপের অন্তঃসারকে ছেঁকে তুলে, যে-রূপকে বলা যায় দুর্গার স্বরূপ, শুধুমাত্র সেই স্বরূপকে হুসেন বর্ণনা করেছেন তাঁর নিজস্ব ভাষায়। সুতরাং দুর্গার স্বরূপকে অনুভব করতে হবে এবং শিল্পীর ভাষাকেও বুঝতে হবে। যদিও শিল্পী ছবি আঁকছেন সামাজিক পরিবেশে, কিন্তু তাঁর ভাষা একান্তই শিল্পের নিজস্ব ভাষা। দুর্গার বেলাতে যে-কথা সত্য পার্বতী, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতীর বেলাতেও তা সমান সত্য। শুধু জননী তেরেসার বেলাতে কথাটা একটু অন্যরকম।

দুর্গা-পার্বতীর যে রূপ তা বিশ্বাসীদের চোখে দেখা রূপ। কিন্তু জননী তেরেসাকে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলেই চোখে দেখতে পারে বা চোখে দেখেছে। সাধারণ মানুষের চোখে দেখা জননী তেরেসার রূপের অতীত জননী তেরেসার আর একটা রূপ আছে যে-রূপের অন্তঃসার অনুসন্ধান করেছেন হুসেন। ফলে এখানে সাধারণের চোখে দেখা মূর্তির গভীরে বিমূর্ত সত্তার তলে শিল্পীর অবতরণ আরও বেশি দুঃসাহসিক, জননী তেরেসার শাড়ির পাড়ের নীল রঙের অশরীরী সংস্থাপনে আরও বেশি আধ্যাত্মিক।

এইভাবেই হুসেন দর্শকের সঙ্গে আলাপ করেন, কম্যুনিকেট করেন, দর্শকের কাছে নিজের অভিজ্ঞতা ও অনুভবকে নিজের ভাষাতে পৌঁছে দেন এবং নিজেকে প্রকাশের মরিয়া আকুলতাতে কখনও আঁকেন, কখনও লেখেন,

Send me a snow-clad sheet of sky
Bearing no scar.
How shall I paint
In white words
The encircling contours
Of your boundless mourns.
When I begin to paint
Hold the sky in your hands
As the stretch of my canvas
Is unknown to me.

আবার কখনও চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন, কিন্তু সে চলচ্চিত্র — তাঁর কবিতার মতোই প্রথাসিদ্ধের যে-ধারাকে ঐতিহ্য বলা হয় তার সীমানা অতিক্রম করে যায়। 'থ্রু দি আইজ অব এ পেইন্টার' নামক রাজস্থানের উপর তথ্যচিত্রে জুতো, ছাতা, লণ্ঠন, চশমা ইত্যাদিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনা প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে তিনি দৃশ্যের পর দৃশ্যে এক ধারাবাহিক নকশা নির্মাণ করেছেন — রাজস্থানী গ্রামের ঘরবাড়ির দেওয়ালে এইরকম নকশা আঁকা থাকে এবং ঐ চলচ্চিত্র প্রকৃতপক্ষে আধুনিক চিত্রশিল্পের রুচিতে ঐতিহ্যমণ্ডিত রাজস্থানী জীবন ও শিল্পের অভিনব মূল্যায়ন। মনে হয় এই নূতনত্বের জন্যেই বার্লিন শহরে চলচ্চিত্রের আন্তর্জাতিক উৎসবে 'থ্রু দি আইজ অব ঐ পেইন্টার' ১৯৬৭ সালে শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্রের পুরস্কার স্বর্ণভল্লুক লাভ করে। আবার ১৯৭২ সালে তিনি নির্মাণ করলেন 'গ্রীন ব্রাউন হোয়াইট' নামে হরিয়ানার উপরে একটি তথ্যচিত্র। সেটা সবুজ বিপ্লবের যুগ এবং হরিয়ানা রাজ্য তখন প্রাচুর্যে ও সমৃদ্ধিতে স্বাধীন ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলির আদর্শ। ঐ ছবিতে আছে হরিয়ানার সেই চমকপ্রদ অগ্রগতির বর্ণাঢ্য দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ। শেষোক্ত ছবিটার নির্মাণ কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমার পক্ষে সেটা ছিল এক আশ্চর্য যোগাযোগ। বলতে গেলে ঐ ছবিতেই আমার তথ্যচিত্র নির্মাণে হাতেখড়ি।

প্রয়াত চলচ্চিত্রকার শান্তিপ্রসাদ চৌধুরী যখন হুসেনের উপর তথ্যচিত্র নিমাণ শুরু করেন তখন আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন হায়দ্রাবাদে। হুসেন তখন হায়দ্রাবাদে একজন পণ্ডিতের কাছে গোঁসাই তুলসীদাসের রামচরিতমানস অধ্যয়ন করছিলেন এবং রামায়ণের বিভিন্ন ঘটনা ও বর্ণনা অবলম্বনে ছবি আঁকছিলেন — প্রথমে খসড়া এঁকে নিচ্ছিলেন স্কেচ খাতায়, তারপরে ক্যানভাসে চূড়ান্ত রূপে আঁকছিলেন। হুসেনের ছবি আঁকার বেগ অবিশ্বাস্য। তিনি যে এত বেশি আঁকতে পেরেছেন তার একটি কারণ ছবি তাঁর কাছে অনর্গল সহজে আসে — উপলক্ষ চকিতে রূপান্তরিত হয় লক্ষ্যে — অর্থাৎ ছবিতে। আলোতে আকাশে দৃশ্যের আভাসে ভেসে বেড়াচ্ছে যেসব অজস্র ছবির প্ররোচনা সেসব তাঁর নিয়ত উদ্যত মনে প্রতিক্রিয়া ঘটায় অত্যন্ত দ্রুত বেগে। উৎকৃষ্ট বারুদ সর্বদা মজুদ। স্ফুলিঙ্গের স্পর্শমাত্রে ঘটে বিস্ফোরণ। সাদা ক্যানভাসের মুখোমুখি দাঁড়ালেই তিনি সংগ্রামের উন্মাদনা অনুভব করেন, তৎক্ষণাৎ শূন্যতাকে ভেঙে চুরে মনের মতো করে রঙ রেখা বিষয়বস্তু দিয়ে সাজাতে শুরু করেন। ছবি আঁকা তাঁর কাছে যেন শূন্যতাকে নিয়ে খেলা।

হায়দ্রাবাদে শুটিং চলাকালে একটা চাকরির ইন্টারভিউ পেয়ে, আশার ছলনায় ভুলে, আমি কলকাতায় ফিরে আসি এবং ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে জানতে পাই যে ঐ বিশেষ পদে সাময়িক যিনি বহাল আছেন তাঁকেই পাকা করার জন্যে ঐ ইন্টারভিউর প্রহসন। কিন্তু আমার তখন শুটিঙে ফিরে যাওয়ার পথ বন্ধ। মাস খানেক পরে শান্তিপ্রসাদ জানালেন যে হরিয়ানার উপর চলচ্চিত্র নির্মাণে হুসেনকে সাহায্য করার জন্যে আমাকে হরিয়ানাতে যেতে হবে। কাজ করতে গিয়ে দেখলাম যে কোনও চিত্রনাট্য সামনে রেখে শুটিং করা হুসেনের ধারা নয়, তাঁর ধারা হল মনটাকে খোলা রাখা যাতে উড়ে-আসা যে কোনও ভাবনাকে দৃশ্যের ফাঁদে ধরতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে প্রথম দিন তাঁর শুটিং ছিল অনিশ্চয়তায় অস্থির। দ্বিতীয় দিন হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্যে উধাও হয়ে গিয়ে একটা মস্ত মাটির মটকা ঘাড়ে করে ফিরে এসে বললেন, এ-ই আমার নায়িকা — এর সম্পর্কে সাবধান! পিঙ্গল শস্য বর্ণের মটকাকেই তিনি হরিয়ানার প্রাচুর্যের প্রতীক হিসেবে সমস্ত ছবিতে ব্যবহার করেছেন।

শিল্পীর ভাষা জানতে হবে। শিল্পীর যথাযোগ্য অভ্যর্থনার জন্যে মনটাকে সারাক্ষণ প্রস্তুত রাখতে হবে। দর্শকের কাজ হল ঘরখানি শিল্পীর জন্যে ধুয়ে মুছে রাখা। 'আমারে যে জাগতে হবে, কী জানি সে আসবে কবে যদি আমায় পড়ে তাহার মনে বসন্তের এই মাতাল সমীরণে।' আর শিল্পীর কাজ হল অতীত কীর্তির অনুকরণ নয়, তার পরিবর্তে বারে বারে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করা। রোমাঞ্চ আর দক্ষতা এক জিনিস নয়। দক্ষতা প্রায়ই পুনরাবৃত্তিতে পর্যবসিত হয়। তাই দক্ষতার ঊর্ধ্বে চাই নতুন নতুন রোমাঞ্চ সৃষ্টির প্রতিভা। নতুন নতুন চমক, নতুন নতুন রোমাঞ্চ সৃষ্টিতে হুসেনের অনন্যতা অনস্বীকার্য। এই যে সবার চোখের সামনে এক সঙ্গে ছ-টা ছবি আঁকার পরিকল্প না — এটা কি যথেষ্ট চমকপ্রদ বা পর্যাপ্ত রোমাঞ্চকর নয়? কিন্তু একে শুধু চমকপ্রদ বলে বাতিল করা শিল্পকে তার মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করার শামিল। বিরূপ সমালোচনা করতে হলে অঙ্কন প্রক্রিয়ার নয়, অঙ্কিত ছবিগুলির দোষদুর্বলতার সমালোচনা করতে হবে।

'দেখিতে দেখিতে কী হতে কী হল শূন্য কে দিল ভরি/প্রাণবন্যায় উঠিল ফেনায় মাধুরীর মঞ্জরী।' অবশেষে সম্পূর্ণ হল ছ-টা ক্যানভাসে জননীর স্বরূপ আঁকা। ১৯৯২ এর ২৬ ফেবরুয়ারি। সত্যিই কি হুসেন পরদিন ছ-টা ক্যানভাস জুড়ে আঁকা জননীর বিশাল ছবিকে মুছে ফেলবেন? শুধু টাকার অঙ্কেই এই ছবিগুলোর দাম যে কত লক্ষ লক্ষ টাকা তার সঠিক ধারণা পেতে হলে এই ছবিগুলোকে নিলামে বিক্রি করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে ছবিগুলো মুছে ফেলার অনুষ্ঠান শুরু করার আগে পুরো ঘটনাটার উদ্যোক্তা টাটা কোম্পানির পক্ষ থেকে কোম্পানি প্রধান রুশি মোদি নিলামের প্রস্তাবটা করেওছিলেন। ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে হুসেনই সবচেয়ে বড়ো শিল্পী কিনা এ নিয়ে যদি বা কোনও মতভেদ থাকতে পারে, হুসেনের আঁকা ছবির দামই যে শিল্পের বাণিজ্যে টাকার অঙ্কে সবচেয়ে বেশি এই সরল সত্য নিয়ে মতভেদের কোনও সুযোগই নেই।

কিন্তু অর্থমূল্যই কি শিল্প? নিশ্চয়ই না। তবে জননী-স্বরূপা এই ক্যানভাসগুলোই কি শিল্প? না! তবে কি বহু বর্ণের এই বিচিত্র বিশাল বিন্যাসই শিল্প? না! মনে পড়ে, আত্মার স্বরূপ সন্ধানের অসামান্য তত্ত্ব। এই দেহই কি আত্মা? নেতি। হৃদস্পন্দনই কি আত্মা? নেতি। প্রাণবায়ুই কি আত্মা? নেতি। এইভাবে 'নেতি নেতি' করে প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান আমাদের জানিয়েছে যে সমস্ত প্রশ্নের সীমানা অতিক্রম করার পর যেখানে এসে প্রশ্ন সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায় তারপরেও কিছু থাকে এবং সবশেষের সেই প্রশ্নশূন্যতাই হল আত্মা। ১৯৭২ সালে হায়দ্রাবাদে হুসেন একটি ছবি এঁকেছিলেন — অস্তরাগের আকাশের মতো পটে নাগরী লিপিতে নেতি নেতি নেতি কথাটাকে কঙ্কার নকশাতে এমনভাবে

সাজিয়ে দিয়েছিলেন যাতে সমস্ত অক্ষর ক্রমশ দূরে যেতে যেতে একটা স্তরে শূন্যে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। শূন্য থেকে এসে আবার শূন্যেই বিলীন হয়ে যাওয়ার মধ্যে ভারতীয় জ্ঞান এক রোমাঞ্চকর রহস্যকে অনুভব করেছে। হুসেনের ছবির মধ্যেও আছে সেই রহস্যের আস্বাদন।

হুসেন বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার দুটি পঙক্তির আঘাত তাঁর মনে বিলীনতার ঊর্ধ্বে শিল্পের সত্য সম্বন্ধে উদ্ভাসন ঘটিয়েছে: 'তুমি কি কেবলই ছবি? নও ছবি, নও শুধু ছবি।' ছবি ক্যানভাসে নেই, ছবি আছে শিল্পীর অনুভবে, ছবি আছে দর্শকের আগ্রহে। ১৯৯২-এর ২৭ ফেব্রুয়ারিকেই ছবিগুলি মুছে ফেলার দিন হিসেবে হুসেন নির্দিষ্ট করেছেন বিশেষ কারণেই। ঠিক দশ বছর আগে ঐ দিনটিতেই তাঁর বন্ধু শান্তিপ্রসাদ চৌধুরি মহারহস্যে বিলীন হয়ে যান এবং তাঁরই স্মৃতিতে হুসেন এই ছ-ঘন্টা ছবি আঁকা ও মুছে ফেলার কাজটা উৎসর্গ করবেন।

শান্তিপ্রসাদের, 'এ পেইন্টার অব আওয়ার টাইম' ছবিটার সঙ্গে আমি আবার যুক্ত হই প্রাথমিক সম্পাদনার পর্ব থেকে। প্রাথমিক সম্পাদনার পরে ছবিটার আরও কিছু শুটিং করা হয় দিল্লিতে আর দিল্লির এই দ্বিতীয় দফার শুটিঙে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এই শুটিঙের ভিত্তিতেই ছবিটার শেষাংশ নির্মিত। এই শেষাংশে দেখি যে তুঘলকাবাদ দুর্গের বিপুল ধ্বংসস্তূপের পরিপ্রেক্ষিতে হুসেন একটা চমৎকার ছবিকে মুছে ফেলছেন সাদা রং দিয়ে। এই মুছে ফেলার কাজটি সম্পন্ন করা হচ্ছে একটা বিশেষ ঢঙে, একটা বিশেষ স্টাইলে। মনে হচ্ছে বহুবর্ণ একটা ক্যানভাসের উপর সাদা রঙ দিয়ে নানা রকম নকশা আঁকছেন আর সেই সাদা নকশায় নকশায় ক্যানভাসের সমস্ত রঙের সম্ভার আস্তে আস্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, ক্রমশ পরিস্ফুট হচ্ছে সাদার এক অমোঘ শূন্যতা। দৃশ্যান্তর। দিল্লির অদূরে তুঘলকাবাদে মহাকালের স্বহস্তে সৃষ্ট মহান ধ্বংসস্তূপের উপর দিয়ে ছুটে চলেছেন হুসেন, মাথার উপরে দুহাতে তুলে ধরেছেন পরাক্রান্ত শূন্যতা, যেন সুদূর দিগন্তে উড্ডীন কোনও শ্বেত বলাকা। তারপরে পর্দার শূন্য শুভ্রতা।

১৯৯২-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি। রুশি মোদির সংক্ষিপ্ত সম্ভাষণ। তারপরে নীল পোশাকে শোভিত স্বয়ং হুসেন স্মরণ করলেন শান্তিপ্রসাদ চৌধুরীকে। শিল্প যতক্ষণ চোখের সামনে আছে ততক্ষণ সেটা ঘটনামাত্র, যখন দৃষ্টির গভীরে ডুবে মিলিয়ে যায় তখন তা রূপান্তরিত হয় সমস্ত মানুষের জন্যে আরও সত্য স্মৃতিতে, পরিণত হয় পৌরাণিক আখ্যানে। দর্শকদের দিক থেকে হুসেন ঘুরে দাঁড়ালেন বিগত ছ-দিন ধরে আঁকা ছবিগুলোর দিকে। জ্বলে উঠল আলো। শুরু হল বাদ্য। শিল্পী তুলে নিলেন হাতিয়ার।

বেঠোফেনের তীব্র উন্মাদনায় ভরা সপ্তম সিম্ফনির তরঙ্গে তরঙ্গে হুসেন দিচ্ছেন তুলির মার, কখনও পুরুষ্ট সাদা রেখাটিকে বেঁকিয়ে দুমড়ে দিচ্ছেন, কখনও ঘুরিয়ে দিচ্ছেন চক্রাকারে, কখনও বনস্পতির সবল বাহুর মতো ছড়িয়ে দিচ্ছেন সাদা, কখনও লতার মতো লতিয়ে দিচ্ছেন। একটা সম্ভাবনা যেন রূপ নিচ্ছে, অমনই সেই সম্ভাবনাটাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন ওপাশের কোনও একটা ক্যানভাসে নতুন কোনও সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলতে এবং সেটাকে ফুটিয়ে তুলে আবার ফিরে আসছেন ছেড়ে যাওয়া আগের ক্যানভাসটার মধ্যে নিহিত গোপন সম্ভাবনার কাছে। তাঁর পদক্ষেপ ঘরের মধ্যে জেগে উঠেছে তীব্র উত্তেজনা, সঞ্চারিত হচ্ছে বিদ্যুতের মতো অদৃশ্য শিহরণ। আবার কখনও ছবির এক-একটা অপূর্ব অংশের নিমজ্জনে ভিড়ের ভিতর থেকে শোনা যাচ্ছে আক্ষেপের প্রকাশ। হুসেনের ভ্রূক্ষেপ নেই। উত্তাল সুনীল তরঙ্গের মতো তিনি বারবার আছড়ে পড়ছেন তাঁরই নির্মাণ করা প্রাচীরের উপর। 'ওরে চারিদিকে মোর এ কী কারাগার ঘোর, ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা আঘাতে আঘাত কর্।' ভেঙে পড়ছে রং-এর প্রাচীর, ভাঙনের ফাঁকে কখনও সাদায় ফুটে উঠছে নারী রূপের সম্ভাবনা, কখনও সাদা রেখার দৃপ্ত অঙ্গের ক্ষিপ্ত স্কন্ধ, কখনও কেশরে শ্মশ্রুতে সিংহ বা স্বয়ং হুসেনের প্রতিকৃতির সম্ভাবনা। করাল শুভ্রতার গর্ভে ডুবে যাচ্ছে রঙরূপের আশ্চর্য গৌরব।

মুছে ফেলা নয়, নতুন করে আঁকা। বিনাশ নয়, বিন্যাস। বিলোপন নয়, নবসৃজন। প্রকৃতপক্ষে প্রক্রিয়াটা একই। থেমে গেল সংগীত। সমস্ত মূর্তির নিমজ্জনের পরেও সার্বভৌম শুভ্রতার উপরে ভেসে থাকল আদরের শিশু গণেশটি। তাই দেখে শিল্পী একটু হাসলেন। তাঁর তুলির স্পর্শে গণেশও ডুবে গেল শুভ্রতার কালগর্ভে।

স্মরণে

সত্যজিৎ রায়

সদ্য প্রয়াত সত্যজিৎ রায় স্মরণে কলকাতা থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলিতে ইতিমধ্যে অজস্র লেখা ছাপা হয়েছে। আমাদের আর নতুন করে সংযোজন করার মতো তেমন কিছু নেই। সত্যজিৎ রায় যখন বিশ্ববরেণ্য হয়ে ওঠেন নি চতুরঙ্গ পত্রিকার সঙ্গে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। প্রথম দিকে এই পত্রিকার প্রচ্ছদ পৃষ্ঠার রূপকার ছিলেন তিনিই। সেই সময় সিনেমা বিষয়ক তাঁর কিছু কিছু আলোচনাও এই পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। পথের পাঁচালী ছবিটি মুক্তিলাভের পর পৃথিবীর চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এই যুগান্তকারী ছবির স্থান নিয়ে বিতর্ক যখন যথাযথ সিদ্ধান্তে পৌঁছায় নি, সেই সময়ই চতুরঙ্গের পৃষ্ঠায় এই পথের পাঁচালীকে কেন্দ্র করে চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ রায়ের অবদান সম্বন্ধে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত সম্বলিত একটি অনবদ্য আলোচনা ছাপা হয়েছিল। বাঙলা ১৩৬২ সালে ত্রৈমাসিক চতুরঙ্গের শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা থেকে চিদানন্দ দাশগুপ্ত লিখিত সেই আলোচনাটি অবিকল পুনর্মুদ্রিত করে প্রয়াত বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্রকার এবং সাম্প্রতিক কালে বাঙালির গর্ব সত্যজিৎ রায়ের প্রতি আমরা অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করছি।

"পথের পাঁচালী" ও তারপর

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

শুনেছি ১৯৫২ সালের চলচ্চিত্র-উৎসবের পর আমাদের দেশে বাইসিক্‌ল নিয়ে হিন্দী ছবি হয়েছিল, কিন্তু তা নাকি "বাইসিক্‌ল থীফ"-এর মতো হয়নি। তাই "পথের পাঁচালী"র পর কী হবে তা নিয়ে চিন্তিত হতে হয়। আরো চিন্তার কারণ এইজন্য যে "পথের পাঁচালী"র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সর্বত্র, কিন্তু তার কোনো অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা নেই। প্রথম দিকে বিভিন্ন কাগজে "পথের পাঁচালী"-র সমালোচনা পড়ে মনে হয়েছিল যে এক আচমকা আঘাতে লেখকেরা যেন দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছেন। সারা পৃথিবীর চলচ্চিত্রের আসরে ভারতের স্থান নিয়ে এঁরা পূর্বে বিশেষ বিস্তৃত ছিলেন বলে বোধ হয়নি, কিন্তু লেখা পড়ে দেখা গেল এখন সেটাই তাঁদের আসল বক্তব্য। মনে আছে অনেকে অন্যান্য দেশের টিকি লেজ ইত্যাদি নিয়ে নানাপ্রকার টানাটানি করেছিলেন। অন্ধের হাতী দেখার গল্প অনেকেই অবগত আছেন। লেজ ও শুঁড়ের পার্থক্য না জেনে হাতীর লেজ টানতে যাওয়ার কিছু কিছু অসুবিধা আছে। পৃথিবীর চলচ্চিত্রের ইতিহাসে "পথের পাঁচালী"র স্থান কী সে বিষয়ে মতামত দিতে গেলে সেই ইতিহাস কী তা জানা প্রয়োজন।

আমাদের দেশের চলচ্চিত্রেরো ইতিহাস আছে। তার মধ্যেই বা "পথের পাঁচালী"র স্থান কোথায়? তৃতীয়বার এই ছবি দেখতে যাবার সময় বোম্বাই-এর এক মারোয়াড়ী প্রযোজককে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। লোকটি দু'তিনটে পাশ বটে, কিন্তু প্রযোজনার ব্যাপারে আর পাঁচজনের মতোই, প্রযোজিত ছবিও আর পাঁচটি বোম্বাই-মার্কা ছবির সহোদর, "পথের পাঁচালী"র মতো বৈমাত্রেয় নয়। যা হোক, ছবি দেখবার আগে ইনি পথে যা বললেন তা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য : ক'টা গান আছে? কিন্তু পরে যা বললেন তা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য : (১) এ ছবি কী করে হল তা তিনি ভেবে পান না; (২) এ ছবি কী করে দর্শকের মনোমতো হল তা-ও তিনি ভেবে পান না, (৩) "পথের পাঁচালী"র সঙ্গে ভারতীয় কোনো ছবির মিল নেই, সম্পূর্ণ নতুন, এবং অত্যন্ত ভালো ছবি।

এই প্রযোজকের মতো আমারো মনে হয় "পথের পাঁচালী"র সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে, কী করে এ ছবি সম্ভব হল। জনশ্রুতি এই যে তারাশঙ্কর সজনীকান্ত প্রমুখ ন'জন সাহিত্যিক দশখানা টিকিট কেটে "পথের পাঁচালী" দেখতে গিয়েছিলেন—বাড়তি টিকিটখানা 'দেবযান'-এর লেখকের জন্য। যা হোক, তাঁরাও নাকি প্রশ্ন তুলেছিলেন বাংলা দেশের গ্রামের সঙ্গে এত নিবিড় পরিচয় সত্যজিৎ রায়ের কী করে হল? অন্যত্র এ-প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছি যে বাংলা দেশ "পথের পাঁচালী" ছবিতে এত ভালোভাবে ফুটেছে তার কারণ এই যে

পশ্চিমী শিল্পব্যাপারে সত্যজিতের দখল অসাধারণ। রেনোঁয়ার ভাষায় "Satyajit's knowledge of things European is fantastic."

"পথের পাঁচালী" সম্ভব হল তার কারণ এর নির্মাতাদের ভারতীয় চলচ্চিত্রের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না। আরো কারণ এই যে তাঁদের অনেকেরই চলচ্চিত্রের সঙ্গে হাতে কলমে পরিচয় ছিল না। অর্থাৎ অন্য সমস্ত শিল্পের মতো চলচ্চিত্রেরো আসল মূলধন কল্পনা; যন্ত্রপাতিটা বাইরের ব্যাপার যেটা যে কোনো বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে শিখে নেওয়া কঠিন নয়। ভাষা যে কেউ শিখতে পারে, কবিতা যে কেউ লিখতে পারে না। চলচ্চিত্র মহলের বাইরে থেকে "পথের পাঁচালী"র শিল্পীরা এই মাধ্যমের চর্চা করতে পেরেছেন, মুদ্রাদোষ শিখবার সুযোগ পাননি। ভারতীয় চলচ্চিত্রের কূপমণ্ডুক আত্মপরিতৃপ্তির বাইরে থেকে তাঁরা চলচ্চিত্রের ইতিহাস ও আঙ্গিককে রপ্ত করেছেন। ভারতীয় সাহিত্যিক সাহিত্য পড়েন, কবি কাব্য পড়েন, চিত্রকর ছবি দেখেন, কিন্তু চলচ্চিত্রকর চলচ্চিত্র দেখেন না। গত পঞ্চাশ বছরে পৃথিবীতে চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলির মধ্য দিয়ে একটা ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, মহত্বে, বিশ্বমানবিকতায় শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র এযুগের অনেক অন্যান্য শিল্পকে হার মানায়। সেই ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় হলে চলচ্চিত্রের মর্মকে বোঝা যায়, কোনো বিশিষ্ট প্রভাবকে এড়িয়েও সমস্ত প্রভাবের যুক্ত ফলের মধ্য দিয়ে পরিণত সৃষ্টি করা যায়, যেমন হয়েছে "পথের পাঁচালী"তে। প্রথম মেঘডাকা থেকে আরম্ভ করে দুর্গার জলে ভেজা পর্যন্ত "পথের পাঁচালী"র প্রকৃতি পর্যায়ে একটি ছন্দোময় সুর আছে, সে সুর একান্তভাবে চলচ্চিত্রের, একান্তভাবে শিল্পীমনের। "পথের পাঁচালী"র অভিনবত্ব এতে নয় যে তাতে মেক্-আপের ব্যবহার নেই, বা স্টুডিওর ব্যবহার প্রায় নেই, বা ভারতীয় সঙ্গীতের ব্যবহার আছে, বা তাতে নতুন নটনটী। অভিনবত্ব এইখানে যে তাতে ভারতীয় চলচ্চিত্রে এই প্রথম সম্পূর্ণ চলচ্চিত্রধর্মী শিল্পীমনের পরিচয়। জীবনানন্দ দাশের একটি স্মরণীয় উক্তি আছে: 'সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি।' এটা সাহিত্যে যেমন সত্য, চলচ্চিত্রেও তাই।

সেজন্য কেবল লক্ষণ বিচার করে "পথের পাঁচালী"র কোনো ফল আমাদের চলচ্চিত্রে বর্তাবে না। অর্থাৎ ক্যামেরা হাতে বর্ষার দিনে বোড়ালে ছুটলেই "পথের পাঁচালী" হবে না। চলচ্চিত্রকে শিল্প বলে মানতে হবে। অনেক প্রতিভাবান সাহিত্যিক চলচ্চিত্রে যোগ দিয়ে সাহিত্য ও চলচ্চিত্র দুয়েরই সমূহ সর্বনাশ করেছেন। চলচ্চিত্রকরকে চলচ্চিত্রের শিল্পী হতে হবে। যে শিক্ষার মধ্য দিয়ে সম্ভাব্য চলচ্চিত্রশিল্পীর মনের পরিণতি হতে পারে সেই শিক্ষা প্রয়োজন। অর্থাৎ আমাদের চলচ্চিত্রকে সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের সঙ্গে পরিচিত করতে হবে। নতুন শিল্প হলেও বিভিন্ন ভাষায় একটি চলচ্চিত্র-সাহিত্য গড়ে উঠেছে। চলচ্চিত্রের অনেক সমালোচনা সাহিত্য-পদবাচ্য হয়েছে, সে-সব পড়ে আনন্দ পাওয়া যায়। সার্থক সাহিত্যের সঙ্গে-সঙ্গে যেমন সার্থক সাহিত্য-সমালোচনা গড়ে ওঠে, এও তেমন, এই চলচ্চিত্র-সাহিত্যের অনুবাদ প্রকাশিত হলে, বিশ্ব-চলচ্চিত্রের সম্যক চর্চা হলে এদেশে চলচ্চিত্রের মান অনেক উন্নত হবে, নতুন শিল্পীর দেখা মিলবে। চলচ্চিত্রের ইতিহাসে দেখা যায় যে একটি বিশেষ দেশ কাল ও জাতির মনকে প্রকাশ করেই বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র শ্রেষ্ঠ স্তরে স্থান পেয়েছে। বিপ্লবোত্তর রুশ চলচ্চিত্রের মন আর যুদ্ধোত্তর ইতালীর চলচ্চিত্রের মনে অনেক প্রভেদ। মার্কিন চলচ্চিত্রের আদিযুগের আর বর্তমান জাপানী চলচ্চিত্রের মেজাজ আলাদা। এখানেও সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের কোনো প্রভেদ নেই, কেননা সার্থক শিল্পমাত্রেই বিশেষ দেশকালকে প্রকাশ করার ফলে বিশ্বজনীন হয়। আমাদের চলচ্চিত্র ভারতীয় মনকে প্রকাশ করে না কারণ তা শিল্প নয়, তা একই সঙ্গে কূপমণ্ডুক এবং নকলনবীশ, তার নিজস্ব প্রকাশযোগ্য কোনো বার্তা নেই। তাই তার বার্তা কোথাও পৌঁছয় না। মাইকেল বিদেশে গিয়ে স্বদেশকে চিনেছিলেন, রামমোহন পাশ্চাত্যশিক্ষার মধ্য দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর নবযুগের সৃষ্টি করেছিলেন, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংঘাতের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথের মহামানসের উদয়, ব্যালে নাচ শিখে উদয়শঙ্কর ভারতীয় নৃত্যশিল্পে নবজাগরণ আনেন, পশ্চিমী শিল্পকলা মন্থন করেই যামিনী রায় পোটো। চলচ্চিত্রের জন্ম পশ্চিমের ঘরে; পশ্চিমী চলচ্চিত্রের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হয়েই "পথের পাঁচালী"র পরিচালক বাংলাদেশকে নিবিড়ভাবে অনুভব করেছেন। এটাই "পথের

পাঁচালী"র শিক্ষা, এবং এই শিক্ষা ভারতীয় চলচ্চিত্রের মর্মস্থলে পৌঁছলে তবেই "পথের পাঁচালী'র সার্থকতা।

সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র চিন্তা ও অন্যান্য ভাবনা

অসীম রেজ

বিশ্ববরেণ্য, বিদগ্ধ, বুদ্ধিজীবী চলচ্চিত্রকার, লেখক ও শিল্পী সত্যজিৎ রায়ের চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী ঐতিহ্যের এক বিশাল অধ্যায়ের সমাপ্তি হল। বাঙালীর নবজাগরণের তিনিই বোধহয় ছিলেন শেষ উত্তরাধিকার। অন্যভাবে বলা যায় সার্থক রবীন্দ্র উত্তরাধিকারের এখানেই সমাপ্তি। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীর অসংখ্য বিষয়ে অদম্য কৌতূহল, স্বদেশ ও তার মাটিকে চেনার তীব্র তাগিদ, সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, ধর্ম, রাজনীতি ও সমাজকে সমন্বয় সূত্রে দেখার দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকে অন্য সবার থেকে একক ও অনন্য করেছে। আর তারই সার্থক পরিণতি হিসেবে আমরা রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছি, পেয়েছি সত্যজিৎকে এর শেষতম সংযোজন হিসেবে। অন্য সবার থেকে সত্যজিৎ রায় অনেক বেশি দুঃসাহসিক কাজ করেছিলেন। মন ও মনন চর্চার ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন এমন এক মাধ্যমকে যা সাধারণ শিক্ষিত বাঙালী মনে প্রাণে তখনও ঠিক সঙ্গীত, চিত্রকলা বা সাহিত্যের মতো শুদ্ধ শিল্পরূপ হিসেবে মেনে নিতে সংশয় ও দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন।

চলচ্চিত্র এই শতাব্দীর একটি নতুন মাধ্যম ও অন্যান্য মাধ্যমের উপর সে সর্বদাই নির্ভরশীল ও তার টেকনিকাল সীমাবদ্ধতার কথা মনে রেখেই হয়ত-বা ঐ সংশয়, ঐ দ্বিধা। তবু তাদের কৌতূহলের অন্ত ছিল না। সারা বিশ্বজুড়ে চলচ্চিত্রের অপ্রতিরোধ্য গতি, তার নির্মাণ কৌশলে সর্বদা ক্রিয়াশীল চমৎকারিত্ব, তার নতুন ভাষা, নতুন অর্থ যেন আমাদের দেখার দৃষ্টিকে বারবার আঘাত করছিল, আমাদের নতুনভাবে এই মাধ্যম নিয়ে ভাবতে বাধ্য করছিল। তাই প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল চলচ্চিত্র চর্চার।

পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে তাই ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সূত্রপাত, বিদেশী সিনেমা দেখার নেশা, কোন একটি ফিল্ম নিয়ে তর্কবিতর্কে নেমে পড়া আমাদের স্বভাবসিদ্ধ হয়ে উঠছিল। এই আবহাওয়ায় বড় হয়ে উঠেছিলেন সত্যজিৎ রায় কলকাতায়; তাঁর একমাত্র প্রিয় শহর এই কলকাতা। আর তিনি যেন এই শহরের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগ খুঁজে পেয়েছিলেন, বাঙালীয়ানার হৃদস্পন্দনকে যেন এখানেই ধরতে পেরেছিলেন। সত্যজিৎ রায়ের কলকাতা প্রীতি তাই আজ কিংবদন্তীর মতো। এই শহরের অজস্র সৃজনমূলক কাজের মধ্যে সর্বদা তাঁর জড়িয়ে থাকা, ফিল্ম সোসাইটির আন্দোলন গড়ে তোলা, রাস্তার ধার থেকে পুরনো বই খুঁজে বের করা, বিদেশী রেকর্ড সংগ্রহ করা, রাত জেগে গান শোনা, বই বা পত্রিকার জন্য প্রচ্ছদ বা ছবি এঁকে দেওয়া, এমন অসংখ্য ভালো লাগা কাজের ভিতর তাঁর সদাব্যস্ত চেহারাটি তাঁর তোলা কলকাতা-কেন্দ্রিক বেশ কিছু ছবিতে (যেমন 'মহানগর', 'অপুর সংসার', 'জনঅরণ্য', ' সীমাবদ্ধ' ইত্যাদি) যেন বার বার ফুটে উঠেছে। তাই কলকাতা আর কলকাতার মধ্যে থাকে না। গড়পার, বকুলবাগান, বেলতলা, বিশপ লেফ্রয় রোড ছাড়িয়ে কলকাতা চলে যায় বিশ্বের নগর, মহানগরীতে। কলকাতার অসাধারণ সৌন্দর্যকে তিনি লেন্সের চোখ দিয়ে আবার নতুন করে দেখতে শেখালেন।

ঠিক কোন খান থেকে শুরু করেছিলেন তিনি, তার ভাবনা দানা বেঁধে একটা রূপ নিতে চাইছিল আমরা জানি না। শুধু ধরে নিতে পারি বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ নেবার আগে পর্যন্ত তিনি শিখছেন, চিনছেন, জানছেন। বিজ্ঞাপনের জগৎ 'ভিজুয়ালাইজেশান' ও 'ইলাস্ট্রেশানে'র নতুন দিগন্ত খুলে দিল তাঁর চোখের সামনে। একটা 'আর্ট ওয়ার্ক' তৈরি করার পিছনে যে কত অসংখ্য চিন্তাভাবনা কাজ করে তা পেশাজীবি শিল্পীরা ভালভাবে জানেন।

ডি জে কিমারে কাজ করার সময় যে শিল্পী মানুষটির তিনি খুব কাছাকাছি ছিলেন তিনি হলেন আমাদের অনেকেরই 'মুন্সীজি' (শিল্পী অন্নদা মুন্সী) সত্যজিৎ রায়ের

অক্ষরলিপির উপর আশ্চর্য ঝোঁকের কথা তাঁর কাছ থেকে শুনেছি। সম্ভবত সত্যজিৎ রায়ের নতুন অক্ষরলিপি তৈরির পিছনে মুন্সীজির অনুপ্রেরণা গভীর ভাবে কাজ করেছিল। দু'জনের অক্ষরলিপির মধ্যে আমরা এক আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করি।

শুধু অক্ষর লিপিই নয় চলচ্চিত্র তৈরির পাশাপাশি অজস্র বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ও নতুন কিছু পাওয়ার চেষ্টা প্রথম থেকেই চলতে থাকে। তিনি বলেছেন, "আমি এখনও আঁকি। আমার নিজস্ব পত্রিকা আছে 'সন্দেশ' তার জন্যে নিয়মিত ছবি আঁকতে হয়। তারপর আমি লিখি যেটা আপনি নিজেই বললেন। আমি গল্প লিখি এবং আমার ছবির জন্যে চিত্রনাট্য লিখতে হয়। তাছাড়া গানবাজনার আমার ছোট বেলা থেকে শখ। সংগীত রচনাও আমাকে করতে হয়। ছবির জন্য আবহসংগীত লিখি ও ছবির জন্য গান লিখেছি ও গানের কথা লিখেছি, গানে সুর দিয়েছি ইত্যাদি। সত্যি বলতে কি ছবি করার সঙ্গে সঙ্গে আমি অন্যান্য কাজগুলোও ছবি করার তাগিদে কিছুটা আর কিছুটা তার বাইরেও চালিয়ে যাচ্ছি।..... আমি নানারকম ব্যাপারে উৎসাহিত হয়ে পড়েছিলাম — অক্ষরের ব্যাপার, লিপির ব্যাপার, টাইপোগ্রাফির ব্যাপার। এগুলোয় তখন আমার উৎসাহ হয়েছিল। তাছাড়া তখনই আমি সিগনেট প্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলাম তাঁদের জন্যে বইয়ের মলাট আঁকা, ছবি আঁকা এই কাজগুলো তখন বিজ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে করতাম।"

আমরা তাঁর ছবির মধ্যে যে অসাধারণ টেকনিক্যাল ফিনিশ দেখি, 'প্রফেশনালিজমে'র চূড়ান্ত নিদর্শন দেখি তাঁর পিছনে নিঃসন্দেহে সৃজনমূলক অসংখ্য বিষয়ে কৌতূহল ও তা নিয়ে সর্বদা নতুন নতুন ভাবনাচিন্তায় ডুবে থাকার একাগ্র সাধনা নিশ্চিত কাজ করেছিল। তিনি কর্মাশিয়াল ওয়ার্ল্ডের গুণাগুণকে অস্বীকার করেন নি; বরং তার অজস্র অভিনবত্বকে ছাঁকনীর মতো তুলে এনে কাজে লাগিয়েছিলেন।

শান্তিনিকেতনের আবহাওয়ার তার শিল্পকলার প্রতি ভালবাসা বেড়েছিল। আড়াই বছর শান্তিনিকেতনে থেকে যে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও তার শিল্পকর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয় তিনি হলেন বিনোদবিহারী মখোপাধ্যায়। তাঁকে নিয়ে সত্যজিৎ রায় একটি ডকুমেন্টারি তৈরি করেছিলেন ('ইনার আই')। ভারতশিল্প তথা লোকশিল্পের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার কথা আমরা জানতে পারি 'টেম্পলস অফ্ বেঙ্গল' খ্যাত অধ্যাপক ডেভিড ম্যাকাচিওনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদিত সত্যজিতের অসাধারণ দুটি রচনার মধ্যে (এটি 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল)। শিল্পকলা ছাড়া পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, মাইথলজি, জ্ঞানের এমন অজস্র শাখায় তাঁর স্বচ্ছন্দ গতিবিধি ছিল। আর তাঁর পরিশীলিত মননচিত্র পিছনে এগুলির দানও কম ছিল না।

শিল্পকলা থেকে তিনি নিয়েছিলেন ফর্মের শিক্ষা। চিত্রকলা আলোছায়ার খেলা তাঁর শিল্পের একটি অসাধারণ উপাদান। ফরাসী ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রকলার প্রতি তাঁর তীব্র ভালোবাসা বোঝা যায় যখন তিনি তাঁর বিভিন্ন চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাপটে মনে, মানে বা রেনোয়ারের ছবির পারস্পেকটিভকে কাজে লাগান। 'পথের পাঁচালী'; 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'; বা 'চারুলতা'র মতো অসংখ্য ছবিতে ডিটেলসের কাজ দেখলে মনে হয় যেন আমাদের মিনিয়েচার ছবির ঢঙে ছোট ছোট আচঁড়ে সব বাস্তুয় করে তুলছেন। আশ্চর্য পর্যবেক্ষণ শক্তি ছিল তাঁর। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন "ভারতীয় চিত্রশিল্পেও এই ডিটেলের ঐতিহ্য অনেকদিন অটুট ছিল। বাঘ অজন্তার গুহায় এর নমুনা আছে। মুগল-রাজপুত মিনিয়েচার ছবিতে আছে। ন্যাচারেলিজম এর পথে না গিয়েও কীভাবে মানুষ ও প্রকৃতির ভাব কেবলমাত্র ডিটেলের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা যায়, তার চমৎকার দৃষ্টান্ত এসব ছবিতে আছে। আকাশের উপর মাত্র পাঁচ-সাতটি সমান্তরাল নিম্নগামী ফোঁটার লাইন কেটে মিনিয়েচার-শিল্পী বৃষ্টি বুঝিয়েছেন; কেবলমাত্র নায়িকার উত্তরীয়ের উত্তালভঙ্গীতে ঝড় বুঝিয়েছেন; প্রেম বিরহ আনন্দ বিষাদ ক্রোধ লজ্জা ঈর্ষা ইত্যাদি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনের ভাব শুধুমাত্র দেহের ভঙ্গিমার ডিটেলে বুঝিয়ে দিয়েছেন। (বিষয় চলচ্চিত্র, সত্যজিৎ রায়, পৃষ্ঠা ৫৭)।

সত্যজিৎ এইভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পের মেজাজটাকে তাঁর ছবিতে কাজে লাগিয়েছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পের এমন সমন্বয়ের প্রশ্ন ওঠে আবার তখনই যখন তাঁর চলচ্চিত্র সংগীতের প্রসঙ্গ আসে। ফর্মের

দিক দিয়ে আবার তিনি চলচ্চিত্রে সংগীতের মধ্যে চরিত্রগত এক আশ্চর্য মিল খুঁজে পান। তাঁর কথায় "মূলত একটি ভীষণ মিল আছে চলচ্চিত্র ও সংগীতে।..... ফিল্মে একটা অন্ধকার ঘরে যখন আপনাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল তখন ঐ দেড় ঘন্টা ধরে পুরোটা চলার পরে ঐ একবারের মধ্যেই আপনাকে পুরো জিনিসটা বুঝে ফেলতে হচ্ছে। সেরকম সংগীতও। একটা রেকর্ডের ওপর আপনি যখন নিডলটা রাখলেন যতক্ষণ না রেকর্ডটা শেষ হচ্ছে, একটা নির্দিষ্ট সময় সেই সময়ের মধ্যে তার বিস্তৃতি, তার ফর্ম। এই ফর্মটাই হচ্ছে একটা সময়ের মধ্যে বিস্তৃত একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিস্তৃত যেটার এদিক ওদিক করার উপায় নেই। সংগীত যেরকম চলচ্চিত্রও সেরকম। একটা ভীষণ মিল রয়েছে। কাজেই সংগীতে যেমন ছন্দের প্রয়োজন চলচ্চিত্রেরও তেমনি ছন্দের প্রয়োজন। একেবারে হয়ত সরাসরি মিল দেখাতে গেলে মুস্কিল হবে, কেননা সংগীত গল্প বলে না, চলচ্চিত্র গল্প বলে। কিন্তু একটা অন্তর্নিহিত ছন্দোবদ্ধতা ফিল্মের মধ্যে রয়েছে।" তাঁর মতে ছবি যদি সাংগীতিকগুণে (অর্থাৎ ছন্দ, গতি, কনট্রাস্ট ইত্যাদি) বিশেষ সমৃদ্ধ হয়, তাহলে সে গুণ বিষয়বস্তুর মামুলিত্ব ছাপিয়ে শিল্পের স্তরে উন্নীত হতে পারে।

কলেজের জীবন থেকেই, ধ্রুপদী সংগীতের প্রতি তাঁর আগ্রহ ও ভালবাসা জন্মায়। বেটোফেন, মোৎসার্ট, বাখ, হাইডেনের বাজনার রেকর্ড শোনার পাশাপাশি চলেছিল হাফিজ আলী, আলাউদ্দিন, ফৈয়জ খাঁ বা বড়ে গোলাম আলীর গান রাত জেগে শোনা। আর পরবর্তী জীবনে চলচ্চিত্রে তারই প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। মানবিক অভিব্যক্তির আশ্চর্য আবেকময় মুহূর্তগুলি তিনি সংগীতের অসাধারণ ব্যঞ্জনায় বিধৃত করেছেন। অনেক ছবির স্মরণীয় মুহূর্তে কথার বদলে তিনি কেবল সংগীতের সাহায্য নিয়েছেন। যেমন 'পথের পাঁচালী'তে হরিহর দুর্গার শাড়িটা যখন এনে দিচ্ছে তখন সর্বজয়ার কান্না—সেখানে কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে না শুধু সংগীতের শব্দ। এই সংগীতের বিরল মূর্ছনাটি সৃষ্টি করেছিলেন পণ্ডিত রবিশংকর।

তাঁর চলচ্চিত্রে সংগীতের এমন বিস্ময়কর ব্যবহারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে তাঁর চলচ্চিত্রে ভাষার প্রসঙ্গটি। সাহিত্য, শিল্প, সংগীতের মতো চলচ্চিত্রের একটি নিজস্ব ভাষা আছে। পর্দায় এ ভাষা গড়ে ওঠে ইমেজ, ধ্বনি ও সংলাপের মধ্যে দিয়ে। যে কোন ভাষার ফাংশন্যাল দিকের পরেও যে আর্টের দিকটা আছে যেখানে ভাষার মাধুর্য, ভাষার ঋজুতা, ভাষার চটক ইত্যাদির প্রশ্নগুলির দিকে তিনি আমাদের সচেতন করে তোলেন। অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের মতো চলচ্চিত্রে তাঁর ভাষা এক নতুন মাত্রা পায়। ঐ ভিসুয়াল ল্যাংগুয়েজ অনেক সময় সাংকেতিক বা প্রতীকী ব্যঞ্জনায় ধৃত হয়ে নতুন নতুন অর্থের দ্যোতক হয়ে ওঠে। 'পথের পাঁচালী', 'নায়ক', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা', 'চারুলতা', 'অশনি সংকেত' বা যে কোন ছবিই হোক না কেন। তাই হয়ত একবার দেখে তাঁর, ছবি বুঝে ওঠা কঠিন হয়ে পড়ে। তাঁর ছবির এক একটা দৃশ্যের নানান অর্থ নিয়ে আমরা তর্ক জুড়ি।

তাঁর ছবির এমন 'দুর্বোধ্যতা'র প্রসঙ্গটি তুললে (বিশেষ করে 'কাঞ্চনজঙ্ঘার' কথা মনে রেখে) তিনি তা সরাসরি অস্বীকার করেন। বরং তিনি বলেছেন যে আমাদের ছবি দেখার প্রথাগত অভিজ্ঞতাকে একটু পাল্টে দিতে চেয়েছেন। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি "আমার মনে হয় 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবিটা যখন মুক্তি পায় তখন সাধারণের গ্রহণের পথে কতকগুলো বাধা সৃষ্টি করে। কারণ সাধারণ লোকে যাতে অভ্যস্ত একজন কেন্দ্রস্থ চরিত্রকে তারা অনুসরণ করতে চায়, তাদের সঙ্গে মেলাতে চায়, তার কি ঘটছে না ঘটছে, কি নাটকের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, কি দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে সে চরিত্র এগোচ্ছে, এটাই তারা লক্ষ্য করতে ভালবাসে। কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘায় একজন কোন কেন্দ্রস্থ চরিত্র নেই, এখানে পুরো ফিল্মটাই কেন্দ্র। সেই জন্যে মানুষের বা দর্শকের উৎসাহটা ভাগ হয়ে যাচ্ছে সেটাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। এমন একটা নতুন কিছু করার চেষ্টা যেখানে একজন কেন্দ্রস্থ চরিত্র আমি স্মরণ করব না, সেখানে একটা ফিল্মই হবে কেন্দ্র।" এমন চিন্তাভাবনার পিছনে ফরাসী পরিচালক জাঁ রেনোয়ারের তিনি খুব কাছাকাছি ছিলেন বলে মনে হয়। রেনোয়ারের 'La Regle du Jen (Rules of the game) ছবিটিতেও কেন্দ্রস্থ চরিত্র বলে কিছু ছিল না।

তাঁর ছবিতে এমন নতুন ভাষা সৃষ্টির পিছনে যে

বহু বিদেশী চিত্রপরিচালকদের অভিজ্ঞতা কাজে লেগেছিল, একথা তিনি বহুবার জানিয়েছেন। তাঁর ছবিতে গ্রিফিথ, চার্লি চ্যাপলিন, জাঁ রেনোয়ার, কু রো সোওয়া, ডি সিকা, ক্রফো, বার্গম্যান, আন্তোনিওনি, বুনুয়েল, প্যাসোলিনি বা এমন অনেক বিশ্বশ্রুত চিত্রপরিচালকদের ঋণকে স্বীকার করতে তিনি কুণ্ঠা বোধ করেন নি। আবার তাঁর মতে এক একটি শট এক একটি বাক্য বা শব্দের মতো। কথার মতো শটের ভাষা। সেটা একান্ত ছবির ভাষা, দৃশ্যবস্তুর ভাষা। সেগুলো খণ্ড খণ্ড সাজিয়ে, খণ্ড খণ্ড দৃশ্যে ভাগ করে গোটা ছবিটা গড়ে তোলাই হল চিত্রপরিচালকের কাজ।

কে কেমনভাবে শিল্পীসুলভ দক্ষতার সঙ্গে চিত্র মাধ্যমটি ব্যবহার করছেন তার উপরই 'আর্ট ফিল্ম' হওয়া না হওয়া। তাঁর মতে সাহিত্যের মতো চলচ্চিত্র নানারকম হতে পারে। কিছুটা তা কাব্যধর্মী হতে পারে, কিছু একেবারে বাস্তবধর্মী হতে পারে, নানা রকম হতে পারে। অনেক তরুণ চিত্র পরিচালকদের মধ্যে 'ভীষণ একটা ব্যক্তিগত সংকীর্ণ একটা পদ্ধতি'কে তিনি কখনই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন নি। বরং শেষ পর্যন্ত ছবিতে গল্প বলারই তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। আর সেই গল্প বলার মধ্যেই কতকগুলো শিল্পসুলভ গুণের দিকে নজর দিয়েছিলেন। চলচ্চিত্রের মতো এই শিল্পমাধ্যমটিকে ঠিক শিল্পীসুলভ দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করার ভিতরই তিনি 'আর্ট' খুঁজে পেয়েছিলেন। চিত্রকলা বা সংগীতের মতো চলচ্চিত্রে 'বিমূর্তকরণ' (abstraction) সম্ভব নয় বলে তিনি মনে করতেন। তবে এই কাহিনী বলতে গিয়ে তিনি ছবিতে মনস্তত্ত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন। নরনারীর পারস্পরিক জটিল সম্পর্কের ক্ষেত্রে সরু সুতোর মতো তিনি যে নক্শা তৈরি করেন তার জটিল জাল খুলতে খুলতে আমরা দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে এগোই। তিনি বলেছেন "আমার জোরটা একটু মনস্তত্ত্বের দিকে। মনস্তত্ত্ব-তার সঙ্গে একটা চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা ; একটা চরিত্রকে এমনভাবে ফুটিয়ে তোলা যাতে দর্শকরা তাকে পুরোপুরি চিনতে পারে ; যাতে সে কী করছে না করছে, তার জীবনে কী ঘটছে না ঘটছে সে বিষয়ে মনে কৌতূহল জাগ্রত হয়।" প্রয়োজনে তিনি সংলাপ কমিয়ে এনেছেন। ছোটোখাটো ডিটেলসের মধ্যে দিয়ে। সাজেশানএর ভিতর মুড বা পরিবেশ সৃষ্টি করে, সংগীতে, ধ্বনি ও রঙের সূক্ষ্ম ব্যবহারে ও নৈঃশব্দের ভিতর তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মানবিক অনুভূতিগুলিকে কাব্যিক মেজাজে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর ছবির এই লিরিক্যাল মেজাজটির সংগে কবি জীবনানন্দ দাশ বা ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণের আশ্চর্য মিল খুঁজে পাই।

তাঁর ছবির একটি অসাধারণ দিক হল নারী চরিত্রগুলির সৃষ্টি। 'পথের পাঁচালী'র সর্বজয়া, চারুলতার 'চারু', অপুর সংসারে 'অপর্ণা' ঘরে বাইরের 'বিমলা', একে একে চরিত্রগুলি যেন সমগ্র নারী সত্তা নিয়ে, সমস্ত প্যাশন নিয়ে আমাদের সামনে জীবন্ত হয়ে উপস্থিত হয়েছে। কখনও বা তাঁর ছবিতে নারী মনের নিঃসঙ্গ মূহুর্তটিকে অত্যন্ত স্পর্শ কাতর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ছোটখাটো কয়েকটি ব্যঞ্জনার ভিতর। চলচ্চিত্রে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো সুখদুঃখ অনুভূতি কাব্যরূপ দেবার এমন তাগিদ বোধকরি বিশ্বের চলচ্চিত্রে বিরল। এখানে রবীন্দ্র উত্তরাধিকারের দার্শনিক প্রজ্ঞা প্রায় অনুপস্থিত, বরং এক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় লিরিক্যাল কাব্যের স্পন্দন খুঁজে পাওয়া যায়। তাই আইজেনস্টাইনের মতো তাঁর চলচ্চিত্র মহাকাব্যের বিস্তৃতি লাভ করে না , কারুকার্যমণ্ডিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের ভিতর আবদ্ধ থাকে।

আবার চিত্রভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে সংলাপকে তিনি একটি মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন "ফিল্মে সংলাপটাও একটা আলাদা ব্যাপার। সেটা নাটকের সংলাপও নয়, উপন্যাসের সংলাপও নয়। সংলাপ এমন একটা ব্যাপার যার একটা আলাদা ধর্ম আছে, তার চরিত্র আছে সেটা রপ্ত করতে কিছু সময় লাগে।" তিনি তাঁর চলচ্চিত্রের সংলাপগুলি এমন ভাবে তৈরি করেছেন যাতে চরিত্রগুলিকে চিনতে অসুবিধা হয় না। সংলাপ তৈরির ক্ষেত্রে তিনি বিভূতিভূষণের ঋণ স্বীকার করেছেন। তিনি জানিয়েছেন " বিভূতিভূষণের লেখার একটা গুণ হচ্ছে তিনি এমন সংলাপ লেখেন যেটা মনে হয় ঠিক একটা লোকের কথা আমি যেন কানে শুনতে পাচ্ছি। তাঁর কানটা এমনই আশ্চর্য ছিল। তিনি লোকের বাচনভঙ্গী এবং বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের ভেতর শব্দ চয়নে পার্থক্যটুকু খুব ভালো বুঝতে পারতেন।" তাই 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিতা' করতে গিয়ে তাঁকে

নতুন করে সংলাপ খুঁজতে হয় নি; অধিকাংশ সময় বিভূতিভূষণের থেকেই সংলাপ বসিয়ে দিয়েছেন। পরে ক্রমশ 'তিনকন্যা', 'দেবী', 'অভিযান'-এ সংলাপ বিষয়ে ভীষণ সচেতন হয়ে পড়েন। আর এই সংলাপ সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি মূল উপন্যাসের সংলাপের উপর নির্ভর করেন না ; বরং মূল উপন্যাস পড়ে এমনভাবে সংলাপকে বানান যাতে তা আমাদের অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য বোধ হয়। সংলাপ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "সংলাপের একটা ব্যাপার হচ্ছে শুধু যে গল্প বলা বা চরিত্র পরিস্ফুটনে সাহায্য করবে তা নয়, সেটা এমন সংলাপ হওয়া উচিত যেটা বলা সহজ হবে, যেটা কানে শুনলে মনে হবে হ্যাঁ, এই চরিত্র, এই রকমই কথা বলবে, এই বিশেষ অবস্থায় এই ধরনেরই কথা বলবে, ঐ শব্দ তারা প্রয়োগ করবে।" তবে ছবির প্রয়োজনে কোথাও কোথাও তিনি কথা বা সংলাপ কমিয়ে এনেছেন। তাঁর বহু ছবির শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলিতে কোন কথা না বলে কেবলমাত্র ছোট-ছোট কিছু ডিটেলসের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যেমন ইন্দির ঠাকুরানীর মৃত্যুর দৃশ্যে ঘটিটা গড়িয়ে যাওয়া।

চলচ্চিত্রের ভাষা তৈরির ক্ষেত্রে সংলাপ ছেড়ে যে উপাদানটি বিশেষ তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে তা হল রঙের ব্যবহার। রঙের কথায় তিনি বলেছেন যে ছবির অন্যান্য উপাদানের মতোই রঙেরও প্রধান কাজ হল কথা বলা, কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত নয় বা মূল বক্তব্যকে ব্যবহার করে নয়। রঙকে যদি চিত্রভাষার অঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করা যায়, তবেই রঙের সার্থক প্রয়োগ হয়। তাঁর মতে "কাহিনী বিন্যাস, চরিত্র ও পরিবেশ বর্ণন, নাট্যরস ও মুড সৃষ্টি, বা এমনকি নিছক তথ্য পরিবেশন যে রঙ একট বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম রঙের শিল্প সম্মত প্রয়োগ শুরু" (বিষয় চলচ্চিত্র, সত্যজিৎ রায়, পৃষ্ঠা ১১৫)। রঙ নিয়ে তিনি প্রথম পরীক্ষা করেছিলেন 'কাঞ্চনজঙ্ঘায়'। রঙ দৃশ্য, ধ্বনি বা সংলাপের মতোই অনেক তথ্য বহন করতে পারে। চরিত্র চিত্রণ, নাট্যরস সৃষ্টি, পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে রঙ যে কত সংবেদনশীল হয়ে উঠতে পারে তা তাঁর বহু ছবিতে দেখেছি। চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলি তুলে ধরার জন্যে তিনি রঙের সাহায্য নিয়েছেন, যেমন 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবিতে। তিনি বলেছেন "কাঞ্চনজঙ্ঘা'তেই সেটা আমি প্রথম পরীক্ষা করেছিলাম। এক একটি চরিত্র সেখানে যে পোশাকটা পরেছে সেটা লক্ষ্য করার বিষয়। বিশেষত সেই বিকেলটায় যেখানে পোশাকের কোন পরিবর্তন ছিল না। এক একটা গ্রুপকে যখন এক একটা করে দেখা যাচ্ছে-তাদের পোষাকের রঙের তারতম্যের ভিতর যেন সব ধরে রাখা হয়েছে। বাপ গম্ভীর মানুষ তিনি ধূসর রঙের স্যুট পরেছেন, তার পর তাঁর স্ত্রী লালপেড়ে শাড়ি পরেছেন—এ সমস্ত ব্যাপারে বাঙালীদের মনে কতকগুলো অনুরাগ জাগে। ছেলে সে কী বলব, একটা উৎশৃঙ্খল চরিত্রের, হালকা প্রকৃতির, সে একখানা নানা রঙের পুলওভার পরেছে ; তার চরিত্র তার থেকে ফুটে বেরুচ্ছে।" তাঁর মতে রঙের মধ্যে দিয়ে অনেক বেশি সংবাদ দেওয়া যায় যে কারণে অনেক সময় সংলাপ ব্যবহার না করলেও চলে। সাদা কালো ফটোগ্রাফিতে সাদা রঙ ও অন্য হালকা রঙের মধ্যে; বা কালো রঙ ও অন্য গাঢ় রঙের মধ্যে কোন তফাত করা প্রায় অসম্ভব। রঙের ছবির কথা বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন "গ্রাম্য প্রকৃতির নানান সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাময় ডিটেল যার প্রতি বিভূতিভূষণ বারবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—রঙ ছাড়া ছবিতে ধরা পরে না। মেঘ মুক্ত আকাশে রঙ প্রহরে প্রহরে বদলায়। কখনো বা গাঢ় নীল কখনো বা ফিকে, কখনো বা নীলের লেশটুকু চলে গিয়ে স্বচ্ছ সাদা, আবার সকাল-সন্ধ্যায় হলুদ, লাল, কমলা, বেগুনীর আভাস। প্রতিটি অবস্থায় মুড স্বতন্ত্র, প্রতিটি অবস্থায় ছবির বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ বিশেষ ভাব সঞ্চার করতে সক্ষম। কিন্তু এটা সম্ভব একমাত্র রঙে" (বিষয় চলচ্চিত্র, সত্যজিৎ রায়, পৃষ্ঠা ১১৬)। দুর্ভিক্ষের ছবি 'অশনিসংকেতে' রঙ ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক উঠলে তিনি জানান যে একদিকে দুর্ভিক্ষ ও অকাল মৃত্যু আর অন্যদিকে সুন্দর প্রকৃতির অবিকৃত উপস্থিতি — এমন এক বৈপরিত্যকে তুলে ধরাই ছিল এই ছবির শিল্পকথা। উপরন্তু তাঁর মতে, বিভূতিভূষণের এই উপন্যাসের বিশেষ বক্তব্যটি ছিল যে ১৯৪৩-এর মন্বন্তর ছিল কৃত্রিম ও মনুষ্যসৃষ্ট। এতে প্রকৃতির কোন পরিবর্তন ঘটে নি। প্রকৃতি তার প্রাচুর্য, তার সবুজ শ্যামল রূপ, ফুলফল

নিয়ে ছিল সুন্দর। প্রকৃতি ও মানুষের নিবিড় সম্পর্ক নিয়ে সত্যজিৎ বেশ কয়েকটি ছবি করেন যাতে ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রকলার রঙ ব্যবহারের তাৎপর্য বারবার ফুটে উঠে। চলচ্চিত্রের সঙ্গে চিত্রকলার একটা সম্পর্ক আছে মেনে নিয়ে তিনি 'শতকরা নব্বুই ভাগ ছবিতে ক্যামেরার দৃশ্যবস্তুর গতিশীলতা হেতু চিত্রকলার স্থির কম্পোজিশানের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকে না' বলে তিনি মনে করতেন।

সত্যজিৎ রায় তাঁর চলচ্চিত্রের নতুন নতুন ভাষা তৈরি করে আমাদের দেখার দৃষ্টিতে বারবার নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। এক একটা পর্বে এসে তিনি যেন হঠাৎই নিজেকে পাল্টে নিয়েছেন। তিনি কোথাও স্থির হয়ে থাকেন নি। আর এই নতুন ভাষা তৈরির তাগিদেই তৈরি করেছিলেন ফ্যানটাসিধর্মী ছবি 'গুপি গায়েন বাঘা বায়েন' বা 'হীরক রাজার দেশে।' পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সাহিত্যিক মেজাজটিকে তিনি যেন পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছিলেন। এমন ছবিতে ছড়া, নাচগান, বিচিত্র ধ্বনি, সংলাপ, পোশাক আশাক, দৃশ্যপট রচনা, চরিত্রগুলির পুতুলের মতো হাঁটাচলা, অঙ্গভঙ্গী, উদ্ভট আতিশয্য সৃষ্টি করে তিনি শুধু আমাদের অনাবিল হাসিরই খোরাক জোগান নি, আমাদের হাস্যকর, শিশুসুলভ, অর্থহীন অবস্থানটির দিকেও অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। একদিকে উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার রায়, অন্যদিকে চার্লি চ্যাপলিনের অভিজ্ঞতার মধ্য পথে দাঁড়িয়ে তিনি যে আধুনিক রূপকথা তৈরি করেছেন শেষ পর্যন্ত তা সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্যে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠে।

এই সব সৃষ্টির ব্যক্তি মানুষ সত্যজিৎ রায় ছিলেন ভয়ানক নিয়মনিষ্ঠ শৃঙ্খলাবদ্ধ, সুসংহত, একাগ্রচিত্ত, নিখুঁত ও নিয়ন্ত্রিত। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত, কল্পনাপ্রবণ, ভাবুক সচেতন মনটি যেন সর্বদাই সৃষ্টির ভিতর ক্রিয়াশীল ছিল। তাঁর পরিচ্ছন্ন, 'sophisticated' মনের পিছনে ছিল ব্রাহ্ম সমাজ ও তার পারিবারিক আবহাওয়া। সমস্যা জর্জরিত, জটিল, মেকী সমাজ জীবনে ধ্বস্ত, ভেঙে পড়া, মানবিক মূল্যহীন মানুষগুলোকে তিনি দেখেছিলেন একটু তফাৎ থেকে। হয়তবা তাঁকে এরই জন্যে গড়তে হয়েছিল একটা গাম্ভীর্যের বর্ম। তাই রাশভারী, গম্ভীর এই মানুষটির কাছাকাছি যেতে অনেকই ভয় করতেন। তাঁর শিক্ষা ও রুচি তৈরি করেছিল এক দূরত্বের দেওয়াল। কিন্তু তাঁর যারা কাছাকাছি ছিলেন তারা জানেন যে এই ধর্মের আড়ালে ছিল মানুষটির আসল রূপ-স্বতঃস্ফূর্ত, সহজ ও স্বাভাবিক। প্রকৃত অর্থে তাঁর কোন বন্ধু ছিল না, তিনি ছিলেন নির্জন ও একা। ব্যক্তি হিসেবে একক ও অদ্বিতীয়।

এই রচনার বেশিরভাগ উদ্ধৃতি লেখকের সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার থেকে নেওয়া। ১৯৭৯ সালে নভেম্বর মাসের শেষ দিকে 'হীরক রাজার দেশ' ছবিটির শুটিং চলাকালীন সময় আকাশবাণী শিলিগুড়ি কেন্দ্রের তরফে এই সাক্ষাৎকারটি গৃহীত হয়। ১৮ই জানুয়ারি, ১৯৮০ সালে আকাশবাণী শিলিগুড়ি কেন্দ্র থেকে এই সাক্ষাৎকারটি প্রথম প্রচারিত হয়। বর্তমানে এটি আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে সত্যজিৎ রায়ের অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিগত তিন বৎসর যাবৎ পত্র-পত্রিকার প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটা সত্ত্বেও আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম চতুরঙ্গ যাতে ব্যাপক শুভানুধ্যায়ীদের ক্রয়-ক্ষমতার উপর পীড়াদায়ক না হয়ে ওঠে। কিন্তু সম্প্রতি পত্রিকার প্রকাশনা-ব্যয় আমাদের সাধ্যের শেষ সীমা অতিক্রম করে গেছে। মূল্যবৃদ্ধি না ঘটিয়ে আর উপায় নেই। চতুরঙ্গের সহানুভূতিশীল পাঠক, গ্রাহক এবং শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আমরা তাই মার্জনা-প্রার্থী।

বর্তমান মে ১৯৯২ সংখ্যা থেকে আমরা চতুরঙ্গ প্রতি কপির মূল্য আট টাকা করতে বাধ্য হচ্ছি। এই সঙ্গে গ্রাহক-চাঁদার হারও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে বাৎসরিক সডাক ৯০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক সডাক ৪৫ টাকা।

এজেন্টদের এখন প্রতি কপি পত্রিকার জন্য চার টাকা অগ্রিম জমা রাখতে হবে। চাঁদা এবং এজেন্সি অগ্রিম জমা পাঠাবার ঠিকানা ম্যানেজার, চতুরঙ্গ, ৫৪ গণেশচন্দ্র আভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৩।

গানের ভুবন

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও তাঁর গান

বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলা গানের জগতে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় 'কোকিলকণ্ঠী' হিসাবে। তাঁর সুমধুর কণ্ঠস্বর আর সঙ্গীত পরিবেশনায় সুরের যে মাদকতা সৃষ্টি হয় তা অভূতপূর্ব। তাঁর সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহ ছোটবেলা থেকেই, বিশেষত: তাঁর মা সুন্দর গাইতে পারতেন। সঙ্গীত-শিক্ষার প্রাথমিক তালিম সন্তোষ বসুমল্লিকের কাছে। এই তালিম নিয়েই ১৯৪৩ সালের ৫ই ডিসেমবর 'অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সে' সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের প্রথম সসম্মান আত্মপ্রকাশ। ১৯৪৬ সালে তাঁর সুললিত কণ্ঠ ও সঙ্গীতে পারদর্শিতার জন্য 'গীতশ্রী' উপাধিতে ভূষিতা হন। এই সময়ে সঙ্গীত শিক্ষা করেন প্রথমে সুখেন্দু গোস্বামীর কাছে এবং পরে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তালিম নেন চিন্ময় লাহিড়ী ও এ কাননের কাছে। ১৯৫০ সালের ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলির কাছে 'নাড়া' বেঁধে সঙ্গীতের চূড়ান্ত শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে গোলাম আলির পুত্র ওস্তাদ মুনাব্বর আলির কাছেও তালিম নেন।

বারো বছর বয়স থেকেই শ্রীমতী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় আকাশবাণীর শিল্পী। আকাশবাণীর সর্বভারতীয় সঙ্গীতানুষ্ঠানে তাঁর পরিবেশিত খেয়াল ও ঠুংরি এবং আধুনিক গান এক বিশেষ মর্যাদায় শিল্পীকে প্রতিষ্ঠিত করে। ১৯৪৫ সালেই সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের প্রথম গ্রামাফোন রেকর্ডে গান গৃহীত হয়। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গলার অপরূপ মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে রাইচাঁদ বড়াল সন্ধ্যাকে বাঙলা ছায়াছবি 'অঞ্জনগড়ে'র নেপথ্য গায়িকা হিসাবে গান করান। অবশ্য সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের প্রথম গাওয়া মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবি 'সমাপিকা'। ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৪৮ সালে। ছবিতে শৈলেন রায়ের লেখা ও রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'প্রতিমা গড়িয়া দেবতা চেয়েছি' এবং 'সূর্য ওঠার স্বপ্ন নিয়ে' গান দুটি জনপ্রিয় হয়।

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া গানের অসামান্য জনপ্রিয়তার জন্য গ্রামোফোন কোম্পানি ১৯৮০ সালে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে 'গোল্ডেন ডিস্ক' দিয়ে সম্মানিত করে এবং সেই কোম্পানি ১৯৯১ সালে তাঁকে 'হীরক খচিত রেকর্ড' দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করে। বাংলা ছাড়াও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় হিন্দি, ওড়িয়া ও অহমিয়া ভাষাতেও গান করেছেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে সঙ্গীতে শ্রোতাদের আপ্লুত করে রেখেছেন শ্রীমতী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। আজও তাঁর সুললিত কণ্ঠস্বর শ্রোতাদের কাছে পরম বিস্ময়ের বস্তু। আজও তাঁর নিটোল স্বরমাধুর্য সুরের ঝর্নায় তোলে অনুরণ। কয়েক হাজার গানের মধ্যে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় গান নির্বাচন তাই দুরূহ, কারণ সব গানই অত্যন্ত জনপ্রিয়—তার পরিবেশনার গুণে। বর্তমান নিবন্ধে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের মাত্র কয়েকটি গানের শুদ্ধ পাঠ দেওয়া হল

আধুনিক গান

মায়াবতী মেঘে এলো তন্দ্রা।
তুলতুল রাঙা পায়েতে ফুলফুল বনছায়েতে
পলাশের রঙ রাঙালো কখন চোখে সে স্বপন আঁকে
মায়াবতী মেঘে এলো তন্দ্রা॥
গুণগুণ গুণগুণ ফিরে এলো ওই ফাল্গুন
পথিক মেয়ে হয় চঞ্চল কাঁকন বাজে চুন্ চুন্ চুন্।
ছুম্ ছুম্ ছুম্ ছুম্ ঝুমুর বাজে কার রুমঝুম্
মহুল বনে মৌ দোল দোল দুনয়নে নেই নেই ঘুম॥
কথা-শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ওগো মোর গীতিময় মনে নাই সেকি মনে নাই
সেই সাগর-বেলায় ঝিনুক খোঁজার ছলে গান গেয়ে পরিচয়॥
আমি দিনু পূজা প্রথম প্রণয় ফুলে
ঝিনুকের মালা খোঁপা হতে দিনু খুলে
তুমি কপোল চুমিয়া বলেছিলে প্রিয় প্রেমের হবে গো জয়॥
গানের বিবাগী সমবেদনায় ব্যথার অশ্রু নিয়া
দিকে দিকে ফেরে তোমারে খুঁজিয়া তুমি কোথায় তুমি কোথায়
বিদায়ের ক্ষণে কাঁদিয়া শুধানু যবে দূরে গেলে হায়
আমারে কি মনে রবে
তুমি বলেছিলে এই আঁখির আড়াল মনের আড়াল নয়"
কথা- কমল ঘোষ

মধুর মধুর বংশী বাজে কোথা কোন কদমতলীতে
আমি পথের মাঝে পথ হারালেম ব্রজে চলিতে।
কোন মহাজন পারে বলিতে॥
পোড়া মন ভুল করিলি চোখ তুলিলি পথের ধুলো থেকে
রাই যে আমার রাঙা পায়ের ছাপ গিয়েছে এঁকে
দুকূল ছেড়ে পথের ধুলো চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ গলিতে
আমি পথের মাঝে পথ হারালেম ব্রজে চলিতে
অনেক আলোর ঘটায় অনেক ছটা ঝলোমলো
আমার হাতের মাটির পিদিম লাজে নিভাইলো
এখন যে হায় গভীর আঁধার কোনপথে ঘাট বল ললিতে
আমি পথের মাঝে পথ হারালেম ব্রজে চলিতে

কথা—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মধুমালতী ডাকে আয়, ফুল ফাগুনের এ খেলায়
যুথি কামিনী কত গাঁথা গোপনে বলে মলয় আয়।
চাঁপা বনে অলি সনে আজ লুকোচুরি গো লুকোচুরি
আলো ভরা কালো চোখে কি মাধুরী গো কি মাধুরী।
মন চাহে যে ধরা দিতে তবু সে লাজে সরে যায়॥
মালা হয়ে প্রাণে মম কে জড়ালো কে জড়ালো
ফুল রেণু মধু বায়ে কে ঝরালো কে ঝরালো
জানি জানি কে মোর হিয়া রাঙালো রাঙা কামনায়।
মধুমালতী ডাকে আয়॥

কথা—প্রণব রায়

যারে যা যা ফিরে যা যা।
জীবন তরণীতে হবে দূর পাড়ি দিতে
ভাঙা হাল টলোমলো ছেঁড়া পাল হায় হায়॥
লাগে না আর ভালো হাসি গান আর আলো
সুরে সুরে কে মোরে ডাকে আয় আয়॥
স্বপন-পাখি মোর যা ফিরে যা
বাঁধিয়া হৃদয়ে তোরে রাখিবো না
বহিয়া যায় বেলা আজি শেষ তোর ও খেলা
রঙে ও রসের মেলা মুছে যায় যায়॥

কথা—সলিল চৌধুরী

পথ ছাড়ো ওগো শ্যাম কথা রাখো মোর।
এমন করে তুমি আঁচল ধরো না শ্যাম
এখনি যে শেষ রাত হয়ে যাবে ভোর॥
রাত জেগে ঝরে গেছে অতসী ও কামিনী
এখনি না যাই যদি পোহাবে যে যামিনী
মলিন বসন হেরে কি কহিবে সকলে
যেতে দাও শুকালো যে মধু ফুল ডোর॥
সারে মাগা রেগা সা রেপা পামা গারে সা
রেমা পানি সা পানি সারে মাগা রেসা
রেমা পানিসা নিসা নিপা পানি সা॥

কথা — গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

ভালবাসার দিনগুলি মোর কাছে পাওয়ার দিন
তোমায় ঘিরে স্বপ্ন দেখে যায়।
অনুরাগের পরাগ মাখা সোহাগ রেখে যায়
স্বপ্ন দেখে যায়॥
ফুলের মতো পাপড়ি খুলে হৃদয় যে তাই ওঠে দুলে
আকুল হয়ে সুরভি তার তোমায় ডেকে যায়।
তুমি আমায় অনেক দিয়েছো গো
তাইতে সাজাই নিবেদনের এই ডালা
শুভক্ষণের ফুলগুলি মোর একটি করেই গেঁথে
পরাই তোমায় প্রতিদিনের মালা॥
বন্ধু আমার পথের সাথী তোমার আমার দিবস রাতি
গানের সুরে আলিম্পনা তাই তো এঁকে যায়॥

কথা — শ্যামল গুপ্ত

নেবো না সোনার চাঁপা কনক চাঁপা পেলে
সোনাতে খাদ মেলে গো ফুলে সুবাস মেলে।
যে বাতাস যায় গো ঝড়ের বেগে
ঝরে ফুল তারি আঘাত লেগে
নদী যে হয় না গভীর ঝরনা হয়ে গেলে॥
দীপালির চেয়েও ভালো জোনাক জ্বালা রাত
খোঁপাতে পদ্ম দিও চাই না চাই না পারিজাত
যে দীপের আলোয় কাঁপন লাগে
সে প্রদীপ নেভে সবার আগে
চাই না দেবের বাঁশি মুখের হাসি পেলে
না না না না নেবো না সোনার চাঁপা কনকচাঁপা পেলে॥

কথা—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

তারা ঝিলমিল স্বপ্ন মিছিল
ঘুমে ঢুল ঢুল ঢুল চম্পকছায় অলি জাগলো কিরে।
পাতা শিরশির্ রাত্রি নিবিড়

শন্ শন্ যেন কোন রাজ্যের মেঘ হাওয়া ডাকছে ধীরে॥
এলো কি শোনাতে কেউ আজ চুপি চুপি তার সব গান
দিলো কি হৃদয়ে ঢেউ দিলো মনে মনে তার মন প্রাণ
তাই কি কানে কানে বলছে গানে গানে
ছন্দ আনো প্রাণে মিল্ মিল্।
শিরিশে শিমুলে দেখি আজ দোল দোল চাঁদ দোল খায়।
ভাবি নি যা কোনদিন সেই ভেবে ভেবে মন গান গায়।
স্বপ্ন ভেসে ভেসে আজ কি এলো শেষে
জমছে মনে এসে তিলতিল্॥

কথা—অভিজিৎ

ছবি—সবার উপরে
কথা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায়

জানিনা ফুরাবে কবে এই পথ চাওয়া।
ছলছল আঁখি মোর জলভরা মেঘে যেন ছাওয়া॥
পদধ্বনি শুনে তার আমি বারে বারে, ছুটে যাই দ্বারে
ভুল ভেঙে যায়, আমারে কাঁদায়ে শুধু খেলা করে হাওয়া॥
আকাশে উঠেছে ঝড় কান পেতে শুনি তার ভাষা
তবে কি বেঁধেছি আমি বালুচরে বাসা।
দীপ বুঝি নিভে যায় মন নাহি মানে, তবু তার পানে—
চেয়ে থাকি হায় সহিতে পারি না তার এই নিভে যাওয়া॥
ছল ছল আঁখি মোর জলভরা মেঘে যেন ছাওয়া
জানি না ফুরাবে কবে এই পথ চাওয়া॥

ছবি-নায়িকা সংবাদ
কথা : মোহিনী চৌধুরী
সুর : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

কেন এ হৃদয় চঞ্চল হলো—
কে যেন ডাকে বারে বারে কেন বলো কেন।
আমি ফুল দেখেছি, ফুল ফুটতে কখনও দেখি নি
আজ মনে হয় এই শিহরণ এই-বুঝি ফুটলো আমার কলি॥
কেন এ কণ্ঠে এলো গান, কেন বলো কেন
এ এক মধুর নেশা যেন—
কি যে সুর শুনেছি, সুর ভুলতে এখনো পারি নি
আজ মনে হয় গান হয়ে মোর তাই বুঝি ফুটছে কথার কলি॥

ছবি — নূতন জীবন
কথা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
সুর : রাজেন সরকার

আমি তোমারে ভালবেসেছি চিরসাথী হ'য়ে এসেছি
এ লগন পূর্ণ যে তোমাতে শুভরাত জানে না গো পোহাতে
তোমারই ব্যথায় কেঁদেছি যে হায়, তোমারই হাসিতে হেসেছি॥
তোমার কানে কানে দুটি কথা তাই শুধু বলবো 'ভালবাসি, ভালবাসি'
প্রণয়ের নীলাকাশে দুটি তারা হয়ে মোরা জ্বলবো, 'ভালবাসি, ভালবাসি'॥
পৃথিবীকে তাই বলি বারে বার, মোর চেয়ে সুখী কে গো আছে আর
বহু জনমের মিলন-সাগরে আমরা দুজনে ভেসেছি॥

ছবি—সবার উপরে
কথা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায়

ঘুম ঘুম চাঁদ ঝিকিমিকি তারা এই মাধবী রাত
আসে নি তো বুঝি আর জীবনে আমার॥
এই চাঁদের তিথিরে বরণ করি, এই চাঁদের তিথিরে বরণ করি।
ওগো মায়া-ভরা চাঁদ আর ওগো মায়াবিনী রাত॥
বাতাসের সুরে শুনেছি বাঁশি তার ফুলে ফুলে ওই ছড়ানো হাসি তার
সেই মধুর হাসিতে হৃদয় ভরি, এই চাঁদের তিথিরে বরণ করি।
সব কথা গান সুরে সুরে যেন রূপকথা হয়ে যায়

ফুল-ঋতু আজ এলো বুঝি মোর জীবনের ফুল ছায়।
কোথায় যে কতদূরে জানি না ভেসে যাই
মনে মনে যেন স্বপ্নের দেশে যাই
আজ তাই কি জীবনের বাসর গড়ি, এই চাঁদের তিথিরে
বরণ করি
ওগো মায়া-ভরা চাঁদ আর ওগো মায়াবিনী রাত॥

ছবি-পথে হলো দেরী

কথা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায়

এ শুধু গানের দিন, এ লগন গান শোনাবার।
এ তিথি শুধু গো যেন দখিন হাওয়ার॥
এ লগনে দুটি পাখি মুখোমুখি নীড়ে জেগে রয়
কানে কানে রূপকথা কয়
এ তিথি শপথ আনে হৃদয় চাওয়ার॥
এ লগনে তুমি আমি একই সুরে মিশে যেতে চাই
প্রাণে প্রাণে সুর খুঁজে পাই
এ তিথি শুধু গো যেন তোমায় পাওয়ার॥

ছবি—অগ্নিপরীক্ষা

কথা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সুর : অনুপম ঘটক

কে তুমি আমারে ডাকো অলখে লুকায়ে থাকো
ফিরে ফিরে চাই, দেখিতে না পাই।
মনে তো পড়ে না, তবুও যে মনে পড়ে
হাসিতে গেলেই কেন হৃদয় আঁধারে ভরে
সমুখের পথে যেতে পিছনে টানিয়া রাখো॥
নতুন অতিথি দাঁড়ায়ে রয়েছে দ্বারে তবু ফিরাতে হবেই
যে তারে
ভুল করে মালা যদি দিতে চাই কারো গলে
কেন কাঁপে হাত বলো বাধা পাই পলে পলে
আমারই আকাশ শুধু মেঘে মেঘে কেন ঢাকো॥

ছবি—বসন্ত বাহার
কথা : শ্যামল গুপ্ত
সুর : জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ

বাঁধো ঝুলনা, তমাল বনে এসো দুলি দুজনা।
ওগো সাথী মধুরাতি এলো আহা নাহি তুলনা॥
সুরে সুরে আজি মাধুরী ছড়ায়ে
মালতীমালা দাও কণ্ঠে জড়ায়ে
মায়া মিলন তিথি যেন ভুলো না॥
দখিনা বাতাসে একি দোলা লাগে
আবেশে হিয়া দুটি ভরে অনুরাগে
প্রণয়-রাখী যেন কভু ভুলো না॥

ছবি-দেয়া নেয়া

কথা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সুর : শ্যামল মিত্র

এ গানে প্রজাপতির পাখায় পাখায় রঙ ছড়ায়
এ গানে রামধনু তার সাতটি রঙের দোল ঝড়ায়।
সীমানা ছাড়িয়ে—যাই যে হারিয়ে
গানে আমার কে যে দিলো সুর, সে তো জানি না॥
আমার এ গান সুনীল সাগর কূলে
মুকুতা খোঁজে শুধু যে ঝিনুক তুলে। লা-লা-লা-২
সে কার বাঁশিতে চায় যে হাসিতে
কাছে আমার আসে কেন দূর সে তো জানি না।

ছবি—পিতাপুত্র

কথা : প্রণব রায়
সুর : পবিত্র চট্টোপাধ্যায়

তীর বেঁধা পাখি আর গাইবে না গান।
ভুলে গেছে জীবনের হাসি কলতান॥
হাসি ছিল গান ছিল সাথী ছিল সাথে
বুঝিনি তো তীর ছিল নিয়তির হাতে
দুদিনের মধু মেলা হলো অবসান॥
বুকে লয়ে অভিমান নীরব হয়েছে ভালবাসা
চোখে তবু আসে জল অশ্রু যে ব্যথার ভাষা
এ জীবনে মালা গেঁথে কেন ছিঁড়ে ফেলা
মনের আলাপটুকু সেও কিগো খেলা
আমি যেন নেভা দীপ ব্যথা ভরা প্রাণ॥

ছবি—মায়ামৃগ
কথা : শ্যামল গুপ্ত
সুর : মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ও বক্ বক্ বক্ বকম্ বকম্ পায়রা তোদের রকম
সকম দেখে
মুখটিপে যে হাসছে ভোরের আকাশটা দূর থেকে॥
খোলা হাওয়ার ওই যে আলোর ঝর্না ঝরানো
রঙ বেরঙের-নতুন খুশির মাতন ছড়ানো
শুনিস নাকি মিষ্টি সুরে বলছে ওরা ডেকে
পাখ্না মেলে আয়না চলে বাঁধন ফেলে রেখে॥
ও লোটন লোটন পায়রা তোরা ঝোঁটন বেঁধে নে
হারিয়ে যাবার সুরে প্রাণের বাঁশি সেধে নে
একটু আরাম একটু সুখের মিথ্যে আশাতে
মিছে কেন বন্দী থাকিস ছোট্ট বাসাতে॥
যা চলে যা অবাধ ডানায় স্বপ্ন চোখে এঁকে
অথই নীলে নতুন দিনের সোনালী রোদ মেখে॥

ছবি—সূর্যমুখী
কথা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সুর : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

আকাশের অন্তরাগে আমারই স্বপ্ন জাগে তাই কি হৃদয়ে
দোলা লাগে।
আজ কান পেতে শুনেছি আমি—
মাধবীর কানে কানে কহিছে ভ্রমর, আমি তোমারই
আমি তোমারই
সেই সুরে স্বপ্নের মায়াজাল বুনেছি আমি
মনে হয় এ লগন আসেনি আগে॥
এবার বুঝেছি আমি চাঁদ কেন চেয়ে থাকে সরসীর
পানে
আমি যে তোমারই ওগো—বলে কানে কানে।
শুধু কান পেতে শুনেছি আমি—
সাগরের কানে কানে তটিনী বলে আমি তোমারই আমি
তোমারই।
কি আশায়, তিয়াসায় দিন শুধু গুনেছি আমি
বাতাসের বাঁশি বাজে কি অনুরাগে, কি অনুরাগে॥

ভ্রমসংশোধন

চতুরঙ্গ মার্চ, ১৯৯২ সংখ্যা ৯১৮ পৃষ্ঠার ২য় কলমে তথাগত অসম্পূর্ণতা ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নীতিকাব্য সংকলনটির ভূমিকা লেখক কেবলমাত্র শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নন যুগ্মভাবে শ্রী অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের নামও উল্লেখ্য।

এপ্রিল ১৯৯২ সংখ্যায় ১০১৯ পৃষ্ঠায় ১ম কলমে আচার্য সুকুমার সেনের প্রয়াণ তারিখ ভুল ছাপা হয়েছে, হবে ৪ঠা মার্চ ১৯৯২। তাছাড়া ১০২০ পৃষ্ঠায় ১ম কলমে 'বঙ্গালবাণী' কথাটি না হয়ে হবে 'বঙ্গভূমিকা' এবং ১০২২ পৃষ্ঠায় ২য় কলমে 'যসা' কথাটি না হয়ে হবে 'যেন'।

"১৩৫০ ,এর মন্বন্তর....."১

মাননীয় রউফ সাহেব, সংখ্যা ১১ই মার্চ, ৯২ "চতুরঙ্গে" শ্রী অশোক মিত্র লিখিত ১৩৫০ এর মন্বন্তর, বিক্রমপুর (ঢাকা) পড়লুম। বন্ধুবর হুমায়ুন কবির ও আমি জীবন পথ অতিক্রম করেছি এক সঙ্গে। তিনি আমাকে 'দাদা' বলে সম্বোধন করতেন। আমি বলতুম ভাই সাহেব। তিনি ও আতাউর রহমান সাহেব এই বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। "চতুরঙ্গের" বিশেষ ঐতিহ্য ও পরিশুদ্ধ চরিত্র আমি স্বীকৃতি দিয়েছি এত বৎসর। এজন্য বাধ্য হয়ে আমার সুস্পষ্ট অভিমত সহ এই চিঠিটি পাঠাচ্ছি। আশা করি এর পরের সংখ্যায় আপনি অনুগ্রহ করে ছাপবার ব্যবস্থা করবেন।

আমার পৈতৃক বাড়ি বিক্রমপুর-তালতলা বন্দরের সংলগ্ন ফুরশাইল গ্রামে। ১৯২৫ সালে আমার কাকা শ্রী ধীরেশ চন্দ্র চক্রবর্তীর আমন্ত্রণে মহাত্মা গান্ধী আমাদের বাড়িতে শুভাগমন করেন এবং গ্রামের জমিদার ৺চণ্ডীচরণ রায়ের বাড়ির সম্মুখের বিরাট প্রাঙ্গণে ত্রিশ হাজার জনতার মধ্যে ঘুরে ঘুরে-'চরকা কাটবে, খদ্দর পরবে' বাণী প্রচার করেন।

আমার জন্ম কার্তিকপুর, ফরিদপুর জেলায়। এইজন্য বাঙলাদেশের নবজন্মের পর আমি মুজিব সাহেবকে লিখি "আপনি, অধ্যাপক কবির ও আমি, ফরিদপুরের মাটি স্পর্শ করে জেগে উঠি। প্রথম চোখ মেলে মাকে দেখি।

আমি বাঙলাদেশে যাব বলে খুব ঘটা করে, ঘোষণা করি। যাওয়া হল না। সেই-মর্মান্তিক ঘটনা মনে পরলে আজও আমি শিউরে উঠি।

শ্রী অশোক মিত্র যখন মুন্সীগঞ্জে হাকিম হয়ে এলেন—আমি বরিশাল জেলে বন্দী। ১৯৩২ সালে বিক্রমপুর রাষ্ট্রীয় সমিতির রাজনৈতিক সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে আমি গ্রেপ্তার হই। আমার বিচারের ভার রায় বাহাদুর কালীপদ মৈত্রের উপর। একাধিকবার। অশোক বাবুর সঙ্গে আমার পরিচয়ের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আমি তাঁর প্রতিভা, নিরলস কর্মাবেশ যৌবনের দীপ্ত অনুপ্রেরণা ও সর্বোপরি, জনসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণের অকৃত্রিম প্রচেষ্টার সংবাদ পেয়েছি।

নয়াদিল্লিতে চল্লিশ বৎসর কাটিয়েছি। অতএব শ্রী মিত্র আমার কাছে অপরিচিত নন।

তিনি যেভাবে ১৩৫০ এর মন্বন্তরকে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছেন আমি মনে করি, ইতিহাসের এই ভীষণ বেদনাদায়ক অধ্যায় বুঝিয়ে বলতে গেলে চাই সত্যানুসন্ধান এবং আত্মসমীক্ষা।

আমি ১৯৪৫ সালের শেষভাগে বরিশাল থেকে মুক্ত হয়ে কলকাতায় এসে ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষকে খুব বিনীতভাবে প্রশ্ন করি "পৃথিবীতে নাৎসীবাদের বিভীষিকা যে প্রলয়ঙ্করী সর্বনাশের কালো মেঘে ছেয়ে ফেলেছে ইউরোপ ও এশিয়া ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি যেদিন লিখলেন "সভ্যতার সংকট" তখন আপনারা তথাকথিত দেশ নায়কের দল কি ভেবেছিলেন ?

এবং এই দানবীয় সংঘাতের প্রতিরোধকল্পে দেশবাসীকে সংগঠিত করার কি আয়োজন করছিলেন ?

ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ আমার বাড়িতে প্রথম এসেছিলেন ১৯২০ সালে। তাঁর সহকর্মী ছিলেন আমার কাকা ৺ধীরেশ চক্রবর্তী। অতএব আমাদের পরিচয় ২৫ বৎসরের অধিক। তিনি নির্দেশ দিলেন "কাগজে লিখে রেখে যাও তোমার প্রশ্ন।"

তখন আমি তাঁকে জানালুম "১৯৪০ সালে আমি ওয়ার্ধাতে মহাত্মা গান্ধীকে চিঠি লিখি। বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। ইংরেজ ও আমেরিকা হিটলারের বিধ্বংসী ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে। আমরা এবার নতুন করে দেশবাসীকে উদ্দীপিত করব।

আমি নিজে চারটি জেলায় ঘুরে যুবকদের আহ্বান করার অনুমতি চাই — ঢাকা ফরিদপুর-বরিশাল ও নোয়াখালি। আমি বিক্রমপুরের লোক, ঢাকায় পড়েছি, লড়েছি, ইউনিভারসিটি ইউনিয়নের নেতৃত্বে করেছি — স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অন্যতম কর্মী ১৯২০ সাল থেকে। ফরিদপুর আমার জন্মস্থান বরিশালে অধ্যাপনা করেছি, জেলে বন্দী হয়ে রয়েছি নির্জন কারাবাসে। নোয়াখালি (ফেনী) কলেজে অধ্যাপনা করেছি। দশ হাজার যুবককে সংগঠিত করে Bengal Militia গড়ে তুলব। ভারতের পূর্ব সীমান্তের ভার এই নবগঠিত সেনা বাহিনীর উপর।

সাতদিনের মধ্যে আমার চিঠির উত্তর পেলেম। মহাত্মার সেক্রেটারি মহাদেব দেশাই জানালেন — গান্ধীজির নির্দেশমত আপনাকে জানাই আপনি যুদ্ধবিরোধী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে যোগ দেবেন না।

২টি জেলা থেকে (ঢাকা ও বরিশাল) প্রথম তালিকায় আমার নাম থাকা নিশ্চিত। তবুও আমি লিখে জানিয়ে দিলেম, আমি অপাঙ্‌ক্তেয়।

১৯৪৬ সালের শেষভাগে নয়াদিল্লি যেতে হল — বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা শ্রীশরৎ চন্দ্র বসুর অপ্রতিরোধ্য দাবির ফলে।

মহাত্মা গান্ধীকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানালুম, কিছু প্রশ্ন করি নি। কেন আমার সনির্বন্ধ প্রার্থনা স্বীকৃতি পায় নি ?

১৩৫০ এর মন্বন্তর ঠেকাবার ভার নিতে সক্ষম Bengal Militia গঠনের প্রস্তাব কি খুবই অযৌক্তিক ছিল ?

কিছুদিন বাদে পণ্ডিত নেহরু, সর্দার প্যাটেল, মৌলানা আজাদ ও শরৎচন্দ্র বসু প্রভৃতি যখন ইন্টারিম গভর্নমেন্টের ভার নিলেন; তখন আমার সুযোগ মেলে এই নেতাদের বাড়িতে বসে আমার অন্তরের দুঃসহ বেদনা ও ক্ষোভ প্রকাশ করার। ওঁদের নির্দেশে অধ্যাপনা ছেড়ে ১৯৪৭ সালের জানুয়ারিতে এলাহাবাদ 'স্বরাজভবনে' নতুন দায়িত্ব নিয়ে কর্মারম্ভ।

চল্লিশ বৎসর বোঝা বয়েও প্রায়শ্চিত্তের অবসান ঘটে নি। নতুন প্রজন্মের জন্য আজও লিখি। নয়াদিল্লির সংস্থা "INFA" বিভিন্ন প্রাদেশিক দৈনিকে প্রকাশের বন্দোবস্ত করেন। বিক্রমপুর যেতে পারি নি। ৯০ বৎসর পার হয়ে যাচ্ছে। এখন শুধু আত্মসমীক্ষা ও প্রার্থনা।

প্রফুল্ল চক্রবর্তী
কৃষ্ণনগর

"১৩৫০ এর মন্বন্তর"—২

গত মার্চ ও এপ্রিল ১৯৯২ সংখ্যায় শ্রীঅশোক মিত্র (আই. সি. এস অবসরপ্রাপ্ত) রচিত "১৩৫০ এর মন্বন্তর: বিক্রমপুর, ঢাকা" পড়ে এই চিঠি লিখছি। বলা উচিত, লিখতে বাধ্য হলেম। পঞ্চাশের মন্বন্তরের এমন মর্মান্তিক তথ্যনির্ভর বিবরণ এর আগে কি ইংরেজি কি বাংলায় পড়ি নি। সেদিনের ইংরেজ প্রশাসকের হৃদয়হীনতা ও ইতরতা, কলকাতা দিল্লি-লনডনস্থিত ব্রিটিশ প্রশাসকের নির্মম ঔদাসীন্য ও সাম্রাজ্যবাদীর ভীরুতা তথা গৃধ্নুতার এমন ভয়ংকর রেখাচিত্র পড়ে স্তম্ভিত হয়েছি। তরুণ ভারতীয় আই. সি. এস দের চাকুরি জীবনের লাঞ্ছনার বিবরণ যেমন হৃদয়বিদারক, হৃদয়বান ইংরেজ সহকর্মী ও উপকৃত প্রজাকুলের বিবরণ তেমনি চিত্তাকর্ষী। সেদিনের অনেক মানুষ ও ব্যক্তি তাদের ইতরতা, ভদ্রতা, হৃদয়হীনতা ও মানবিকতা নিয়ে এখানে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। লেখকের বোধ ও বুদ্ধি, মেধা ও বিস্তীর্ণ অধ্যয়ন যুক্ত হয়েছে মানবিক গুণের সঙ্গে। এই রচনাটি পড়ে কষ্ট পেয়েছি, মুগ্ধ হয়েছি। তাঁকে সালাম জানাচ্ছি। লেখক কী তাঁর ইংরেজিতে লেখা আত্মজীবনীর কিছু কিছু অংশ এভাবেই বাংলায় পরিবেশন করবেন ? তা যদি না করেন তবে তো মূল বইটি পড়তে হয়। তাতে ইংরেজি-অনভিজ্ঞ পাঠককুলকে তিনি বঞ্চিত করবেন।

অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়।
বাংলা বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

রবীন্দ্রগবেষণার এক অভিনব ধারা ১

ভিকটোরিয়া ওকাম্পো-কেন্দ্রিক রবীন্দ্রগবেষণার অভিনব ধারার যে সমালোচনা করেছিলেন গৌরী আইয়ুব, তারই জবাবে এই ধারার প্রবর্তিকা ড: কেতকী কুশারী ডাইসনের দীর্ঘ নিবন্ধটি পড়েছিলাম ৮. ১২. ৯১ তারিখের চতুরঙ্গ পত্রিকায়। এর পরে আবার ৯. ১. ৯২ তারিখের চতুরঙ্গে গৌরী আইয়ুব ডঃ ডাইসনের দীর্ঘ সমালোচনার যে জবাব দিয়েছেন, সেটিও পড়লাম। লেখাগুলি পড়ে সেই তিরিশের দশকের কথা মনে পড়ছে যখন বিভিন্ন পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে এই ধরনের সমালোচনার চাপান-উতোর দেখা যেত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে এবং তার পরে অধিকাংশ পত্রিকাই উঠে যায় আর এই কারণেই চাপান উতোরের পালাও শেষ হয়ে যায়। সেই থেকে গুটিকয়েক বাণিজ্যিক পত্রিকা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে

এবং এদের মধ্যে দুএকটি আবার বঙ্গসংস্কৃতির ধারক এবং বাহকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। অল্পকালের মধ্যেই এদেরকে দেখা গেল সারা দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির সিংহভাগের অধিকারীরূপে। অন্যান্য অখ্যাত এবং অল্পখ্যাত পত্রিকাগুলির শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী নামকরণ হল 'লিট্‌ল ম্যাগাজিন'—সংক্ষেপে 'লিট্‌ম্যাগ'। জানি না, কে বা কারা এই রকম নামকরণ করলেন এবং কেনই বা করলেন। এই 'লিট্‌ল-ম্যাগাজিন' শব্দটি কোন অভিধানেই খুঁজে পাই নি। যদি কোন সহৃদয় পাঠক এই ব্যাপারে আলোকপাত করেন তো উপকৃত হই।

বহু লিট্‌ল ম্যাগাজিন এল আর গেল, আসছে আর যাচ্ছে। এর মধ্যে যারা বেঁচেবর্তে আছে, তাদের, অধিকাংশই হয় বড় তরফের মুখাপেক্ষী, নয় তো নির্বিবাদী। দুটো হক কথা বলার সাহস খুব কম পত্রিকারই আছে—প্রায় নেই বললেই হয়। এ-দিক থেকে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকাকে ব্যতিক্রম বলা যায়। নিষ্ঠা এবং নির্ভীকতায় এই অবাণিজ্যিক পত্রিকাটি পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করে এটাই প্রমাণ করেছে যে, দেশে এমনও কিছু পাঠক আছেন যাঁরা প্রকৃতই সাহিত্যানুরাগী এবং যাঁদের রুচি বিকৃত নয়। ভিকতোরিয়া ওকাম্পো-কেন্দ্রিক রবীন্দ্রগবেষণার অভিনব ধারার প্রবর্তিকা ডঃ ডাইসন তাঁর এক মুগ্ধ পাঠকের প্রশংসাবাণী উদ্ধৃত করে 'চতুরঙ্গের' পাঠকদের উদ্দেশ্যে লিখেছেন—'চতুরঙ্গ' "এর পাঠকদের মনে রাখতে অনুরোধ করি যে গৌরীদেবীর বিপরীত মতটাও দৃঢ়ভাবেই উচ্চারিত হয়েছে।" চতুরঙ্গের পাঠকদের মধ্যে আমরা (আমার সঙ্গে আরও অনেকেই আছেন) নিতান্ত সাধারণ পাঠক। তবে গৌরী আইয়ুবের মত সমালোচকদের বিপরীত মতটা যে বেশ দৃঢ়ভাবেই উচ্চারিত হয়ে আসছে সেই পঞ্চাশের দশক থেকে, এমন অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। একটা করে বই বেরোয় আর মহাকালের মহাফেজখানায় সঙ্গে সঙ্গে 'ক্ল্যাসিক' বলে রেকর্ড হয়ে যায়। সংস্করণের পর সংস্করণ। পুরস্কারের পর পুরস্কার কিন্তু মহাকালের ঘূর্ণিঝড়ে শেষ পর্যন্ত সবই লোপাট। তিন-চার দশকের মধ্যেই বইগুলো এখন বিস্মৃতির গর্ভে প্রায় অবলুপ্ত বলা যায়।

আন্তর্জাতিকতা এবং মিশ্রতা সম্পর্কে ডঃ ডাইসন বিশেষভাবে জ্ঞানদান করেছেন। নজির দেখিয়ে তিনি বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথ সেই মিশ্রণের রাজকীয় অপত্য।" ঠিক কথা। সাহিত্য-কাব্য-সঙ্গীত—তাঁর সব কিছুতেই তো মিশ্রণ আছে। কিন্তু এই মিশ্রণকার্যের সূক্ষ্মতা এবং নিপুণতার গুণেই তাঁর সৃষ্টির সার্থকতা। এ গুণ কজনের থাকে। মিশ্রণকার্যে মাত্রাজ্ঞানও আর একটা জ্ঞান, যার অভাবে কি গড়তে প্রায়ই কি হয়ে যায়। দেশী এবং বিদেশী ভাব অথবা উপকরণ রবীন্দ্রনাথ দু-হাত ভরে গ্রহণ করেছেন এবং তারপর নিজের শিল্পমানসিকতার মাধ্যমে যা প্রকাশ করেছেন তা একেবারে বাঙলার জিনিস, বাঙালি কবির জিনিস। বিলেত থেকে 'আইরিশ মেলডি' শিখে তিনি গান বাঁধলেন। 'কালী কালী বলো রে আজ'। শিল্পগুরু ওকাকুরা বলেছিলেন 'ঐতিহ্যে অধিকার না থাকলে আর্ট হয় স্থানু ও কাঁচা'। জাতীয় সংস্কৃতির বোধ যাঁর যত বেশি তীব্র, নিজেকে আর্ন্তজাতিক বলার অধিকার তাঁর তত বেশি। আমি নিজেকে একজন বহুসাংস্কৃতিক লোক বলে জাহির করলে অন্যেরাও তো বলতে পারেন "আপনার মশাই আসলে কোন সংস্কৃতিই নেই। ঘরের এবং ঘাটের অর্থ হচ্ছে 'না ঘরকা না ঘাটকা।"

"যে সব খবর আমি আমার বইয়ে দিয়েছি সে সব আমার আগে আর কেউ রিসার্চ করে বার করতে পারলেন না কেন"—ডঃ ডাইসনের এই প্রশ্নের জবাবে গৌরী আইয়ুব বলেছেন, "ঐ জাতের অনুসন্ধান করতে যে ধরনের মন লাগে তা তাঁদের ছিল না।" মনের কথা—অর্থাৎ মানসিকতা এবং রুচিবোধের প্রশ্ন। গৌরী আইয়ুবদের মত সমালোচকদের বিপরীত মতটা সেই চল্লিশ বছর আগে থেকেই দৃঢ়ভাবে উচ্চারিত হয়ে আসছে আর এই উচ্চারণের দৃঢ়তা যে কত ভয়ানক তা শুধু 'চতুরঙ্গের' পাঠক কেন, সমগ্র দেশবাসীই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। তবে হাসি পায় যখন এই বিরুদ্ধবাদীরা নিজেদের রচনাকে 'ক্ল্যাসিক' বলে মহাকালকেও দলে টানার চেষ্টা করেন। অপ্রিয় সত্য স্পষ্ট করে বলার লোক ক্রমশ কমে আসছে বলাই বাহুল্য, কিন্তু তবুও যে এখনও কেউ কেউ 'রাজা ন্যাংটা' বলতে পারছেন এটাই পরম সান্ত্বনা।

ইরেন্দ্র নারায়ণ সরকার
জগাছা, হাওড়া

রবীন্দ্রগবেষণার এক অভিনব ধারা ২

শ্রীমতী কেতকী কুশারী ডাইসনের 'রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে' এবং 'In your Blossoming Flower-Gardens'—বই দুখানির শ্রীমতী গৌরী আইয়ুব কৃত আলোচনা (চতুরঙ্গ-জুন'৯১ এবং জুলাই' ৯১) পড়লাম। বই দুটি কয়েকবছর আগেই পড়েছিলাম। গৌরী আইয়ুবের সাম্প্রতিক আলোচনাটি পড়ে মনে হল এতদিনে আমাদের মতো সাধারণ পাঠকের মনের কথাগুলি যেন প্রকাশ পেল তাঁর দক্ষলেখনীতে।

শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ'-এ অনেক তথ্যই জানিয়েছেন আমাদের। রবীন্দ্রকাব্য বিদেশিনীর থীম এর একটি সুন্দর ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। কেতকীও স্বীকার করেছেন একথা (পৃ. ২৪২)। তবুও যত্রতত্র ওকাম্পোর ছায়া আবিষ্কার করেছেন কেতকী — মহুয়ার 'আহ্বান', শেষের কবিতা, যোগাযোগ — বহুত্র। যে বিদেশিনীর চিত্র রবীন্দ্রচিত্তে আবাল্য লালিত থাকে তিনি অনুভব করেছেন 'শারদপ্রাতে', 'মাধবীরাতে'—তাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন পথপার্শ্বে। ১৮৯৫তে লিখেছেন: 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী,' ১৯৪০-এ লিখলেন: দিনশেষে দেখা দেয় সে আমার বিদেশিনী/তারে চিনি তবু নাহি চিনি।' এই 'চির অচেনা পরদেশীকে' সমগ্র জীবনব্যাপী চিনতে চেষ্টা করেছেন। এই বিদেশিনীরা কবির Endless quest for the unknown কবিচিত্তের অজানাকে জানবার এ অন্তহীন অভিসার। কেতকী তাকে দেহের গণ্ডীতে আবদ্ধ করে কখনো কাদম্বরী, কখনো ওকাম্পোকে পেতে চেয়েছেন। ধন্য গবেষিকা; ধন্য তাঁর অভিনব গবেষণার ধারা।

রবীন্দ্রনাথের 'জাপান যাত্রী' থেকে একটা টুকরো অংশ উদ্ধার করে লেখিকা রবীন্দ্রনাথের 'কবিত্বের আড়ালে নিহিত' একটি 'dangerous doctrine'-এর বীজ আবিষ্কার করেছেন (পৃ ২৬১)। এটাও তিনি আবিষ্কার করেছেন যে রবীন্দ্রনাথের কথাবার্তার মধ্যে একটা প্রবণতা আছে যা মেয়েদের পক্ষে অবদমনাত্মক (পৃ ২৫০-৫১)!

রবীন্দ্রনাথের 'নারীচিন্তা' সম্পর্কে বিদুষী গবেষিকার মন্তব্য ও ভাষারীতি থেকে সামান্য উদ্ধার করছি, সাধারণ পাঠকই বলবেন কতটা শালীনতা সেখানে রক্ষিত হয়েছে। যেমন 'রবীন্দ্রচিন্তার এই ভিগবাজী খাওয়া' (পৃ.২৮৬) অথবা 'তাঁর আত্মচিন্তার এই সম্পূর্ণ ডিগবাজী খাওয়া সম্পর্কে তিনি কি সচেতনভাবে অবহিত ছিলেন?' (পৃ.২৮৯) এখানেই শেষ নয়। তাঁর এই আঙ্গিকের বইটি—'যদি বিলাস-কলাসু কুতূহলম্'—কারও থাকে তারাই পড়ুন। বহুৎ আচ্ছা বলুন। "সারাদিন সারারাত ধরে ধ'রে—'মনে কী ঘিধা রেখে গেলে চলে"—গানটা বাজান।' কিন্তু লেখিকার 'সাহিত্য বিবর্তনে কৌতূহলী' না হয়ে আমাদের মত যারা 'রবীন্দ্র-কৌতূহলী' তারা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিদুষী লেখিকার মন্তব্যগুলি খুব সানন্দচিত্তে হজম করতে পারবেন বলে মনে হয় না। যেমন...'এগুলির সঙ্গে যোগ করতে হবে তার প্রাতিষ্কিক নারী সম্পর্কিত অভিজ্ঞতাকে, ব্যক্তিগত জীবনে মেয়েদের সঙ্গে তার কী ধরনের ঘাতপ্রতিঘাত হয়েছিল সেই সব তথ্যকে' (পৃ ৩২৪)। অথবা 'তাঁর আর্টের যেসব সীমাবদ্ধতা, তাদের পর্যালোচনা করবার সময়ে তাঁর প্রাইভেট জীবনের এই ধস্তাধস্তিকে মনে রাখলে তাঁর প্রতি সুবিচার করা হয়' (পৃ-৩২৭)। এমনি আরো আছে। যাইহোক, গবেষিকার এ সকল মন্তব্য উল্লেখ করতে আমরা লজ্জিত হতে পারি, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি সচ্ছোচ্ছীন।

এই সকল বিচিত্র রবীন্দ্র-গবেষণা থেকে পরবর্তী প্রজন্ম কি ধারণা পাবে—আমাদের শিক্ষা আর রুচি সম্পর্কে! বাঙালি সংস্কৃতির এই দুর্দিনে প্রধান ভরসা আমাদের রবীন্দ্রনাথ, তাকে নিয়েই এই পঙ্ক-কেলি!

"রবীন্দ্রচর্চায় প্রবেশ করবার আনন্দই হচ্ছে সবচেয়ে উপাদেয়—'হৃদয়ের স্বাস্থের পক্ষে' সবচেয়ে তৃপ্তিজনক—" ওকাম্পোর এই উক্তি ('Tagore enlas barrancas de San Isidro' গ্রন্থের শঙ্খ ঘোষ কৃত অনুবাদ থেকে) আমাদেরই মনের কথা, এ উক্তিতেই আমাদের সান্ত্বনা। কবির ভাষাতেই কবিকে বলতে চাই আজ—'Thou hast made me endless,/such is thy pleasure'—'আমারে তুমি অশেষ করেছ/এমনই লীলা তব।' বিদুষণকারী দিঙ্‌নাগদের স্থূলহস্তাবলেপে রবীন্দ্রনাথ আর তাঁর সৃষ্টি কখনই 'অস্তংগমিতমহিমা' হবে না। দিঙ্‌নাগেরাই একদিন মিলিয়ে যাবে দিগন্তে। এই ভরসা।

অজিত কুমার চক্রবর্তী
গরিফা (নৈহাটি)-৭৪৩১৬৬

"ভারতবর্ষ ও ইসলাম"

চতুরঙ্গের নিয়মিত পাঠক হওয়ার সুবাদে 'ভারতবর্ষ ও ইসলাম' নামক অতি আলোচিত বইখানার সমালোচনা (চতুরঙ্গ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২) ও গ্রন্থকার মহাশয়ের মূল্যবান খেদোক্তি (চতুরঙ্গ, মার্চ, ১৯৯২) অধীর আগ্রহে পড়লাম। বইখানা এই প্রথমে পড়া হয়ে উঠে নি কিন্তু বইয়ের বিষয়বস্তু ও সারমর্ম আমার জানা ছিল কারণ বেশ কিছু সেমিনার, বিতর্কসভা ও ইসলামী ধর্মসভায় বইখানির বিষয়বস্তু বহুলভাবে আলোচিত ও গ্রন্থকার মহাশয়ের অধিকাংশ বক্তব্যও জোরালোভাবে সমর্থিতও হয়েছিল। স্বভাবতই মনে প্রত্যাশা জন্মেছিল চতুরঙ্গের পাতায় বইটির বেশ আকর্ষণীয় গঠনমূলক ও বিস্তৃত সমালোচনা দেখতে পাবো কারণ বাংলা ভাষায় চতুরঙ্গ ছাড়া অন্য কোন পত্রপত্রিকায় এতো আকর্ষণীয় ও বিস্তৃত সমালোচনা হয় না কিন্তু আলোচ্য সমালোচক মহাশয়ের 'ভারতবর্ষ ও ইসলাম'-এর সমালোচনার পরিধি ও পদ্ধতি দেখে হতাশ হলাম। কয়েকটা লাইনে দায়সারা ভাবে বইখানির পরিচয় দিয়েছেন। ভাবখানা যেন বইটি একটি সাধারণ উপন্যাস বা গল্প যার সমালোচনা ঐ ভাবেই ঘটে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সমালোচক সম্বন্ধে আমার দুটি ধারণা জন্মেছে। প্রথমত তিনি ইচ্ছাকৃত ভাবেই বইটির গঠনমূলক মনোভাব তুলে ধরা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছেন এবং দ্বিতীয়ত ধর্মের দিক থেকে এক অনন্য বৈশিষ্টের অধিকারী ভারতের সহিত বিশ্বের অন্যতম কালজয়ী মতবাদের সম্পর্কস্থাপনে অক্ষম থেকেছেন এইকারণে যে, ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কে তত্ত্ব ও তথ্য জ্ঞানের অভাব।

এ প্রসঙ্গে ভারতের সভ্যতায় ইসলাম কতটা জরুরী তা স্মরণ করে দিয়েছেন বিখ্যাত হিউম্যানিস্ট M. N. Roy—

"Unfortunately, India could not fully benefit by the heritage of Islamic Culture, because she did not deserve the distinction. Now, in the thores of a belated Renaissance, Indians, both Hindus and Muslims, could profitably draw inspiration from that memorable chapter of human history. Knowledge of Islam's contribution to human culture and proper appreciation of the historical value of that contribution would shock the Hindus out of their arrogant self-satisfaction, and cure the narrow-mindedness of the Muslims of our day by bringing them face to face with the true Spirit of the faith they profess." [সূত্রঃ *The Historical Role of Islam by M. N. Roy*]

যাহোক মার্চ সংখ্যায় গ্রন্থকার মহাশয়ের পত্র পড়ে হতাশা থেকে মুক্ত হলাম, প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থকার মহাশয়ই অতি উচ্চ রুচির পরিচয় দিয়ে নিজেই নিজের বইখানির সমালোচনা সূত্র পাঠকবর্গের সামনে তুলে ধরেছেন। এই সাহসী ও দায়িত্বশীল পদক্ষেপে আমরা গর্ব বোধ করি — গ্রন্থকার মহাশয়ের সমস্ত তথ্য ও তত্ত্বের সাথে সমালোচকের মতো একমত হওয়া সম্ভব নয় আমাদেরও, কিন্তু তিনি যে এক গঠনমূলক চিন্তাধারার অভিযান আরম্ভ করেছেন সে বিষয়ে দ্বিমত না থাকাই বাঞ্ছনীয়। গ্রন্থকারের মতের সাথে আমরাও একমত —"ইতিহাস মানে ক্রমাগত সত্যানুসন্ধান। 'ভারতবর্ষ ও ইসলাম' সেই সত্যানুসন্ধানের একপ্রচেষ্টা," এর সাথে জুড়ে দিতে চাই — আজ যখন ভারতের অতীত-বর্তমান ভবিষ্যৎ সবই সাম্প্রদায়িকতার কালোমেঘে ঢাকা, হিন্দু-মুসলিম-শিখ-হরিজনদের বুকের তাজা রক্তে ভারতের প্রতিটি রাজপথ ও গ্রামের মেঠোপথ রঞ্জিত—তখন এই ধরনের মানবিক ইতিহাস রচনার প্রয়োজনীয়তা বহুল ভাবে উপলব্ধ হয়। কারণ এই ইতিহাসই পারে তা রোধে বাস্তবিক পক্ষে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে।

আজ তো আবার নতুন বিপদ সাম্প্রদায়িক ইতিহাসবিদদের নিয়ে—যাদের কলমের বক্রতা ভারতকে বিপদের মুখে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের স্থলে দিল্লিতে ভারতীয় ইতিহাসকংগ্রেস অনুষ্ঠিত হ'ল শুধু এই কারণে যে মধ্যপ্রদেশে সাম্প্রদায়িক ইতিহাসবিদরা মঞ্চ দখল করে নিতে পারে। দেশের R.S.S. পরিচালিত বিদ্যালয়ে পাঠ্য দানের উদ্দেশ্যে নতুন ইতিহাসরচনা করা হচ্ছে—যেক্ষেত্রে আকবরের মতো সম্রাটকেও সাম্প্রদায়িক হিসাবে দেখানোর অপচেষ্টা চলছে। ইতিহাসবিদ P. N. Oak তাঁর 'Some Blunders in Indian Historical Research' বইতে বলেছেন তাজমহল সূর্যমন্দির, কাবাগৃহ (মুসলিমদের তীর্থস্থান) আসলে হিন্দুমন্দির ইত্যাদি।

এক্ষেত্রে 'ভারতবর্ষ ও ইসলাম' এর মানবিক উদ্যোগ অবশ্যই স্বাগত। গ্রন্থকার মহাশয়ের পাণ্ডিত্য, সত্যনিষ্ঠা ও সর্বোপরি গঠনমূলক মনোভাবের প্রতি অগাধ আস্থা রেখেই বইটির বহুল প্রচার কামনা করি। গ্রন্থকার মহাশয় দীর্ঘায়ু হোন!

শেখ একরামুল হক
আই-৬, নিশাত সোসাইটি
সুরাট—গুজরাট

প্রেস কপি

১. প্রেস কপি বলপেনে না লিখে ফাউনটেনপেনে লেখাই ভালো — তাতে কমপোজিটরদের পড়তে সুবিধা হয়।

২. লাইনের দৈর্ঘ্য যেন ১৫ সেনটিমিটারের মধ্যে থাকে।

৩. দুই লাইনের মধ্যে অন্তত এক সেমি ফাঁক থাকা দরকার — 'দাবী', 'দেরী' ইত্যাদি বর্জিত বানান কেটে 'দাবি', 'দেরি' ইত্যাদি লেখার জায়গা যাতে থাকে।

৪. পাতার বাঁ দিকে অন্তত তিন সেমি মারজিন থাকা উচিত। যা-কিছু সংযোজন, তা দুই লাইনের মাঝখানে না লিখে, মারজিনে লেখা ভালো।

৫. অনেক লেখায় কমা-দাঁড়ির তফাত বোঝা যায় না — দাঁড়ি কমার মতো মনে হয়। ড-ভ ম-স — এসব অক্ষর স্পষ্ট হয় না। তাতে খুবই অসুবিধা হয় — বিশেষ করে বিদেশী ব্যক্তিনাম-স্থাননামের ক্ষেত্রে। বিদেশী নামগুলি উপরন্তু মারজিনে রোমক লিপিতে বড়ো হাতের হরফে লিখে দেওয়া উচিত।

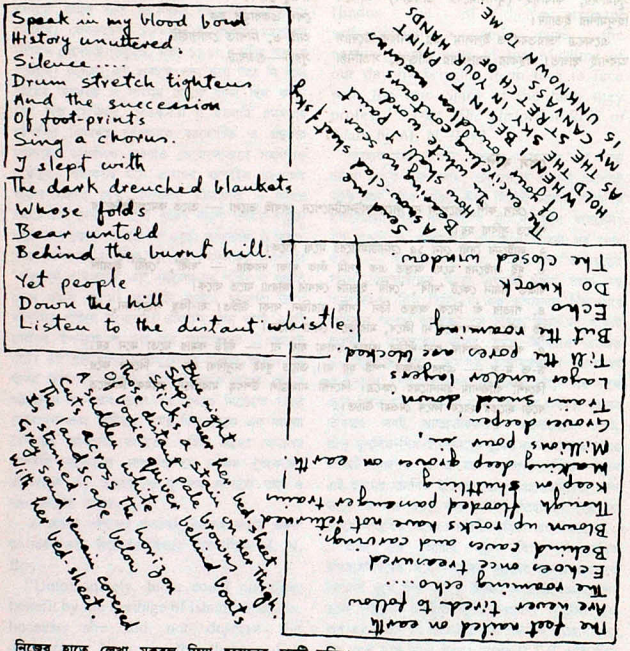

Speak in my blood bond
History unuttered.
Silence....
Drum stretch tightens
And the succession
Of foot-prints
Sing a chorus.
I slept with
The dark drenched blankets
Whose folds
Bear untold
Behind the burnt hill.
Yet people
Down the hill
Listen to the distant whistle

Send me
A snow-clad sheet of sky
Bearing no scar.
How shall I paint
The white words
The encircling contours
Of your boundless mounts
WHEN I BEGIN TO PAINT
HOLD THE SKY IN YOUR HANDS
AS THE STRETCH OF
MY CANVASS
IS UNKNOWN TO ME

The feet nailed on earth
Are never tired to follow
The roaming echo....
Echoes once treasured
Behind caves and carvings.
Blown up rocks have not returned
Though flooded passenger trains
Keep on shuttling
Making deep groves on earth!
Millions pour in,
Groves deepen
Trains snail down
Layer under layers
Till the pores are blocked.
But the roaming
Echo
Do knock
The closed window.

Blue night
Slips over her bed-sheet
Sticks a star on her thigh.
Those distant pale brown boats
Of bodies quiver behind
A sudden white horizon
Cuts across the landscape below
Its stained sand remain covered
Grey with her bed-sheet.

নিজের হাতে লেখা মকবুল ফিদা হুসেনের চারটি কবিতা